নতুন থিসিস

বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন যুগ

মাওবাদী আন্দোলনের চার দশকের সারসংকলন

নতুন থিসিস

("জাতীয় সম্মেলন/২০১১"-এ গৃহীত)

নতুন থিসিস

মাওবাদী আন্দোলনের চার দশকের সারসংকলন

প্রকাশক ঃ কেন্দ্রীয় কমিটি, পূবাসপা

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০১৯

দাম ঃ ২০০ টাকা (দুই শত টাকা)

মুখবন্ধ

২০১১ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত পার্টির "জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন", তথা "জাতীয় সম্মেলন/২০১১"-এ রাজনৈতিক রিপোর্ট আকারে দলিলটি পেশ করেছিল ৩য় কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কিছু সংশোধনী-সংযোজনীসহ দলিলটি সম্মেলন গ্রহণ করে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিসি-র সম্পাদক কমরেড আনোয়ার কবীর দলিলটি প্রথম রচনা করেন ২০০৯ সালের প্রথমার্ধে। আগস্ট, '০৯-এ অনুষ্ঠিত সিসি'র ১৬-তম অধিবেশন কিছু সংশোধন-সংযোজন সহকারে দলিলটি গ্রহণ করে।

সিসি সিদ্ধান্ত নেয় যে, দলিলটির উপর জাতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পার্টির সর্বস্তরে আলোচনা, শিক্ষিতকরণ ও মতামতের জন্য পেশ করা হবে এবং সেজন্য সিসি কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও গ্রহণ করে। সিসি আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, দলিলটি পার্টির বাইরেও সমগ্র মাওবাদী মহলে পেশ করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, সংগঠন, শক্তি ও ব্যক্তির সাথে এর ভিত্তিতে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হবে। একইসাথে মাওবাদী-বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বাম শক্তিগুলোর মাঝেও দলিলটি যথাসম্ভব প্রচার করা হবে। এভাবে বিভিন্ন মহল ও স্তরের মতামত সংগ্রহ করা এবং আলোচনা ও বিতর্ককে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে "জাতীয় সম্মেলন"-এর জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতিকে এগিয়ে নেয়া হবে এবং "জাতীয় সম্মেলন"-এর মধ্য দিয়ে দলিলের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অক্টোবর,'০৯-এ সিসি কর্তৃক দলিলটি প্রকাশ করা হয় এবং প্রস্তাবিত দলিল হিসেবে প্রচার করা হয়।

দলিলটি প্রকাশের পর পার্টির মধ্য থেকে এবং পার্টির বাইরে থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়। "জাতীয় সম্মেলন" এসব মতামতের ভিত্তিতে দলিলটিতে আরো সংশোধনী-সংযোজনী আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতীয় সম্মেলন-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন দলিলটি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো। দলিলটি প্রথম রচনার পর বিগত দুই বছরে দেশীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে নতুন বিকাশগুলো ঘটেছে তার ভিত্তিতে দলিলটিতে কিছু ফুটনোট যুক্ত করা হয়েছে।

এ দলিলটির ভিত্তিতে পার্টিতে আরো অনেক আলোচনা/মানোন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। পার্টির বাইরেও একইভাবে এর প্রচার ও আলোচনা-বিতর্ক অব্যাহত রাখতে হবে। এর ভিত্তিতেই এদেশের মাওবাদী আন্দোলন পুনর্গঠনের কাজকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে– তাত্ত্বিক পরিসরে এবং অনুশীলনের মাঠে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর এর মধ্য দিয়েই এ সারসংকলন পূর্ণতা পাবে এবং লাইন-বিনির্মাণের কাজটি এগিয়ে চলবে বলে আমরা আশাকরি।

কেন্দ্রীয় কমিটি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি

অক্টোবর, ২০১১

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

২০১১ সালে প্রকাশের পর এ দলিলের ভিত্তিতে পার্টির অনুশীলন ও পার্টি-লাইনের আরো অগ্রগতি ঘটেছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সেই সাথে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেসবের মূল্যায়ন পার্টির ৪র্থ কংগ্রেসের (২০১৭) রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক দলিল বিবেচনায় এই "নতুন থিসিস"টি, কিছু ব্যাকরণগত সংশোধন ব্যতীত, অবিকল প্রকাশ করা হলো। শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি জায়গায় বন্ধনীর মধ্যে বাঁকা হরফে কিছু বিবরণ যুক্ত করা হয়েছে। তবে পাঠকগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে পার্টির বিকশিত সামগ্রিক সারসংকলন ও লাইনকে জানার জন্য এই থিসিসের সাথে ৪র্থ কংগ্রেসের রিপোর্টটিও যেন তারা অধ্যয়ন করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি, পূবাসপা

নভেম্বর, ২০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা/৭

বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশীয় আন্দোলন/৭

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক পর্যালোচনা

মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্ব– ৬০/৭০-দশক (ভিত্তি পর্ব)/৯

মতবাদিক ক্ষেত্র–

ক) মতবাদের উপলব্ধিতে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা/১২
খ) আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট সারসংকলন করার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ রাপচার করতে না পারা/১৩
গ) টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠনকে উপলব্ধি না করা ও প্রয়োগ করতে না পারা/১৬
ঘ) মতাদর্শগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেলা/১৯

রাজনৈতিক সমস্যাবলী–

১। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ঃ

ক) একদিকে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, অন্যদিকে জাতীয় সমস্যাকে না বোঝা ও গণ-আকাঙ্ক্ষাকে ধরতে না পারা/২৩
খ) ভূমি সমস্যা ও শ্রেণির রূপান্তর/শ্রেণি বিশ্লেষণ/২৬
গ) আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ/২৭

২। বিপ্লবী রাজনীতি ঃ

ক) কৃষক সমস্যা তথা কৃষি বিপ্লব/২৮
খ) বিপ্লবী রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমার্থক মনে করা/২৮
গ) সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ/২৯
ঘ) শীর্ষ তত্ত্ব/৩০

৩। গণযুদ্ধ ঃ

ক) ঘাঁটি প্রশ্ন/৩০
খ) খতম লাইন/৩২

গ) বাহিনী গঠন ও যুদ্ধের বিকাশ/৩৪
ঘ) রণনৈতিক পরিকল্পনার অভাব/৩৭
ঙ) গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম/৩৭
চ) গণযুদ্ধের প্রস্তুতি/৩৯

পার্টি-গঠনের সমস্যা/৪১

যুক্তফ্রন্ট প্রশ্ন/৪৭

প্রথম পর্বের সামগ্রিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসা– ৮০-দশক
নতুন সারসংকলন, নতুন বিকাশ ঃ কিন্তু সীমা ছাড়াতে না পারা/৫২

রাপচার শুরু, কিন্তু অসম্পূর্ণ ও বিচ্যুতিসম্পন্ন– ৯০-দশক/৬৬

১। সামরিক লাইন ও খতম লাইন/৬৭
২। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ/৭৪
৩। মালেমা'র উপলব্ধি/৭৬

আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যাবলী/৭৯

বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের মাও-পরবর্তী সিকি-শতাব্দী
বিপর্যয় থেকে বেরুবার প্রচেষ্টা– সফলতা ও ব্যর্থতা/৯০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

মৌলিক লাইনগত অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

মতাদর্শ/মতবাদ/১০৫
গণযুদ্ধ/১১১
আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ/১৩৭
পার্টি-গঠন/১৫১
যুক্তফ্রন্ট গঠন/১৬০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বর্তমান বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়/১৬৬

উপসংহার/১৮২

ভূমিকা

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের আমলে, বিগত শতকের ২০-এর দশকে। কিন্তু সেই আন্দোলন তার ইতিবাচক অবদানগুলো সত্ত্বেও একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দালন হিসেবে কখনই নিজেকে গড়ে তুলতে পারেনি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পর তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ অবস্থাটা চলতে থাকে। শুধুমাত্র ৬০-এর দশকের শেষার্ধে এসেই এদেশে প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে যা মাওবাদী আন্দোলন নামেও পরিচিত। আমাদের পার্টি সে আন্দোলনেরই একটি অংশ।

সে সময়ে শুরু হয়ে মাওবাদী আন্দোলন বাস্তব পরিস্থিতির বিপ্লবী ও মূলত সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বহু বীরোচিত সংগ্রাম ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আন্দোলন ও তার নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের বহু ইতিবাচক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা বারংবার শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে। বারবার তা কাটিয়েছে ও এগিয়েছে, কিন্তু পুনরায় ভেঙে পড়েছে। আবার এগিয়েছে। কিন্তু বিগত শতক পেরিয়ে এই একুশ শতকের গোড়া থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, এই আন্দোলন তার বিকাশের এক নতুন সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এ আন্দোলনের ১ম যুগের বা ১ম স্তরের অবসান ঘটেছে। ষাট-দশকে যার সূচনা, ৭০-দশকের প্রথমার্ধে যার প্রথম উত্থান, ৮০ ও ৯০ দশকে এবং এ শতকের ১ম দশকে থেমে থেমে যার পুনঃউত্থান ঘটেছে, সেই আন্দোলন, লাইন ও পার্টি বাস্তবে এক নতুন যুগে প্রবেশ করে গেছে। বাস্তবে এক সামগ্রিক নতুন লাইন, নতুন পার্টি ও সংগ্রাম গড়ে ওঠার পথে রয়েছে। অনেকখানি তা এগিয়েছেও বটে, কিন্তু এখনো দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে ও সামগ্রিক অবয়ব সহকারে তা দাঁড়িয়ে যায়নি। এই আন্দোলন, যা এক বিশ্ব আন্দোলনেরই অংশ, তার এই সন্ধিক্ষণে বিগত যুগের এক সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সংশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই রিপোর্ট বাস্তবে এই সংশ্লেষণেরই দলিল। যা কিনা এই সংশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের আজকের বাস্তবতাকে আলোচনা করবে, এবং বর্তমানের করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশের প্রচেষ্টা চালাবে।

বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশীয় আন্দোলন

এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের উন্মেষ যখন ঘটে, অর্থাৎ, বিগত শতকে ৬০-দশকের শেষার্ধে, সে সময়টা ছিল বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনেরও সূচনাকাল। একইসাথে সেটা ঘটেছিল বিশ্বজুড়ে, নিপীড়িত শ্রেণি ও জনগণের এক সামগ্রিক উত্থানকালে, যখন মাওবাদী আন্দোলনও ছিল এ উত্থানের একটি বড় অংশ, এবং সে উত্থানে মাওবাদী আন্দোলন এক বড় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু ১৯৭৬ সালে এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব মাওসেতুঙের মৃত্যু, পরপরই এই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি সমাজতান্ত্রিক চীনের পুঁজিবাদে অধঃপতন, এবং সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব জন-আন্দোলনের উত্থানেও ভাটা পড়ে। আসলে তখন থেকেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সোনালি যুগেরও সমাপ্তি ঘটে– যাকিনা রুশ বিপ্লবের সফলতার মধ্য দিয়ে ১৯১৭ সালে সূচিত হয়েছিল।

সেই ক্ষতিকে কাটিয়ে তোলার জন্য বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের এক নব প্রজন্ম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ৮০-দশকে পেরু-বিপ্লব, ১৯৮৪-সালে রিম গঠন, ৯০-দশকে নেপাল বিপ্লব– ইত্যাদি উত্থান ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলো বিশ্ব মানচিত্রে পুনরায় কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে ৮০-দশকে কমরেড আনোয়ার কবীরের পরিচালনায় আমাদের পার্টির নেতৃত্বে গণযুদ্ধের এক নতুন ঢেউ, ভারতের গণযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ফিলিপিনের গণযুদ্ধও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে আমরা দেখতে পাই যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নতুন উত্থান প্রচেষ্টা পুনরায় এক বৃহৎ সংকটের মুখে পড়েছে। পেরু-বিপ্লব বিপর্যস্ত হয়েছে, নেপাল বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং 'রিম' ও তার অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলো এক সুস্পষ্ট ও অনিবার্য সংকটকে মোকাবেলা করছে। যদিও ভারত ও ফিলিপিনের গণযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের কিছু লাইনগত দুর্বলতার কারণে তাদের এ অগ্রগতি সমগ্র বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করবার ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা এখনো পালন করতে পারছে না। এভাবে মাওবাদী আন্দোলনকে উচ্চতর স্তরে পুনঃসংগঠিত করবার প্রথম প্রচেষ্টা তার লাইনগত ও বাস্তব সংগ্রামের এক ঝাঁক সফলতা সত্ত্বেও আপাতত হুমকির মুখে– যার অন্তর্নিহিত কারণ আন্তর্জাতিক লাইনের বিভিন্ন দুর্বলতা/বিচ্যুতি/সীমাবদ্ধতার মাঝেই রয়েছে।

এ পরিস্থিতি দাবি করছে বিগত অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মূল্যায়নের।

আমাদের দেশের আন্দোলন এই সামগ্রিকতারই অংশ। উপরোক্ত সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের অংশের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কিন্তু এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ সমস্যাবলি ও বিশেষ দায়িত্বাবলিও রয়েছে। তার মূল্যায়ন/সংশ্লেষণের কাজে উপরোক্ত সামগ্রিকতা বিরাজ করছে। সুতরাং এর মূল্যায়ন বৈশ্বিক তাৎপর্যও ধারণ করে। এবং এটা বৈশ্বিক কাজেরই অংশ বটে।

* দেশের মাওবাদী আন্দোলন বলতে আমরা শুধু আমাদের পার্টি দ্বারা চালিত আন্দোলনকেই এখন আর বুঝাই না। বরং এটা হলো আমাদের পার্টিসহ অনেকগুলো ধারা ও শক্তির দ্বারা চালিত সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন। আমরা এই সমগ্র আন্দোলনের মৌলিক সমস্যা নিয়েই আলোচনা করবো, যদিও আমাদের পার্টির আলোচনা স্বভাবতই তাতে বেশি ও সুনির্দিষ্টভাবে থাকবে, এবং আমাদের পার্টির বাইরের বিভিন্ন ধারাগুলোর আলোচনা অনেকক্ষেত্রে মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই পর্যালোচনা সেগুলোকে এগিয়ে নেবার ভিত্তি সৃষ্টি করবে, এবং আরো বহু মূর্ত-নির্দিষ্ট আলোচনার দ্বারা এই মূল্যায়নটি কালক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বলে আমরা আশাকরি। এবং সমভাবে সকল ধারা ও শক্তিগুলোর সামগ্রিক মূল্যায়নে তা পরিণত হয়ে উঠবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক পর্যালোচনা

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ও প্রথম পর্ব– ৬০/৭০-দশক (ভিত্তি পর্ব)

৬০-দশকের প্রথমার্ধে সোভিয়েত-ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বাধীন চীনা পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের প্রভাবে এদেশে সর্বপ্রথম মাওবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। দশকের শেষার্ধে মাওসেতুঙের নেতৃত্বে সূচিত ও পরিচালিত চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (জিপিসিআর) এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নক্সালবাড়ী এলাকায় কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে মাও চিন্তাধারা অনুসারী বিপ্লবী সশস্ত্র কৃষক-অভ্যুত্থান– এই দুয়ের প্রভাবে এদেশে মাওবাদী আন্দোলনের স্বতন্ত্র বিকাশের সূত্রপাত ঘটে। সে সময় পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল, যা সরকারিভাবে "পূর্ব পাকিস্তান" নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক আদি কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি)-র প্রধান নেতৃত্বদের দ্বারা সোভিয়েত-ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ করায় তার বিরুদ্ধে আন্তরিক কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এক মহান বিদ্রোহের সূচনা করেন। ষাট-সত্তর দশকে এই সংগ্রামের ন্যায্যতা ও সঠিকতা, এবং পাশাপাশি তার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতিসমূহ মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের যাবতীয় লাইন, সংগঠন ও সংগ্রাম জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। এটাই বিগত শতকের তথা প্রথম যুগের মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সে কারণে এই ভিত্তি-পর্বের আলোচনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা কিনা আমাদেরকে বিগত প্রথম যুগটির সামগ্রিক সারসংকলনের কাজে সক্ষম করে তুলতে পারে।

এই সংগ্রামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক ছিল এই যে, এই সংগ্রাম সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ হিসেবে তার সর্বশেষ বিকশিত স্তর বা তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ, মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে (মাওবাদকে) এ দেশে নিয়ে আসে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে– শুধু তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই নয়, জনগণের বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামের গাইড হিসেবেও।

মাও চিন্তাধারা দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এই আন্দোলন বিপ্লবের স্তর হিসেবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষক ও গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করা, সংসদীয় পথকে বর্জন করা, বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তিকে বর্জন করা, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে আঁকড়ে ধরা– এই মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত করে।

রাজনৈতিক লাইনের এই সঠিকতাগুলোর ভিত্তিতেই ষাট-সত্তর দশকে এক মহান বিপ্লবী উত্থান মাওবাদীদের নেতৃত্বে এদেশে ঘটেছিল, যা কিনা '৭০ থেকে শুরু ক'রে '৭৪– কম/বেশি এই পাঁচ বছর ধরে ব্যাপ্ত ছিল। ৭০-দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে চলা এই বিপ্লবী আন্দোলন এ দেশের সমগ্র আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে জনগণের সবচেয়ে বিপ্লবী, সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে বেশি করে নিপীড়িত শ্রেণি ও গণ-আশ্রয়ী মুক্তি সংগ্রামের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। যাকে প্রায়শই এদেশের অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে জনগণের বিভিন্ন অংশের দ্বারা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব দ্বারা চালিত বিবিধ প্রগতিশীল, সংস্কারমূলক, জাতীয়তাবাদী বা এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের একতরফা ও বিকৃত, শাসকশ্রেণীয় ও মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদী বর্ণনা দ্বারা এবং মিথ্যাচার, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। সুতরাং কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষত মাওবাদী আন্দোলনের একটি প্রধানতম দায়িত্ব হলো ইতিহাসের এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সার্বিক ভূমিকা রাখা। এই আন্দোলনের প্রধানতম নেতৃত্বদেরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। যার মাঝে প্রধানতম সারিতে ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদার, বাদল দত্ত, মনিরুজ্জামান তারাসহ আরো অনেক নেতৃত্ব। যাদের মাঝে কমরেড সিরাজ সিকদারকে সামগ্রিক বিবেচনায় সারির শীর্ষে রাখতে হবে বলেই আমরা মনেকরি।

একইসাথে সেসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ও খুবই নির্ধারক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে পথচ্যুত হয়েছেন বা এমনকি অধঃপতিত হয়েছেন এমন বহু নেতৃত্বেরও তৎকালীন মাওবাদী বিপ্লবী অবদানকে স্মরণে রাখতে হবে, এবং তাকে আমাদের আন্দোলনেরই সম্পদ বলে বিবেচনা করতে হবে। সর্বজনাব হক-তোয়াহা-সুখেন্দু দস্তিদার, মতিন-আলাউদ্দিন-আমজাদ হেসেন-টিপু বিশ্বাস, রণো-মেনন, দেবেন শিকদার-বদরুদ্দিন উমরসহ আরো অনেক জাতীয় পরিচিতি সম্পন্ন নেতৃত্বগণ মাওবাদী আন্দোলনকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করায়, অথবা তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনে এই প্রথম উত্থান পর্বে স্বল্প বা কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য, কিছুটা বেশি বা অল্প করে হলেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন। মাওবাদ সম্পর্কে ধারণার দুর্বলতা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ঝড়ঝাপ্টায় এদের প্রায় সবাই আগে বা পরে কার্যত মাওবাদকে অনুশীলনে নিতে ব্যর্থ হন, একসময়ে তাকে বর্জন করেন, এমনকি এদের একাংশ সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতেও অধঃপতিত হন। কিন্তু এই নেতৃত্বগণের মাওপন্থী থাকার সময়কালকে এবং বিপ্লবী বা প্রগতিশীল ভূমিকাকে একইসাথে তাদের পরবর্তীকালের অধঃপতিত ও ভুল রাজনীতির ফসল অথবা

ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বলার কোনো কারণ নেই। ইতিবাচক ইতিহাসের এই পুনরুদ্ধার প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস মোকাবেলায় আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একে কোনোক্রমেই বর্জন করা যাবে না।

এই পর্বের দেশীয় আন্দোলন আলোচনায় কমরেড চারু মজুমদারের (CM - সিএম) মহান ভূমিকার বিষয় কিছুটা হলেও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এদেশের নয়, বরং ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। এর কারণ হলো, নক্সালবাড়ী আন্দোলনটি ছিল আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনের সমসাময়িক হলেও কিছুটা পূর্বসুরী। ফলে তার এক বিপুল প্রভাব পড়েছিল এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে। এমনকি আমাদের পার্টি ছাড়া অন্য ধারাগুলোর অনেকগুলোই কম/বেশি সময়ের জন্য সিএম-শিক্ষাকে নিজ নিজ পার্টির প্রায় তাত্ত্বিক ভিত্তির মত করে অনুসরণ করেছিল। পূবাকপা-ধারাটি বিগত শতক জুড়েই এটা করেছে। তাই, সিএম-আলোচনা ব্যতীত এই পর্বের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

কমরেড সিএম-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাঝে ছিল জিপিসিআর-এর শিক্ষাকে আত্মস্থ করার সংগ্রাম গড়ে তোলা, অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা, কৃষি-বিপ্লবের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা, গোপন বিপ্লবী পার্টি গঠনের এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রতিষ্ঠা করা, এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শকে বিপুল উচ্চতায় উন্নীত করা। তিনি ভারতের মত এক বৈরী দেশে বিপ্লবী ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"। কমরেড সিএম দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের রণনীতিকে আঁকড়ে ধরে শূন্য থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার বিপ্লবী লাইন গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিলেন। এসমস্ত দ্বারাই আমাদের দেশের বিপ্লবী মাওবাদীরা বিরাটভাবে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত হয়েছিলেন। গণযুদ্ধের বিপ্লবী রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের সামরিক লাইন প্রয়োগের জন্য তিনি "খতম লাইন" নামে সমধিক পরিচিত যে লাইন প্রণয়ন করেন ও প্রয়োগ করেন তা-ও কম/বেশি পরিমাণে এদেশের সকল বিপ্লবী মাওবাদী ধারাই গ্রহণ করেছিল– স্বীকৃতি দিয়ে বা না দিয়ে, সচেতন বা অসচেতনভাবে। গণযুদ্ধের রাজনীতি ও গেরিলা যুদ্ধের সামরিক লাইন সংসদীয় পথকে চুরমার ক'রে কৃষকের বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ, তথা গণযুদ্ধ আরম্ভ করায় ভারত ও পূর্ব বাংলায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল। যদিও সিএম-প্রণীত "খতম লাইন"-এর সফলতার পাশাপাশি তার নিজস্ব দুর্বলতা ও সমস্যাও ছিল, যা আমরা পরে আলোচনা করবো। তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন আমরা এখানে করতে পারবো না। কিন্তু কমরেড সিএম-কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই তার মৌলিক অবদানগুলো সম্পর্কে আন্দোলন ও জনগণের মাঝে সচেতনতা প্রয়োজন, কারণ, ৭০-দশকের মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম উত্থান পর্বকে কমরেড সিএম-এর আলোচনা ছাড়া, তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ব্যতীত করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সব সফলতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন যে খুব দ্রুতই সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তার কারণ শুধু শত্রুর বর্বর দমনের মাঝে খুঁজলে চলবে না। বরং সেটা সে সময়কার লাইনের ভুলসমূহের মাঝেও নিহিত ছিল। আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মাওবাদী আন্দোলন তার এ শৈশবাবস্থায় অনেক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাযুক্ত থাকা স্বাভাবিক ছিল। আন্দোলন ছিল অপরিপক্ক। মাওবাদ আত্মস্থ করার সময় সে পেয়েছিল খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্বলতা ও বিচ্যুতি– তা যে কারণেই ঘটুক না কেন, তা আন্দোলনকে ক্ষতি করতে বাধ্য, এবং তা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে কাজ করতে বাধ্য। তাই, আমাদের উচিত হবে কোন রকম মোহগ্রস্থ না হয়ে নিষ্ঠুরভাবে আমাদের আন্দোলনের সে সময়কার সমস্যাগুলোকে উদ্ঘাটন করা।

সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামে মৌলিকভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও ষাট-সত্তর দশকের এ সংগ্রামে গুরুতর অনেক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। ক্রুশ্চভীয়/ইপিসিপি সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকে আমাদের আন্দোলন সৃজনশীলভাবে এদেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলনের সাথে মিলিয়ে একটি সামগ্রিকতায় পরিণত করতে পারেনি এবং তাকে বাস্তবে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এটাই প্রথমত তাকে অক্ষম করে তোলে একটি সামগ্রিক ও সঠিক মাওবাদী লাইন বিনির্মাণে। এটা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক– সবক্ষেত্রেই তার প্রভাব রাখে। যা কিনা বিগত শতকের আন্দোলনে সমস্ত পর্যায়েই ধারাবাহিকভাবে কম/বেশি প্রভাব রেখেছে। আমরা এখন সেগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক আলোচনা করবো। কারণ, এই দুর্বলতা ও বিচ্যুতিকে কাটানোর উপরই নির্ভর করবে এখনকার এক নতুন যুগে একটি সামগ্রিক সঠিক লাইন বিনির্মাণ কাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়া।

মতবাদিক/মতাদর্শিক ক্ষেত্র

ক) মতবাদের ৩য় স্তরে বিকাশ প্রশ্নে উপলব্ধিতে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা ঃ

আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলন শুরু থেকেই মতবাদের তৃতীয় স্তর হিসেবে মাওচিন্তাধারাকে গ্রহণ করলেও তার উপলব্ধিতে গুরুতর অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা ছিল, যার একাংশ ছিল ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা উদ্ভূত।

জিপিসিআর-এর সূচনাতেই বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরবর্তী মাওবাদের তৃতীয় স্তরে উন্নীত হলেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমগ্রকাল জুড়ে তা আরো বিকশিত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বা ভারতেবর্ষে যখন মাওবাদী আন্দোলন শুরু হয় তখনো জিপিসিআর মাত্র তার প্রথম লড়াইটি, অর্থাৎ লিউ শাওচি-বিরোধী সংগ্রামটি সংঘটিত করেছে। এর দ্বিতীয় প্রধান লড়াই, অর্থাৎ,

লিনপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামটির তাৎপর্য বুঝে উঠবার আগেই সিএম শহীদ হন। সিএম-এর বিপ্লবী ধারাকে এগিয়ে না নেয়ার কারণে আমাদের দেশেও তার তাৎপর্য আত্মস্থ হয়নি। আমাদের পার্টিতে কমরেড সিরাজ সিকদারের শহীদ হবার অল্প আগে লিন-বিরোধী সংগ্রামের আলোচনা শুরু হলেও সেটা তেমন কোনো গভীরতা অর্জন করবার সময় পায়নি। আর তেংবিরোধী শেষ লড়াইটি শুরুই হয় এই আলোচিত প্রথম পর্বটির সার্বিক বিপর্যয়ের পরে। সুতরাং জিপিসিআর কালের সমগ্র শিক্ষাগুলো সমৃদ্ধ আকারে তখনকার মাওবাদী আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু যা কঠিন হলেও সম্ভব ছিল তাহলো স্ট্যালিনের সারসংকলনকে আয়ত্ত করা, যা মাও ইতিপূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন। বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে আজ যা প্রায় প্রতিষ্ঠিত বিষয় তাহলো মাও কর্তৃক স্ট্যালিনের সারসংকলন, যা কিনা মাওবাদ নির্মাণের পথে এক অপরিহার্য উপাদান ছিল। বাস্তবে এর উপরই দাঁড়িয়ে ছিল মতবাদের মাওবাদে উল্লম্ফনের বিষয়টি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বল আন্তর্জাতিকতাবাদী যোগাযোগ মাওবাদের এই সব উপাদানকে হাতে পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল। যে কারণে, সামগ্রিকভাবে মাও-এর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকালের অবদানগুলোই এদেশে তখন প্রধানত এসেছিল, যাকে ভিত্তি করে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঠিক ছিল বটে, কিন্তু তা আবার সেই সংগ্রামকে দুর্বল করেও গড়ে তুলেছিল। আমাদের মাওবাদী আন্দোলনের গোড়াতেই এই সীমাবদ্ধতা মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তিকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করে দেয়, যা বিগত শতকের গোটা পর্যায়টিতে বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজ করেছিল। শুরু থেকে আমাদের মাওবাদী আন্দোলনের দুর্বলতাগুলোর সাথে মতবাদের এই অসম্পূর্ণ ও দুর্বল উপলব্ধির গুরুতর সম্পর্ককে না বুঝলে চলবে না।

খ) আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট সারসংকলন করার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ রাপচার করতে না পারা ঃ

ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের যে লেজুড়বৃত্তি করার মধ্য দিয়ে ইপিসিপি (মনিসিং নেতৃত্বাধীন) অতিসত্বর সংশোধনবাদে অধঃপতিত হয়ে যায়, তা হঠাৎ করে ঘটেনি; তার ভিত্তি আদি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই বিরাজমান ছিল। কিন্তু আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন, আর ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ হুবহু একই জিনিষ ছিল না; তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নতুন ধারায় স্থাপিত করার জন্য ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করার পাশাপাশি আদি আন্দোলনের একটি মৌলিক, সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সারসংকলন প্রয়োজন ছিল, যাকিনা তার সাথে বিপ্লবী রাপচারকে সম্পূর্ণ করতে পারতো। এই প্রশ্নে নবউদ্ভূত মাওবাদী আন্দোলন গুরুতর দুর্বলতা দ্বারা চালিত হয়েছে।

মাওবাদ-পূর্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, যাকে আমরা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন বলছি, তার সাথে বিপ্লবী বিচ্ছেদ ব্যতীত কোনো বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বিশেষত যখন তা মধ্য-পঞ্চাশ দশক থেকে আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদের লেজুড়ে পরিণত হলো তখন তাকে পরিপূর্ণ বর্জনের প্রশ্ন আক্ষরিকভাবেই সঠিক ছিল। কিন্তু সংশোধনবাদের লেজুড় হবার পূর্বে যখন পর্যন্ত সে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ৩য় আন্তর্জাতিক বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার গুরুতর লাইনগত ত্রুটি, এমনকি বহুবিধ সংশোধনবাদী উপাদান সত্ত্বেও, তার সাথে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদী ধারার একটা মৌলিক পার্থক্যরেখা টানা গুরুত্বপূর্ণ ছিল– যা নব্য মাওবাদী আন্দোলন করেনি, এবং কার্যতঃ এ দুটোকে একাকার করে ফেলেছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক ঐতিহ্যের রক্ষা এবং তার ভুল লাইন, বা এমনকি সংশোধনবাদী উপাদানসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রকাশগুলোকে নির্দিষ্টভাবে বর্জনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে একটি নতুন উচ্চতর জায়গায় উন্নীত করবার সংগ্রাম ব্যাপকভাবে দুর্বল থেকে যায়। আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক ইতিবাচক ঐতিহ্যকেও এভাবে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের অনুসারীদের পকেটে তুলে দেয়া হয়। এবং যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আদি আন্দোলনের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের এক সুগভীর বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে একটি গুরুতর দুই লাইনের সংগ্রাম বিকশিত করার বদলে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ বর্জনের ও মাওবাদ গ্রহণের একটি সরল পথ অনুসৃত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন একটি প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। পূর্বাপর মূলতঃ একটি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী ধারায় তা আটকে ছিল। লেনিনের "কী করিতে হইবে?" মতবাদ কখনই এই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আত্মস্থ করতে পারেনি। ঠিক এ কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে এ পার্টি সর্বদাই দূরত্বে ছিল। তাই, কৃষকের আশু আন্দোলন যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র পথে বিকশিত হয়ে ওঠে, এবং বহু অঞ্চলে নিজেদের বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যত দখল করে ফেলে (তেলেঙ্গানায়, অংশত তেভাগা আন্দোলনে), তখন পার্টি তাকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থই শুধু হয় তা নয়, তাকে কার্যত বর্জন করে।

এ পার্টি এমনকি ৩য় আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের লাইন অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত ভারতবর্ষে কৃষক সমস্যাকে আঁকড়ে ধরা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাকে আঁকড়ে ধরা এবং বড় ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের বিপ্লবের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার কাজও করতে পারেনি। তারা একটি শ্রমিকবাদী লাইন অনুসরণ করে গেছে, যা কার্যত শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাঝে নিজেদেরকে আটকে ফেলে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ও সমাজ রূপান্তরের বিপ্লবী আন্দোলন, তথা

ভারতবর্ষের বিশালায়তন কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের কেন্দ্রীয় সমস্যাকে উপলব্ধি করতেই ব্যর্থ হয়। তারা একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে একাকার করে ফেলেছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক স্তরে বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যের নামে বড় বুর্জোয়াদের (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের) লেজুড়বৃত্তির লাইন অনুসরণ করে গেছে।

২য় বিশ্বযুদ্ধকালে এ পার্টি ফ্যাসিবাদবিরোধিতার নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী মুৎসুদ্দি রাজনীতির সেবা করে। ৩য় আন্তর্জাতিকের অপর এক প্রধান পার্টির নেতৃত্বে ৩০ ও ৪০-দশকের চীন বিপ্লবের অগ্রগতি থেকে শিক্ষা নিতে এই পার্টি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এভাবে এ পার্টি এ ধরনের দেশে নয়া গণতন্ত্র, কৃষি বিপ্লব ও গণযুদ্ধের রাজনীতি আবিষ্কার করতে-যে ব্যর্থ হয় শুধু তা-ই নয়, বহু পরিমাণে সংশোধনবাদী উপাদানে সে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলে। যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে আন্তর্জাতিক পরিসরে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ আসামাত্র এ পার্টি তার এক প্রধানতম লেজুড় ও সমর্থনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। যাকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল মনিসিং-মোজাফ্ফর-মতিয়া চক্র।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক অবদানগুলোকে এক কথায় বাতিল করে দিলে চলবে না। এই পার্টিই ভারতবর্ষের মত পশ্চাদপদ কৃষি-প্রধান বিশাল এক দেশে কমিউনিজমের মতবাদকে নিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাকে রাজনীতির এক নতুন ধারায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। মার্কসবাদকে, মহান লেনিন ও স্ট্যালিনকে, রুশ বিপ্লবকে, ফ্যাসিবিরোধী কমিউনিজমের মহান সংগ্রামকে, শ্রমিক-কৃষকের স্বতন্ত্র রাজনীতি-মতবাদ-ক্ষমতা-রাষ্ট্র ও বিপ্লবের বাণীকে উপমহাদেশে তা অতি অল্প সময়ে বিপুল জনপ্রিয় করতে পেরেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি থেকে এক বিপুল পরিমাণ বিদ্রোহী, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী তরুণকে এ পার্টি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতবাদের বলয়ে টেনে এনেছিল। এবং তেলেঙ্গানা (ও এদেশে তেভাগা)-র মহান সংগ্রামসহ বহু ধরনের শ্রমিক, শ্রমজীবীদের আন্দোলন ও একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এইসব ঐতিহ্য তার রাজনৈতিক দুর্বলতাসহ আমাদেরই ঐতিহ্য, যা আমরা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারি না, তার উপর সংশোধনবাদীদেরকে ভাগ বসাতে দিতেও পারি না। কিন্তু একইসাথে তার সাথে বিপ্লবী রাপচার না ঘটিয়ে আমরা এক পা এগুতেও পারি না।

নব্য মাওবাদী আন্দোলন এভাবে না এগোনোর ফলে তার দ্বারা ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের সাথে বাস্তবে একাকার করা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সরল বর্জন যতটা হয়েছে, ততটাই হয়নি তার সাথে লাইনগত সংগ্রাম গভীর করার মধ্য দিয়ে তার সাথে বিপ্লবী রাপচার। ফলে পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনে আদি

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ এবং জাতীয়তাবাদের বিরাট প্রভাব থেকে যায় যা অন্যান্য রূপে নিজেকে প্রকাশ করে– যে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো।

আদি পার্টির যে গুরুতর বিচ্যুতিগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার অন্তত কিছু অংশ– যেমন, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের নামে বৃটিশের লেজুড়বৃত্তি, তৎকালীন অগ্রসরমান চীনা বিপ্লব থেকে না শেখা, কৃষিবিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরা ও দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে রণনীতি হিসেবে গ্রহণ না করা– প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্ট্যালিন ও তাঁর নেতৃত্বে ৩য় আন্তর্জাতিকের বিরাট ভূমিকা ছিল– সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং ভারতীয় ও পূর্ব পাকিস্তানি আদি কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক ভুলের পেছনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভূমিকার সারসংকলন ব্যতীত এই টুএলএস গভীর ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। মাও সম্পূর্ণত না হলেও মৌলিকভাবে জিপিসিআর প্রস্তুতিকালে– ৬০-দশকের প্রথমার্ধেই স্ট্যালিনের সাথে এই রাপচার ঘটান। এই অভিজ্ঞতা আমাদের মাওবাদী আন্দোলনে আদৌ পৌঁছেনি বললেই চলে। বরং বহু ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন স্ট্যালিনকেই অনুসরণ করে, যদিও তারা তত্ত্বগতক্ষেত্রে মাওচিন্তাধারার কথা বলেছে। এভাবে কার্যত মাওবাদের দুর্বল ও অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকেই মাওবাদী আন্দোলন এদেশে যাত্রা শুরু করেছিল। যা সূচনাতেই তার বহুধা বিভক্তির অন্যতম কারণও বটে, যদিও তার নিজস্ব অন্যান্য কারণও রয়েছে।

গ) টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠনকে উপলব্ধি না করা ও প্রয়োগ করতে না পারা ঃ

ক্রুশ্চভীয়-মনিসিং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণ, তার ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং সে পার্টির নেতৃত্বে একটি সফল বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা।

ষাট-দশকের শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী টালমাটাল বিপ্লবী পরিস্থিতিতে মাও যখন সংশোধনবাদের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানালেন "হেডকোয়ার্টারে তোপ দাগাও"– তখন সেই মহান আহ্বান এদেশেও প্রকৃত বিপ্লবীদের অন্তরে এসে আছড়ে পড়ে বিদ্রোহের ঢেউ জাগিয়ে তুললো। তারা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা ন্যায্যভাবেই সংশোধনবাদী ইপিসিপি থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটালেন। কিন্তু এই বিচ্ছেদ সাংগঠনিকভাবে যতটা সম্পূর্ণ ছিল, মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের পরিসরে ততটা সম্পূর্ণ বা গভীর হতে পারেনি।

এর অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বিপ্লবীদের ভুল বা তাদের মধ্যকার সংশোধনবাদী উপাদান, এবং তার বিপরীতে মৌলিকভাবে সংশোধনবাদ– এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্যকরণ এবং সেসবের সাথে সংগ্রামের পদ্ধতিশাস্ত্রগত (Methodology) সমস্যা। শুরু থেকেই এই সংগ্রামে একতরফাবাদ, বিভেদপন্থা ও সংকীর্ণতাবাদের

ত্রুটি থেকে গেল। আন্তরিক বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যকার সংগ্রামকেও সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম বলে বৈরীভাবে গড়ে তোলা হলো। বৃক্ষকে অরণ্য বলা হলো। টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে লাইন-বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠনকে আঁকড়ে না ধরে আত্মগতভাবে একেকটা আংশিক, খণ্ডিত লাইন নিজেকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে দাবি করলো এবং বিরোধী অন্য সমস্ত লাইনকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিল। এটা একদিকে যেমন একটি নবউদ্ভূত বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণকে পঙ্গু করে দিল, অন্যদিকে এটা প্রকৃত সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকেও দুর্বল করে দিল। নিজেদের মধ্যকার সংগ্রাম, আর সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম একাকার হয়ে গেল।

এর ফলশ্রুতিতে অতিদ্রুত মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই অনেকগুলো কেন্দ্র এদেশে গড়ে উঠলো। যা মাওবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরস্থ লাইন-সংগ্রামে সকল পক্ষকে গুরুতর সংকীর্ণতা, অগভীরতা, আত্মগতভাব, একতরফাবাদ ও বিভেদপন্থায় চালিত করলো। যা পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনের সকল পর্যায়ে তাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

আদর্শগত সংগ্রামের দীর্ঘসূত্রতা, উত্তরণকালের স্বাভাবিক দ্বৈততা, এবং সামগ্রিকতা ও অংশের দ্বন্দ্ব ও ঐক্যকে মাওবাদী আন্দোলন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এ সময়ে ও তার প্রক্রিয়ায় পরবর্তী ৩/৪ বছরের মধ্যে আঃ হক নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি/এমএল, মতিন-আলাউদ্দিন নেতৃত্বাধীন পূবাকপা/মালে, এসএস নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি, এবং তোয়াহা-সুখেন্দু নেতৃত্বাধীন বিএসডি/এমএল– এই চারটি প্রধান ধারায় মাওবাদী আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরো বেশ কিছু সংগঠন ও কেন্দ্র এ সময়ে গড়ে ওঠে যারা উপরোক্ত ৪টি ধারার মত দৃঢ়ভাবে মাওবাদকে গ্রহণ না করলেও নিজেদেরকে মাওচিন্তানুসারী বলে প্রকাশ করে। এই সবগুলো ধারা, উপধারা, কেন্দ্র, সংগঠন– টুএলএস-কে গভীর করতে কম/বেশি ব্যর্থ হয়, প্রধানত এই কারণে যে, প্রায় প্রথম থেকেই সবগুলো কেন্দ্র শুধু নিজেদেরকেই সঠিক মাওবাদী দাবি করে অন্যদেরকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করে দেয়।

সংশোধনবাদ একটি সামগ্রিক চরিত্র ধারণ করলে পরেই তার সাথে মার্কসবাদের সম্পর্ক সামগ্রিক বিচ্ছেদ ও বিভেদের হতে পারে। নতুবা সংশোধনবাদ বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় পার্টিতে সর্বদাই থাকে। তাই বলে পার্টি সর্বদাই সংশোধনবাদী হয়ে থাকে না, বা ভিন্নমতগুলোর ত্রুটি সত্ত্বেও ভিন্নমতধারীদের সার্বিক চরিত্র সংশোধনবাদী হয়না। পার্থক্য মাত্রই সংশোধনবাদ-মার্কসবাদ দ্বন্দ্ব, এবং সংশোধনবাদ মানেই তার সাথে বিভেদের সংগ্রাম পরিচালনা– এই অনুসৃত ধারাটির মৌলিক সমস্যা হলো বস্তুর সামগ্রিক চরিত্র আর আংশিক দিককে একাকার করে ফেলা। মাও যাকে বলেছেন, বৃক্ষকে অরণ্য বলা। বাস্তবে পার্টিতে এইসব মতপার্থক্যের মধ্যকার সংগ্রামই পার্টির অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি রূপে কাজ করে।

এটা আমরা মাওবাদ থেকে শিখেছি। কিন্তু স্ট্যালিনীয় ধারায় পার্টিকে একস্তম্ভী মনে করার ভুল দার্শনিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা একে বুঝতে ও সঠিকভাবে মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশে শুরু থেকেই মাওবাদী আন্দোলন কার্যত এই স্ট্যালিনীয় ভুলকে অনুসরণ করেছে ও মাওবাদ আত্মস্থ করতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে মাওবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে একটি বৈরী বিভেদাত্মক সংগ্রাম পরিচালনার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, যাকে কিনা সংশোধনবাদবিরোধী মহান সংগ্রাম বলেও গর্ব করা হয়েছে, এবং এটা মাওবাদী আন্দোলনে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি গঠনে বিশাল ক্ষতি সাধন করেছে।

এমনকি সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামেরও একটি প্রক্রিয়া রয়েছে– যা টুএলএস-কে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। সামগ্রিক বিচ্ছেদ ও ন্যায্য বিভেদ এ লাইন-সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি মাত্র। সঠিক ও সুগভীর টুএলএস-ই সংশোধনবাদকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচন করে, সঠিক লাইনকে বিকশিত করে এবং আন্তরিক কর্মী-জনগণ, এমনকি নেতৃত্ব পর্যায়েও ইতিবাচক রূপান্তর ঘটায়।

বিপ্লবী পার্টিতে ও আন্দোলনে সর্বদাই মতপার্থক্য থাকে, তা টুএলএস-এ পরিণত হতে পারে। এই টুএলএস আংশিক, খণ্ডিত, এমনকি সামগ্রিক চরিত্র বিশিষ্ট কিন্তু এখনো সামগ্রিক নয় এমন হতে পারে। আন্দোলন অভ্যন্তরস্থ সংগ্রাম সবই এক চরিত্রের নয়। বরং ব্যাপকভাবে তা তার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যাকে আমরা তার অন্তঃ সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করতে পারি। সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের থেকে এই অন্তঃ সংগ্রামের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। এটা হলো সামগ্রিকতা ও অংশের পার্থক্য, শ্রেণি চরিত্রের পার্থক্য, বিপ্লব বর্জন ও বিপ্লবী থাকার পার্থক্য।

কিন্তু অন্তঃসংগ্রামেও ভুলটা ভুলই, সেটা সঠিক নয়। এবং ভুল মত/পলিসি/কৌশল/লাইন সর্বহারা শ্রেণিকে সেবা করে না। ফলত তা অসর্বহারা চরিত্র ধারণ করে। কিন্তু কোনটা ভুল আর কোনটা সঠিক সেটা প্রায়ই দীর্ঘ সামাজিক অনুশীলন এবং ধৈর্যশীল, নমনীয় ও সুগভীর তত্ত্বগত বিতর্ক ছাড়া নির্ধারণ করা কঠিন, প্রায়শ অসম্ভব। টুএলএস-এর তত্ত্বগত/লাইনগত সংগ্রাম, এবং অনুশীলন– এই দুয়ের মধ্য দিয়ে সঠিক/বেঠিক বেরিয়ে আসে। সুতরাং এ ধরনের সংগ্রামকে সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাথে গুলিয়ে ফেলাটা ভয়ংকর। যা কিনা সূচনাতেই মাওবাদী আন্দোলনকে গ্রাস করে। এভাবে লাইন বিনির্মাণ ও পার্টি-গঠন দুটোই শুরু থেকেই সঠিক দিশা হারিয়ে ফেলে।

এর ফলে প্রকৃত সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম, যার কেন্দ্র তখন ছিল মনি-মোজাফ্ফর চক্রবিরোধী সংগ্রাম, সেটাই গুরুতরভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং লাইন-বিনির্মাণকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

ঘ) <u>মতাদর্শগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেলা</u>

উপরে আলোচিত অন্তঃমাওবাদী সংগ্রামে বিভেদ শুধু এ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। সংশোধনবাদবিরোধী আদর্শগত/মতাদর্শগত সংগ্রাম আর রাজনৈতিক সংগ্রামকে কার্যত গুলিয়ে ফেলা হয়।

"সংশোধনবাদী মানেই প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী বা শত্রু"– এই ধরনের সূত্র মাওবাদী আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়। এর ফলশ্রুতিতে যে মাওবাদী কেন্দ্রগুলো একে অন্যকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করলো, তারা কার্যতঃ পরস্পরকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবী হিসেবেও মূল্যায়ন করে বসলো। স্বভাবতঃই যারা মূলত মাওবাদী নয়, কিন্তু মাওকে তুলে ধরতো, এমনকি মাওচিন্তাধারার বিভিন্ন অমাওবাদী ব্যাখ্যা দিত, অথবা নিজেদেরকে মার্কসবাদী দাবি করতো এমনসব ক্ষুদে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগঠন-কেন্দ্রকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মূল্যায়ন করলো। এভাবে দ্বন্দ্বের দুই প্রকৃতিকে গুলিয়ে ফেলার গুরুতর ভুল করা হয়। যা যুক্তফ্রন্ট গঠনের কাজকেও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। যদিও '৭৪-সাল পর্যন্ত বিস্তৃত মাওবাদী আন্দোলনের এই ১ম পর্বের সময়কালে আমাদের পার্টিসহ বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে খণ্ড খণ্ডভাবে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে এভাবে গুলিয়ে ফেলার গুরুতর ভুল পথ থেকে বেরুবার প্রয়াশ পেয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত ভুল লাইন থেকে কখনোই বিচ্ছেদ ঘটেনি। তত্ত্বগত পরিসরে অস্পষ্টতা থেকে বের হতে না পারার কারণে অন্তত তত্ত্বগতভাবে 'প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী' লেবেল করার মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ধারা থেকে এ সময়কার মাওবাদী আন্দোলন বেরুতে ব্যর্থ হয়।

– একটি সংগঠন/কেন্দ্র নিজেকে মতবাদিকভাবে কোন ধারার অনুসারী বলে দাবি করছে সেটা তার সাথে আমাদের সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তার সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামের ও সম্পর্কের জন্য মূল বিষয় এটা নয়। এটা নির্ধারিত হয় তার প্রকৃত শ্রেণি চরিত্র ও প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা।

আজকের যুগে যখন নিপীড়িত শ্রেণি/জাতির কাছে পুঁজিবাদের মতবাদ তার গুরুত্ব হারিয়েছে তখন এইসব জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তি আন্দোলনে বেশি বেশি করে মতবাদিকভাবে মার্কসবাদের দ্বারস্থ হয়। বিশেষত গত শতকে ষাট/সত্তর দশকের বিশ্বব্যাপী গণউত্থানের সময়কালে সারা বিশ্বজুড়েই সংগ্রামরত বহুবিধ শ্রেণি/গোষ্ঠী নিজেদেরকে মার্কসবাদী, এমনকি মাওবাদী দাবি করতে থাকে। এটা কোনো খারাপ বিষয় নয়, বরং কমিউনিস্ট আদর্শেরই এক জগতজোড়া ইতিবাচক অগ্রগতির ফল। এটা এখনো বিশ্বের সব জায়গাতেই দেখা যাবে। যা বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগতি ও গণসংগ্রামের জোয়ারের সময়ে আরো বেড়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবে একটি সংগঠন/কেন্দ্র নিজেকে কমিউনিস্ট/মাওবাদী দাবি করলেই সে মাওবাদী হয়ে যাবে– এটা কেউ আশা করবে না। বিপুল পরিমাণে সংগঠন সর্বহারা শ্রেণির মতবাদকে গ্রহণ করা বা আত্মস্থ করা, এবং বিশেষভাবে

প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মাওবাদ থেকে দূরেই থেকে যায়। তারা বিপ্লবী সর্বহারা পার্টি হবার বদলে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী, বা বিপ্লবী গণতন্ত্রী, অথবা সংস্কারবাদী ধরনের গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবেই থেকে যায়– যারা কিনা মার্কসবাদ/মাওবাদের প্রভাবে প্রভাবিত এবং তার অনেক উপাদান নিজেদের মতাদর্শ ও রাজনীতিতে মিশিয়ে দেয়। তবে এটাও সত্য যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের নিজেদের চক্রান্তের অংশ হিসেবে এ জাতীয় কিছু সংগঠন খুলে দিতে পারে। কিন্তু সেটা সামগ্রিকভাবে সুপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একটা পার্টিকে আমরা তার ঘোষিত ও অনুশীলিত রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা মূল্যায়ন করতে এবং তার ভিত্তিতেই তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য। কোনো রকম আত্মগত মূল্যায়ন দ্বারা চালিত হয়ে এই সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করলে তা আমাদের রাজনৈতিক লাইনে বড় সমস্যা আকারে উপস্থিত হবে। এ ধরনের সংগঠন তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক/প্রগতিশীল/ এমনকি মধ্যবিত্ত বিপ্লবী লাইন দ্বারা বিপুল সংখ্যক সংগ্রামী জনগণকে নিজেদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে– যারা সর্বহারা পার্টির মিত্র হিসেবে– আংশিক বা সামগ্রিক, সাময়িক বা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী– কাজ করতে পারে।

এই ধরনের সংগঠন নিজেদেরকে মার্কসবাদী দাবি করায়, এমনকি অনেকে মাওবাদী পার্টি দাবি করায় তারা যদি মূলত ক্ষুদে বুর্জোয়া মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে উপস্থাপন করে, তাহলে তারা সারবস্তুগতভাবে সংশোধনবাদকেই নিয়ে আসতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তাদের এই সংশোধনবাদের সাথে একটা দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শগত/তাত্ত্বিক সংগ্রামের প্রয়োজন অবশ্যই থাকবে, থাকবে রাজনৈতিক সংগ্রামও, কারণ, সংশোধনবাদের প্রভাব তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য, কম বা বেশি করে। কিন্তু এ সংগ্রাম সব মিলিয়ে জনগণের মধ্যকার সংগ্রাম, এ দ্বন্দ্বকে অবৈরী দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখতে হবে।

সংশোধনবাদ হলো মার্কসবাদবিরোধী মতবাদ। তাই, তা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ, অসর্বহারা মতবাদ। এ কারণে সর্বহারা মতবাদ/মতাদর্শ তার সাথে মিলমিশ করে নিতে পারে না। মার্কসবাদকে আদর্শগত ও তত্ত্বগতক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী একরোখা সংগ্রাম সংশোধনবাদের সকল রূপের বিরুদ্ধে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তার সাথে রাজনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপে সর্বদাই বৈরী। এটা নির্ভর করে প্রতিটি সংগঠনের নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর।

অবশ্যই মতবাদিক প্রশ্ন ও রাজনৈতিক প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু সম্পর্কটা সরলরৈখিকও নয়। যাকিনা মাওবাদী আন্দোলন মূলত মনে করেছে।

– ষাট-সত্তর দশকে সংশোধনবাদের প্রধানতম কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হবার কারণে রুশ সংশোধনবাদবিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রাম সেসময়ে একইসাথে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে মিলে গিয়েছিল। তাই, শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্যই নয়,

আমাদের মত সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশে রুশ সংশোধনবাদ বিপ্লবের শত্রুর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু একারণে মতবাদিক সংগ্রামের সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামকে একাকার করে ফেলা যায় না।

যেমন, ৭০-দশকের পরে হোক্সাপন্থা কট্টর মাওবাদবিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কট্টর মাওবাদবিরোধিতা তাদের রাজনৈতিক লাইন ও কর্মসূচিকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরকে সর্বত্র ও সর্বদা বিপ্লবের শত্রু কাতারে ফেলে দেয় না। তা নির্ভর করে সবকিছু মিলিয়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি নির্দিষ্ট সময়ে কী রাজনৈতিক কর্মসূচি ধারণ ও প্রয়োগ করছে তার উপর।

আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশ, যেখানে বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক, সেখানে এই প্রশ্নের গুরুত্ব খুবই বেশি। কারণ, এখানে বহু বিভিন্ন বুর্জোয়া মতবাদিক রাজনীতির সাথে সর্বহারা পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের কাজ করতে হবে। কিন্তু এর গুরুত্ব যে শুধু বিপ্লবের এই স্তরের জন্য তা নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এর গুরুত্ব থাকবে। বহু মতবাদিক সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে পরিচালনা করতে হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট, অবৈরী সম্পর্ক, সমঝোতা– ইত্যাদি সেখানে থাকতে হবে। কেউ যদি সারমর্মে মাওবাদী না হয়, সারমর্মে সমাজতন্ত্রী না হয়, কিন্তু নিজেকে দাবি করে মাওবাদী বা সমাজতন্ত্রী, তাহলে তার ঘাড় ধরে আমরা দাবি করতে পারি না যে সে নিজেকে মাওবাদী দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা তার সাথে কোনো অবৈরী বা সমঝোতামূলক সম্পর্কে যাবো না। তেমনি কেউ যদি আদর্শগতভাবে মাওবাদকে ভুল মনে করে, তার বিরোধিতা করে, তাহলেও আমরা তার সে অবস্থান পরিত্যাগ না করলে তার সাথে কোনো সম্পর্কে যাবো না বলে পণ করতে পারি না। রাজনৈতিক শক্তির সাথে, সে যে-ই হোক, সম্পর্ক সর্বদাই নির্ধারণ করতে হবে সবমিলিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তার রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে, তার শ্রেণি চরিত্রের ভিত্তিতে। কেউ নিজেকে যা-ই দাবি করুক না কেন, যদি বিপ্লবের শত্রুদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের সাথে তার সম্পর্কযুক্ত থাকার অকাট্য প্রমাণ আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা তার শ্রেণি চরিত্র ও রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে তাকে মূল্যায়ন করবো এবং সম্পর্ক নির্ধারণ করবো। কিন্তু আমরা মতাদর্শগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে একাকার করে ফেলে তখন গুরুতর ভুল করেছি যার ফল বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি ডেকে এনেছে এবং বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরাট উপকার করেছে।

– উপরোক্ত ভুলের কারণে ষাট-সত্তর দশকে মাওবাদীরা অন্য বহু সংখ্যক মাওবাদী বা কমিউনিস্ট দাবীদার মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্র সম্পন্ন, কিন্তু বাম প্রগতিশীল দলের সাথে সম্পর্ক কার্যত বৈরী করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ভিন্ন-ধারার প্রকৃত মাওবাদীদেরকেও সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করার ফলে তাদেরকেও প্রায় শত্রুর কাতারে ফেলে দিয়েছে। এটা একটা বড় মৌলিক কারণ যে, কেন '৭১-সালের

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বহু বামপন্থী ও মাওপন্থী সংগঠন ও শক্তি খণ্ড খণ্ডভাবে যে সংগ্রাম করেছিল তা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ও আওয়ামী-ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটা জোটে আসতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও নিজেদের মাঝে সংকীর্ণতাবাদী বৈরী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বারও উপক্রম হয়। '৭৪-পর্যন্ত যে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন সারা দেশকে প্লাবিত করেছিল, তার প্রধানাংশ মাওবাদী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও কেন তা একটা জোটবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। তা যদি হতো, তাহলে '৭১-সালে বা তার পরে এদেশের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো। এমনকি তা বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে আসার প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যকার লাইনগত সংগ্রামকেও গভীর করার শর্ত সৃষ্টি করতে পারতো এবং একটি সঠিক লাইন বিনির্মাণ এবং একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনে তা ভুমিকা রাখতে পারতো। দুঃখজনকভাবে এই পর্বে-তো সেটা হয়ইনি, পরবর্তীকালে এর জের মাওবাদী আন্দোলন বিগত শতক জুড়েই বহন করেছে– কম বা বেশি করে– যা এমনকি এখনো তার কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

উপরোক্ত সমস্যাবলীর কারণে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই একটা সামগ্রিক সঠিক লাইন বিনির্মাণের সঠিক প্রক্রিয়া থেকে এই আন্দোলন বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকস্থায়ী সংগঠন ছাড়াও এ আন্দোলন '৭১-সালের মধ্যে প্রধান যে চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল সেগুলোর থেকে বিভিন্ন সময়ে ছোট/বড় বিভিন্ন অংশ ছিটকে আন্দোলন থেকে বেরিয়ে গেলেও এই চারটি ধারা মূলতঃ '৭৪-সাল পর্যন্ত এই প্রথম পর্বের সার্বিক বিপর্যয় দৃশ্যমান না হওয়া অবধি মাওবাদী বিপ্লবী শিবিরের মধ্যে সক্রিয় থাকে।

এই চারটি ধারা এদেশে সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ হিসেবে মাওবাদকে প্রতিষ্ঠা করায় বিভিন্নমূখী ও মাত্রার ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তারা ক্রুশ্চভ-ব্রেজনেভ সংশোধনবাদ ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে সংগ্রাম করে, জিপিসিআর-কে তুলে ধরে, নয়া গণতন্ত্রকে তুলে ধরে, সংসদীয় ধারার মুখোশ উন্মোচন করে, এবং সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এভাবে তারা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ধারার বিপরীতে এক বিপ্লবী গণমুখী রাজনীতির ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে, এজন্য বিপুল ত্যাগ ও অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করে, অসংখ্য নেতৃত্ব ও কর্মী-জনগণ এর জন্য অতুলনীয় বিপ্লবী দৃঢ়তায় জীবন বিসর্জন দেন এবং গণবিপ্লবী সংগ্রামের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন।

কিন্তু উপরেই আলোচিত হয়েছে যে, এই মাওবাদী ও বিপ্লবী কাঠামোর মধ্যে এই সময়কার আন্দোলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও সমগ্র আন্দোলনেই রাজনৈতিক লাইনে বিভিন্ন বিচ্যুতি কাজ করেছে যা একদিকে মাওবাদী আন্দোলনকে বিভক্ত

রেখেছে, অন্যদিকে বিপ্লবী সংগ্রামকে আরো এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। এবং একটি ঐক্যবদ্ধ একক শক্তিশালী মাওবাদী পার্টি গঠনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

আমরা এখন মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীতে আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের ত্রুটিগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবো।

রাজনৈতিক সমস্যাবলী

১। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা

মাওবাদী আন্দোলন সমগ্রভাবে তার সূচনাতেই আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছে, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো ব্যাপকভাবে বিরাজমান। একইসাথে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি যেখানে বিকাশ লাভ করেছে। এই ধরনের সমাজকে সাধারণভাবে আধা/নয়া উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলে চিহ্নিত করাটাও সে সময়ে সঠিক ছিল। সেকারণে সঠিকভাবেই মাওবাদী আন্দোলন বিপ্লবের স্তরকে নয়া গণতান্ত্রিক বলে নির্ধারণ করতে পেরেছিল। এবং শ্রেণি বিশ্লেষণ ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণ রণনৈতিকভাবে মূলগতভাবে সঠিক ছিল।

কিন্তু সমাজ-বিশ্লেষণে অনেকগুলো গুরুতর সমস্যা তখন থেকেই মাওবাদী আন্দোলনে গড়ে উঠেছিল, যা মাওবাদী আন্দোলনকে বিভক্ত করতে ও বিভক্ত রাখতে শুধু শর্ত জুগিয়েছে তা নয়, বরং পরবর্তী সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তার কোনো ইতিবাচক মীমাংসাও হয়নি। বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক) একদিকে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, অন্যদিকে জাতীয় সমস্যার বিশেষত্বকে না বোঝা ও গণ-আকাঙ্ক্ষাকে ধরতে না পারা

মাওবাদী আন্দোলন শুরু থেকেই সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও রূপের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাকালে পূর্ব বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ) তৎকালীন অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার বাস্তব কারণে শুধু পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে মাওবাদী আন্দোলন বিকশিত হয়। এটা একটা বাস্তব কারণ ছিল বটে, কিন্তু একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী পার্টি হিসেবে শুরু থেকেই সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার নীতি ও বাস্তব পদক্ষেপসমূহ না নিয়ে শুধু পূর্ব বাংলাভিত্তিক লাইন হাজির করার মাঝে শুরুতেই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছিল। পূর্ব বাংলা ভিত্তিক লাইন হাজির করার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি

জাতীয় নিপীড়ন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পেক্ষাপট গুরুতর বাস্তব শর্ত সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু সেটা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারাকে যুক্তিযুক্ত করে না ।

মাওবাদী ধারাগুলোর মাঝে এই প্রথম পর্বে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইনে পূর্বাপর জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছে। কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি তার পৃথক সত্তা গড়ে তোলার একটা প্রধানতম তাত্ত্বিক ভিত্তি পেয়েছিল এই জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি থেকে। পার্টি পূর্ব বাংলার অতীত সমাজ বিশ্লেষণেও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি দ্বারা চালিত হয়। পার্টি মূল্যায়ন করেছিল যে, বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বটি একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব ছিল, এবং এর দ্বারা পার্টি বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে ভারতবর্ষের বিভক্তির পক্ষে একটি ন্যায্যতা খুঁজে পায়। এটা কার্যত তৎকালীন মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে সৃষ্ট একটি বিচ্যুতি ছিল, যার উৎস ছিল বস্তুর সারমর্মকে না দেখে তাকে উপরি উপরি দেখার মধ্যবিত্ত প্রয়োগবাদী সমস্যা।

দৃষ্টিভঙ্গির এই সমস্যাই ষাটের দশকের শেষার্ধে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনায় পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি জাতীয় নিপীড়নের সমস্যাকে দেখার ক্ষেত্রে কার্যত লেনিনবাদ থেকে সরে যায়। এই অভ্যন্তরীণ জাতীয় সমস্যাকে পার্টি উপনিবেশিক সমস্যা আকারে চিহ্নিত করে, যার সমাধান আকারে পার্টি পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি আকারে হাজির করে। এটা সাম্রাজ্যবাদের যুগে উপনিবেশিক সমস্যার সাধারণ সমস্যার সাথে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ জাতীয় সমস্যাকে প্রায় একাকার করে ফেলে এবং এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে বড় বিতর্ক ও বিভক্তির জন্ম দেয়।

যদিও '৭১-সালের ১ মার্চে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর নতুন ষড়যন্ত্রের মুখে সমগ্র জাতি ও জনগণ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কর্মসূচিতে নতুন এক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এরই ফলশ্রুতিতে শেখ মুজিব-আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব চরম সংকটে পড়ে, এরই এক পর্যায়ে ২৫ মার্চে ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে দমনের জন্য সমগ্র জাতি ও জনগণের উপর এক সার্বিক গণহত্যা নামিয়ে আনে, এবং ২৫ মার্চের পর শেখ মুজিবের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরাও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কর্মসূচি আনতে বাধ্য হয়, সেরকম এক বিশেষ অবস্থায় মাওবাদীদের পক্ষ থেকেও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অধীনে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচি আনাটাই সঠিক ছিল, এবং মাওবাদী আন্দোলনের অন্য ধারাগুলোও বেশিরভাগ সেটা বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এনেছিল, কিন্তু কেউই একে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্থাপন করতে পারেনি। যে কারণে

আন্তর্জাতিকতাবাদী সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে না পারায় জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি বিভিন্ন রূপে সমগ্র আন্দোলনে বিরাজমান থাকে। এই মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিরই একটা নিকৃষ্ট ও বিপরীতধর্মী বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আঃ হক নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি/এমএল-এর মূল নেতৃত্বের একটি অংশ দ্বারা ভারত-সোভিয়েতের আগ্রাসনকে বিরোধিতার ন্যায্য অবস্থান থেকে পাকিস্তান রক্ষার প্রতিরোধ যুদ্ধ-লাইন আনবার ভয়ানক ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। যা কিনা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে ব্যর্থই শুধু হয়নি, তা থেকে উদ্ভূত জনগণের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায্য বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

'৭১-সালের শেষ দিকে যখন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মদদে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় বাঙালি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়, এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে "বাংলাদেশ" রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তখন মাওবাদী আন্দোলনের প্রধানতম অংশই পুনরায় জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির আরেকটি নবঅধ্যায়ের সূচনা করে। এসবই পরবর্তীকালে সার্বিক বিপর্যয়সৃষ্ট প্রতিকুল সময়ে একটা প্রধানতম অংশের দ্বারা রুশ-ভারত অক্ষের বিপরীতে শাসক শ্রেণির মধ্যকার মার্কিনের দালালদের ক্ষমতা দখলকে সমর্থন করে এবং তার সাথে যুক্তফ্রন্টের নামে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে বিলীন হবার ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল।

অবশ্য পূবাকপা ধারাটি উপরোক্ত ধরনের জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার রাজনৈতিক লাইন কখনো আনেনি। এমনকি আমাদের পার্টি ব্যতীত অন্য কোনো ধারা '৭১-পূর্বকালে আমাদের মত করে ঔপনিবেশিক সমস্যা বলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করবার জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিপূর্ণ রাজনৈতিক লাইনও আনেনি। কিন্তু অপরাপর ধারাগুলো সবাই একদিকে পূর্ব বাংলাভিত্তিক লাইন পেশের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির সমস্যায় একইভাবে আক্রান্ত হয়, অন্যদিকে তারা পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার বিশেষত্বকে কার্যত গুরুত্বহীন করে বা এড়িয়ে চলে। বড় জোর তার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিয়ে তারা বাস্তব কর্মসূচিতে তাকে কার্যত উহ্য করে দেয়। এভাবে চীন বা ভারতের মত একটি আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের থেকে পূর্ব বাংলার সমাজের তৎকালীন প্রধানতম বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং গোড়ামীবাদীভাবে অবিকল চীন বা ভারতের মত করে সমাজের বিশ্লেষণ হাজির করে, যা তাদেরকে '৭১-সালের জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় লেজেগোবরে পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত করে। সমগ্র জাতি যখন পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে প্রতিরোধ করছিল, তখন তাদের একটা অংশ (যেমন, পূবাকপা ধারা) সামন্তবাদকে প্রধান করে সংগ্রামের লাইন হাজির করে। কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ চালায়। কেউবা রুশ-ভারতের আগ্রাসন ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তান-রক্ষার প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাবার গণ-আকাঙ্ক্ষাবিরোধী লাইনে

পরিচালিত হয়। এভাবে সমাজের গোড়ামীবাদী বিশ্লেষণ তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

– একইভাবে তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিশেষ চরিত্র বুঝতেও ব্যর্থ হয়। ভারত যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, তাই, তারা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ভারতের বিশেষ আগ্রাসী সমস্যাকে স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করে। এবং তাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তৎপরতার নিছক নির্দেশ পালনের মত করে গুরুত্বহীন করে দেয়। অন্যদিকে আমাদের পার্টি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে, এবং '৭১-সালে ও পরবর্তীকালে তার সম্প্রসারণবাদী ভূমিকাকে কার্যত সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক সমস্যার সাথে একাকার করে ফেলে।

এভাবে মাওবাদী আন্দোলনে সমাজের বিশেষত্বকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ও সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে না বোঝার থেকে উদ্ভূত যান্ত্রিক ও বাস্তববিচ্ছিন্ন লাইন ও মূল্যায়ন সার্বিকভাবে সঠিক একটি আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন হাজিরে ব্যর্থ হয়। যা কিনা মাওবাদী আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হিসেবে, এবং পরবর্তীকালে অনেক রাজনৈতিক অধঃপতনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

খ) ভূমি সমস্যা ও শ্রেণির রূপান্তর/শ্রেণি বিশ্লেষণ

মাওবাদের অনুসরণে কৃষি-অর্থনীতিকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক মূল্যায়ন করা এবং "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি-সংস্কারের কথা বললেও পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষতঃ কৃষি অর্থনীতির উপর মূর্ত নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও আলোচনা আনতে মাওবাদী আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয়। এটা একইসাথে গ্রামাঞ্চলের তথা সমগ্র সমাজের শ্রেণি সজ্জাতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে।

এই রূপান্তরকে যথেষ্ট গভীরভাবে আলোচনা দূরের কথা, তার সাধারণ স্বীকৃতিও মাওবাদী আন্দোলনে পাওয়া যায় না। আমাদের পার্টিতে কমরেড এসএস (সিরাজ সিকদার) আমলের শ্রেণি বিশ্লেষণ দলিলে এমনকি জমিদার শ্রেণির উল্লেখও দেখা যায় যাকিনা এসেছিল কার্যত চীনা সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণকে প্রায় হুবহু অনুকরণ করার থেকে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ও বুর্জোয়া ধারা থেকে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের উপর বেশ কিছু লাইন ও বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে বাস্তব তথ্য-উপাত্ত সহকারে এবং তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দ্বারা তেমন একটা খণ্ডন মাওবাদী আন্দোলন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন যতটা বিতর্ক করেছে রাজনৈতিক লাইন দ্বারা, ততটাই কম আলোচনা করেছে অর্থশাস্ত্রের উপর। এটা মাওবাদী আন্দোলনের একটি গুরুতর দুর্বলতা ছিল যাকে কখনই সে কাটাতে

পারেনি। বরং সেটা কাটাতে পারার আত্মগত সামর্থ্য মাওবাদী আন্দোলনের দিন দিন কমে এসেছে।

গ) আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ

একই ধরনের দুর্বলতা আমরা পাবো আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ ও অবস্থান আলোচনা করার ক্ষেত্রেও।

পূর্ব বাংলার সমাজে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ও তার স্থান সম্পর্কে কোনো গভীর আলোচনা ও মূল্যায়ন মাওবাদী আন্দোলন করতে পারেনি।

সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ– এই তিন মৌলিক শত্রুকে একদিকে 'এক ও অবিভাজ্য' বলা হয়, অন্যদিকে এর বিরোধিতা করতে গিয়ে এই তিন মৌলিক শত্রুর পরস্পর জড়ানো ও নির্ভরশীল সম্পর্ক এবং আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির স্বতন্ত্রতাকে অবহেলা করা হয়।

কম.এসএস মাওকে অনুসরণ করে তাঁর রচনায় 'আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার কোনো ভাল আলোচনা আমাদের পার্টিসহ কোনো কেন্দ্রই সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে করেনি। বরং সমস্ত ধারাগুলোই অভ্যন্তরীণ শত্রু শ্রেণি হিসেবে 'সামন্ত শ্রেণী'-কে গুরুত্ব দেয়।

এ কারণেই মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোর আলোচনায় কোথাও আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে। বিপ্লবকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লব। আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিকে এখানে দেখানো হয় না। যদিও মাওবাদীরাই এদেশে সর্বপ্রথম আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণিকে বিপ্লবের শত্রু শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং জাতীয় বুর্জোয়াকে তার থেকে পৃথক করেছে। মাওবাদীরাই তিন শত্রু বা ছয় পাহাড়– এ জাতীয় সূত্রায়ন দ্বারা আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকে চিহ্নিত করেছে।

– সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশীয় অভ্যন্তরীণ শত্রু শ্রেণি হিসেবে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তার ভূমিকার ভাল কোনো আলোচনা মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে তেমন একটা হয়নি। বরং তার চেয়ে জোরালো হয়ে উঠে এসেছে সামন্তশ্রেণির কথা, যাকিনা চীনের মত হুবহু দেখার একটা প্রবণতা থেকে মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজ করছিল। এটা বাস্তব সম্মত ছিল না, যদিও গ্রামাঞ্চলে সামন্তশ্রেণির আলোচনাটা দরকারি অবশ্যই ছিল।

২। বিপ্লবী রাজনীতি

আদি কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষতঃ ক্রুশ্চভীয়-মনিসিং সংশোধনবাদের সুদীর্ঘকালীন সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ এবং সংসদীয়বাদের বিপরীতে মাওবাদী আন্দোলন শুরু থেকেই বিপ্লবী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু তাই নয়, তারা মাওবাদী দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথকেও গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি তারা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিপ্লবী রাজনীতিকেও গ্রহণ করে। এরই অনুসরণে কিছু আগে বা পরে সবগুলো মাওবাদী ধারাই গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে বাস্তব সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পথেও এগিয়ে যায়, যদিও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার উপলব্ধি ও প্রয়োগের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য ও অসমতা ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে '৭৪-পর্যন্ত বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক মহান জোয়ার সারা দেশকে প্লাবিত করে।

কিন্তু এই বিপ্লবী রাজনীতিকে গ্রহণ করলেও এ সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবেই বিভিন্ন দুর্বলতা ও বিচ্যুতি মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজ করছিল। খোদ বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে উপলব্ধির এই দুর্বলতা এ সময়কার বিপ্লবী আন্দোলন, তথা গণযুদ্ধকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো সম্বন্ধে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ক) কৃষক সমস্যা, তথা কৃষি বিপ্লব ঃ

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব গ্রহণ করার কারণে মাওবাদী আন্দোলনের সকল ধারাগুলোই কৃষক সমস্যার কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে ও কৃষি বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অনুশীলনে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা তার বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুতর সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত ছিল। এভাবে বিপ্লবী রাজনীতিকে বেশ পরিমাণে দুর্বল করে তুলেছিল।

আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে ভুলভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করার কারণে কৃষি বিপ্লবের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব লাইনগতভাবেই কমে গিয়েছিল। আমাদের পার্টিতে শ্রেণি লাইনের বিচ্যুতির কারণে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভিত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তা কৃষক সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। ইপিসিপি-উদ্ভূত অন্য ধারাগুলোতে কৃষক সমস্যাকে দেখা হয়েছিল অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমাদের পার্টি ও পূবাকপা গণযুদ্ধকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বিপ্লবী ক্ষমতা দখলকে সঠিকভাবেই গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু কৃষকের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির প্রশ্নটিতে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এসব কারণেই "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই মূল কর্মসূচিটিকে উল্লেখ করলেও কৃষকের প্রকৃত সমস্যাবলি ও তার ভিত্তিতে কর্মসূচিগুলোতে গভীরভাবে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি-বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরাটিই এর মূল কারণ। যার ফলে সমগ্র আন্দোলনেই বিপ্লবী রাজনীতি দুর্বল থাকে, যা আমাদের আন্দোলন ও গণযুদ্ধ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারার একটা বড় কারণ।

খ) বিপ্লবী রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমার্থক মনে করা ঃ

দীর্ঘকালীন সংসদীয়বাদ ও অহিংস অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে বিপ্লবী রাজনীতির প্রশ্নে

মৌলিক ইতিবাচক উল্লম্ফনমূলক অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু এটা সংগ্রাম ও সংগঠনের রূপের ক্ষেত্রে যতটা স্পষ্ট ছিল, মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ততটা ছিলনা। ফলে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে অতীতের সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদের সাথে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের বদলে সংগ্রামের রূপের উপর অধিক গুরুত্ব পড়ে। এর ফলে মাওবাদী আন্দোলন বিপ্লবী রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমার্থক মনে করার এক নতুন বিচ্যুতিতে ভুগতে শুরু করে।

এর দ্বিমুখী কুফল আমরা লক্ষ্য করি গোটা মাওবাদী আন্দোলনে। এক: যেকোনো সময়ে সশস্ত্র সংগ্রাম না করলেই তাকে বিপ্লবী রাজনীতি থেকে খারিজ করে দেয়ার সংকীর্ণতাবাদী ভুল। ফলত গণযুদ্ধের বিপ্লবী প্রস্তুতির গুরুত্বকে না বোঝা। এবং বিভিন্ন বিপ্লবী শক্তি, যারা এখনো সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েনি, তাদের সাথে একটি সংকীর্ণতাবাদী বিভেদাত্মক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া। দুই: সশস্ত্র সংগ্রাম করলেই তাকে বিপ্লবী রাজনীতি মনে করা। ফলত সশস্ত্র সংস্কারবাদের সাথে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম, তথা গণযুদ্ধের রাজনীতিগত পার্থক্য করতে না পারা।

বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে এই অপরিপক্ক উপলব্ধি ব্যাপকভাবে মাওবাদী আন্দোলনের রাজনীতিকেই দুর্বল করে ফেলেছে। যা আমরা পরবর্তীকালে আরো যান্ত্রিকভাবে বিকশিত হতে দেখবো।

গ) সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ ঃ

উপরোক্ত কারণেই আন্দোলনে একটা সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতি শুরু থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষতঃ ইপিসিপি/এমএল ধারার মাঝে আদি অর্থনীতিবাদের ব্যাপক প্রভাবের কারণে, ও তার সাথে বিপ্লবী বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হওয়ায় এই ধারা থেকে উদ্ভূত কেন্দ্রগুলো সশস্ত্র সংগ্রামে নামলেও গণলাইনের নামে, কৃষকের আশু/অর্থনৈতিক ইস্যুর আন্দোলনকে তারা যতটা গুরুত্ব দেয় (অবশ্যই এখন সশস্ত্র ধারায়), ততটাই কম গুরুত্ব দেয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য গণযুদ্ধকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে।

পূবাকপা/সিএম-পন্থী ও পিবিএসপি ধারায় উপরোক্ত ধরনে আদি অর্থনীতিবাদের ধারাবাহিকতার প্রভাব কম থাকলেও তাদের দ্বারা গৃহীত খতম-লাইনের নেতিবাচক বিকাশ, এবং ঘাঁটি-প্রশ্নে অস্বচ্ছতা ও বিচ্যুতি ভিন্ন ধরনে সশস্ত্র সংস্কারবাদ/অর্থনীতিবাদের জন্ম দেয়। খতম ক্রমান্বয়ে প্রতিশোধবাদ বা খারাপ লোক উচ্ছেদের এ্যাকশনবাদ রূপে গড়ে উঠতে থাকে এবং বিপ্লবী ক্ষমতাদখলের রাজনীতিকে দুর্বল করে দেয়। আর ঘাঁটি থেকে বিচ্যুতি বিপ্লবী ক্ষমতা দখলকে দূরবর্তী, বা দেশব্যাপী বিস্তৃতির শর্তাধীন করে ফেলে। এভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করা সত্ত্বেও বিপ্লবী রাজনীতির স্থলে সংস্কারবাদ গড়ে উঠতে থাকে।

ঘ) শীর্ষ তত্ত্ব ঃ

সারবস্তুতে অর্থনীতিবাদী এই লাইনটি মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে প্রধান ধারাগুলোর মাঝে দৃশ্যমান ছিল না, কারণ, প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল, কম/বেশি সচেতন বা অসচেতনভাবে। কিন্তু এই প্রধান ধারাগুলোর বহির্ভূত কিছু কিছু অংশের মাঝে তখনো তা বিরাজমান ছিল, যাকে কিছুদিন প্রতিনিধিত্ব করতো জাফর-রনো-মেনন, উমর, দেবেন-বাসার– ইত্যাদি গ্রুপগুলো।

এই ধারাটি কার্যত গণযুদ্ধকে পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগ্রামকে পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র পর্যায়ে নেয়া– এ জাতীয় বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের লাইনটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম যে, গণআন্দোলন একটা পর্যায়ে গড়ে তোলার পর তার শীর্ষে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের সমস্যাটা এখানে ছিল না যে, সশস্ত্র সংগ্রাম/গণযুদ্ধ শুরু করার জন্য কিছু রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন– এটা মনে করা। বরং তাদের আসল সমস্যাটি ছিল বিপ্লবী রাজনীতিকে উপলব্ধি না করায়, লেনিনের "কী করিতে হইবে"-কে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে না পারায়। ফলে বিপ্লবী রাজনীতিকে আরোপ করার বদলে তারা এক্ষেত্রে একটি অর্থনীতিবাদী ধারাকে গ্রহণ করেছিল।

১ম পর্বের উত্থান যখন বিপর্যস্ত হয় তারপর তার সারসংকলনকে কেন্দ্র করে আরো অনেক কেন্দ্র গড়ে ওঠে যারা এই ধারায় বক্তব্য রাখে। বাস্তবতঃ এটা তখন প্রধান ধারায় পরিণত হয়ে ওঠে। এই ধারানুসারীরা প্রায় সবাই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কের ঝড়ঝাপ্টায় মাওবাদ থেকে সরে পড়ে। তবে মাওবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে এটা থেকে যায়, যা আমরা বিএসডি/এমএল ধারার মাঝে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই।

৩। গণযুদ্ধ

ক) ঘাঁটি প্রশ্ন ঃ

মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনাতেই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথকে গ্রহণ করার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ার কথা ব্যক্ত করেছিল। তারা গ্রামে ঘাঁটি গড়া এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর রণনীতিকে সঠিকভাবেই তুলে ধরেছিল। কিন্তু বাস্তবত ঘাঁটি প্রশ্নটিকে বিগত শতকের মাওবাদী আন্দোলন কখনই সাধারণ তাত্ত্বিক স্বীকৃতি ব্যতীত মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে কাজে প্রয়োগের জন্য আঁকড়ে ধরেনি। ফলে এরসাথে যুক্ত একঝাঁক রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক ও মতাদর্শগত সমস্যা দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন আচ্ছন্ন হয় যার দীর্ঘস্থায়ী খারাপ প্রভাব আন্দোলনে পড়ে।

এর কারণ হিসেবে কাজ করেছে গণযুদ্ধের লাইনে ঘাঁটির গুরুত্বটিকে আমাদের আন্দোলন ধরতে পারেনি।

– "ঘাটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু"– এই মাওবাদী/মাওবাদ-সম্মত সূত্রটিকে মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে প্রথমে পেরুর পার্টি, এবং পরে 'রিম'-এর মাধ্যমে বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলন এ শিক্ষাটিকে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করেনি। তাকে সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেও তাই ব্যর্থ হয়।

প্রথমদিকে মাওবাদী আন্দোলনে তাত্ত্বিক স্বীকৃতির সাথে ঘাঁটি-প্রশ্নের যতটাও গুরুত্ব ছিল, বাস্তব অনুশীলন এগিয়ে যাবার প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট বিশেষ নীতিগুলো গড়ে ওঠার কালে তা থেকে বরং দূরে সরে পড়া হয়। অন্য দুটো ধারা– ইপিসিপি/এমএল ও বিএসডি/এমএল– যারা ততটা গুরুত্ব সহকারে কখনই গণযুদ্ধকে উপলব্ধি করেনি ও আঁকড়ে ধরেনি তাদের ক্ষেত্রে-তো প্রশ্নই আসে না, কিন্তু পিবিএসপি ও পূবাকপা– যারা গণযুদ্ধকে তুলনামূলক শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল, তারাও বরং মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বেই কার্যত ঘাঁটি-প্রশ্ন থেকে দূরে সরে যায়। আমাদের পার্টি এসএস-নেতৃত্বাধীনে এদেশের বিশেষ অবস্থার কথা বলে ঘাঁটিকে গণযুদ্ধের সারবস্তু না করে তাকে আঁকড়ে ধরার বদলে বরং দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম ছড়ানোকে আঁকড়ে ধরে, এবং ঘাঁটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভবিষ্যতের বিকাশের হাতে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে পূবাকপা "অসংখ্য ছোট ছোট সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি" তৈরীর কথা বলে বাস্তবে খতম-লাইনে সশস্ত্র সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ ও ঘাঁটিকে একাকার করে ফেলে, এ্যাকশন এলাকা, গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটির পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং একইভাবে দেশব্যাপী খতম-সংগ্রাম/সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ করাকে আঁকড়ে ধরে।

ফলত এই রাজনৈতিক ভ্রান্তি সমগ্র সাংগঠনিক ও সামরিক পরিকল্পনাকে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রণনৈতিক পরিকল্পনা ও কাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার নীতি কার্যত বর্জিত হয়।

আমাদের দেশের কিছু বিশেষ অবস্থা ঘাঁটি-প্রশ্নের রাজনৈতিক ও সামরিক উপলব্ধির দুর্বলতা সৃষ্টিতে বিশেষ শর্ত দিয়েছে সন্দেহ নেই। সমতলভূমি, ছোট দেশ, ঘনবসতি, পাহাড়-জঙ্গল না থাকা (পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অঞ্চলটি বাদে)– এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃসন্দেহে সামরিক রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণে গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু যে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, গণযুদ্ধ/সশস্ত্র সংগ্রাম ক্ষমতা দখলকে ঘিরে আবর্তিত যদি না হয়, যার রূপকে অবশ্যই হতে হবে আগে অনুকূল জায়গায় ক্ষমতা দখল করে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা, যাকিনা আমাদের মত দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের দেশে গুণগতভাবে পৃথক তাৎপর্যসম্পন্ন, তাহলে তা বিপ্লবী রাজনীতিকে দুর্বল করে দেবে। তাই, গণযুদ্ধ যে দেশে যে সময়েই যে শক্তি নিয়েই শুরু করা হোক না কেন, তাকে অনুকূল রাজনৈতিক-সামরিক-ভৌগোলিক অঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে ঘিরেই আবর্তিত হতে হবে। এটা

ভবিষ্যতে আপনাআপনি গড়ে ওঠার বিষয় নয়, বরং যুদ্ধের একেবারে সূচনা থেকে, এমনকি তার প্রস্তুতি পর্যায় থেকে এই কর্তব্যকে কেন্দ্রে রেখে যাবতীয় রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে যাবতীয় তৎপরতা পরিচালনা করতে হবে।

'৭১-সালের বিশেষ অবস্থায় আমাদের পার্টি বরিশালের পেয়ারাবাগান অঞ্চলে খুব অল্প একটি সময়ের জন্য ছোট একটি এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। অন্যান্য মাওবাদী ধারাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে ছোট/বড় ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল বইকি। কিন্তু একে অতিরঞ্জিত করা যায় না। কারণ, এটা ঘাঁটি প্রশ্নে সাধারণ স্বীকৃতির একটা বিশেষ অবস্থার প্রয়োগের চেয়ে খুব একটা উচ্চতর কিছু ছিল না। এটা পার্টিগুলোর লাইনকে কোনোভাবেই বিকশিত করেনি। বরং আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে তা নেতিবাচকভাবে বিকশিত হয়েছিল।

'৭১-এর বিশেষ অবস্থায় যখন রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়েছিল, তখন ক্ষমতার শূন্যতার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য শুধু মাওবাদীরাই নয়, বহু শক্তিই পদক্ষেপ নেয়। এমনকি আওয়ামী ধারার কাদের সিদ্দিকী বা এ জাতীয় কেউ কেউ পর্যন্ত তাদের মত করে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। '৭১-সালে এই সব সাময়িক ঘাঁটির তাৎপর্য অবশ্যই কম ছিল না। কিন্তু এটা মাওবাদী গণযুদ্ধে ঘাঁটির গুরুত্বের সঠিক রাজনৈতিক উপলব্ধির দিকে, এবং সে অনুযায়ী সামরিক-সাংগঠনিক পরিকল্পনার দিকে বিকশিত হতে ব্যর্থ হয়। আমাদের পার্টিতে দেখা যায় যে, শত্রুর দমন বৃদ্ধি পেলে পেয়ারাবাগান থেকে পশ্চাদপসরণের পর– যা সঠিক ছিল– বরং দেশব্যাপী ছড়ানো অনেকগুলো ছোট ছোট গেরিলা অঞ্চল/এ্যাকশন এলাকা হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা স্পষ্টতঃই ঘাঁটি চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চলব্যাপী শক্তি কেন্দ্রীকরণ, একক রাজনৈতিক ও সামরিক কমান্ড গড়ে তোলা, এবং বিস্তৃত গেরিলা অঞ্চল গড়ে তুলে তাকে উপযুক্ত সময়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠায় উল্লম্ফন দেয়া– এভাবে আগানো হয়নি। বরং পেয়ারাবাগান থেকে সরে আসার ও ছড়িয়ে পড়ার সঠিক পদক্ষেপটি ঘাঁটি-লাইন থেকে বিচ্যুত হবার যুক্তি হিসেবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে, '৭৩/'৭৪-সালে আরো নেতিবাচকভাবে বিকাশলাভ করে। এটা না করলে '৭১-সালে, এবং '৭৪-সালে এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারতো।

খ) খতম লাইন ঃ

মাওবাদী গণযুদ্ধের এদেশীয় ইতিহাসে খতম লাইন একটা বড় স্থান দখল করে রয়েছে। আন্দোলনের উত্থানের ইতিহাসে এর অবদানকে উপেক্ষা করা যাবে না।

এই লাইন আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিএম। তিনি বলেছিলেন খতম হলো একইসাথে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চ পর্যায় এবং গেরিলাযুদ্ধের সূচনা, যদি গেরিলা কায়দায় সে খতমটা করা হয়।

আমাদের দেশেও গেরিলা যুদ্ধ সূচনার জন্য খতম লাইনকে গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও আমাদের পার্টি কমরেড এসএস-এর নেতৃত্বে এদেশে খতম লাইন আসবার একেবারে সূচনাকালে অন্যবিধ উপায়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন। '৭০-সালের ৫ মে পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে তা সূচিত হয়। কিন্তু শিগগিরই তিনি অন্যদের মত খতম লাইন গ্রহণ করে নেন। এবং '৭০-সাল থেকেই খতম লাইনে যুদ্ধ শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা বা এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিতে বেশ কিছু স্বতন্ত্রতা থাকলেও খতম লাইন মূলত এখানে কার্যকর ছিল। পূবাকপা ধারা খতম লাইনকে, সিএম-শিক্ষার অংশ হিসেবে বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করে। অন্য দুটো ধারাও তাদের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী সংগ্রামের আওতায় খতম-এ্যাকশনকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। এক কথায় কিছু কিছু বিভিন্নতা বা স্বতন্ত্রতা থাকলেও এদেশের মাওবাদী আন্দোলন গণযুদ্ধ/সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার জন্য খতম লাইনকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল এটা বললে ভুল হবে না।

শূন্য থেকে বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য, বিশেষত কৃষকদের নিয়ে, এ্যাকশন হিসেবে খতম একটি কার্যকর পন্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত দীর্ঘকালীন সংসদীয় শান্তিপূর্ণ সংস্কারবাদী সংশোধনবাদী পথ থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রকৃত বিপ্লবী ধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খতম লাইন এদেশে ও ভারতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

– কিন্তু খতম লাইনের অন্তর্গত কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি ছিল যা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বড় সমস্যা আকারে আবির্ভূত হতে থাকে।

প্রথমত, খতম লাইনকে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার একটি সাধারণ লাইন হিসেবে আনাটা ভুল ছিল। অবশ্য আমাদের পার্টি অল্প কিছু দিনের জন্য খতম লাইন গ্রহণের পূর্বে সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার জন্য গেরিলা এ্যাকশনের অন্যবিধ রূপ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু পরে কার্যত একে সাধারণ লাইনের মতই সবাই গ্রহণ করে ও প্রয়োগ করে, যদিও তার ব্যাপকতা বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন রূপের ছিল।

খতম-লাইনের এই ত্রুটি (সূচনার সাধারণ লাইন) সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার অন্যান্য রূপকে আড়াল/দুর্বল করে দেয়। শুধু তাই নয়, একবার খতম শুরু হবার পর তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব এসে পড়ে, তাকে রণনৈতিক লাইনের মত প্রয়োগ করা হয়– যা পূবাকপা ধারার মাঝে আমরা দেখতে পাই, বিশেষত পরবর্তীকালে। আমাদের সহ অন্যান্য ধারাতেও খতমের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্যই একে স্বীকৃতি দিতে হবে যে, খতমের এই আধিক্য সত্ত্বেও, এবং লাইনগতভাবে খতমের একটি স্তরকে ভুলভাবে গ্রহণ করে নিলেও এ্যাকশনের অন্যান্য রূপগুলোকে সৃজনশীলভাবে আবিষ্কার করা ও প্রয়োগ করা, এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে সর্বব্যাপী বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এই পর্বে কমরেড এসএস সবচেয়ে সৃজনশীল গতিশীল ও সাহসী অবদান রেখেছিলেন, যা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত মাত্রাকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু একেও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, কমরেড এসএস ধারাও খতম-লাইনের এই ত্রুটির বাইরে ছিল না। যাকিনা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত বাস্তব ও আত্মগত পরিস্থিতিতে পার্টির সামরিক বিকাশে গুরুতর খারাপ ফল রাখে।

দ্বিতীয়ত, খতম লাইন শুধু সূচনার সাধারণ লাইনটি আনে তা নয়, একটি স্তর পর্যন্ত একেই এ্যাকশনের একমাত্র রূপ হিসেবে নিয়ে আসে। এ লাইন অবশ্যই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আক্রমণের কথা বলে, কিন্তু তা বলে খতমের পর, তার প্রক্রিয়ায়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদ, তথা তার প্রধান উপাদান রাষ্ট্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কেন্দ্রীভূত করণের বিপ্লবী কর্তব্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করায় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত বাধার সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ যখন আমাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা একটা পর্যায়ক্রমিক বিকাশের অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিকেও বিকশিত করে তোলে।

তৃতীয়ত, খতম শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা উচ্ছেদে এবং গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার একটা পদক্ষেপ হিসেবে আনার কথা বললেও অবধারিতভাবে এটা অত্যাচারী ও খারাপ লোককে উচ্ছেদ করবার সংস্কারবাদী/প্রতিশোধবাদী বিচ্যুতির পথকেও খুলে দেয়। এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতি নৈতিক অধঃপতনের দিকেও যেতে থাকে, যখন কিনা ঘাঁটি-প্রশ্নে বিচ্যুতি থেকে উদ্ভূত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনে দুর্বলতার কারণে পার্টির নেতৃত্বে ও বাহিনীর শক্তিতে জনগণের ক্ষমতার বদলে পার্টি-বাহিনীর ক্ষমতা গড়ে ওঠার খারাপ ধারা গড়ে উঠতে থাকে। মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বেই এ ধরনের বিচ্যুতি দেখা যায়, আমাদের পার্টিতেও, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধারা-উপধারার মাঝে ভয়াবহরূপে বিকশিত হয়েছে বলে দেখা যায়।

গ) <u>বাহিনী গঠন ও যুদ্ধের বিকাশ ঃ</u>

মাওবাদী আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরলেও বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নপর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটাতে মূলত ব্যর্থ হয়। এটা অবশ্যই যুদ্ধ বিকাশের সাথে জড়িত। কিন্তু বাহিনী গঠনের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার অভাবও এতে ক্রিয়াশীল ছিল। পক্ষান্তরে আবার বাহিনীর এ বিকাশ না হতে পারায় তা যুদ্ধের বিকাশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

শূন্য থেকে বাহিনী ও সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার কারণে '৭১-এর বিশেষ অবস্থা বাদে এই প্রথম পর্বের বাহিনী সংস্থান সাধারণভাবে ছিল অনিয়মিত

গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত সংগঠন আকারে। *(বাহিনী, গণসংগঠন, যুক্তফ্রন্ট, কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রভৃতি প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও জঙ্গল এলাকায় '৭৪ সালে ও পরবর্তী কিছু সময়জুড়ে আমাদের পার্টির অনুশীলনে কিছু বিশেষ ধরনের অগ্রসরতার চিত্র ছিল। সে বিষয়ে আমরা পরে উল্লেখ করবো। এখানে যা আলোচনা করা হচ্ছে তা মূলত সমতল-ভূমির অনুশীলনের উপর করা হয়েছে)।* এ ধরনের বাহিনী দিয়ে রাজনৈতিক কেডারদের নেতৃত্বে খতম করা যায়, এবং এই প্রথম পর্বে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রবাহিনীর উপরেও আক্রমণ করা হয়, বিশেষতঃ আমাদের পার্টিতে। এটা সফলতা ও জোয়ার আনে, সশস্ত্র শিক্ষাকে কিছুটা এগিয়ে দেয়, গেরিলা কায়দাকে কিছুটা আয়ত্তে আনে। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রধান বাহিনী হিসেবে নিয়মিত গেরিলাদের ইউনিট (নিগেদ) গড়ে তোলার উপর মনোযোগ না দিয়ে তাকে পরবর্তী স্তরের, পরবর্তীকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যদিও সংগ্রামের স্বাভাবিক বিকাশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিগেদ গড়ে তুলছিল, কিন্তু তাকে সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরে শক্তিশালী করে তোলা হয় না। বরং আমাদের পার্টি মূলত বিপরীত দিকে হাঁটে। দেশব্যাপী কাজ বিকাশের স্বার্থে আমাদের পার্টিতে এই প্রক্রিয়াটিকে '৭৪-সালে এসে দুর্বল করে ফেলা হয়। ঘাঁটি-প্রশ্নে সমস্যার কারণে রণনৈতিক অঞ্চলে শক্তি কেন্দ্রীকরণের অভাব এক্ষেত্রে সামর্থ্যের দুর্বলতা আকারেও প্রকাশিত হয়। নিগেদ বিকাশ না হওয়ার কারণে বাহিনীর চলমানতা গড়ে ওঠে না। সামরিক আত্মরক্ষা বিকশিত না হয়ে তা সাংগঠনিক আত্মরক্ষায় পর্যবসিত হয়। ঠিক একই কারণে শত্রুর দমনে পাল্টা আক্রমণের শক্তিও ভালভাবে গড়ে ওঠে না। ফলে খতম বা রাষ্ট্রবাহিনীর উপর এক/দুটি আক্রমণের পরবর্তীতে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় দমনে প্রাথমিকভাবে আত্মরক্ষা সম্ভব হলেও কিছু পরেই সেটা আর ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সশস্ত্র সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

নিগেদ গঠনের কোন উদ্যোগ বা তৎপরতা বা সচেতনতা যে সেসময়ে ছিল না তা নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম-এর বিকাশ ও শত্রুর দমন অনিবার্যভাবেই পার্টির সক্রিয় উপাদানদেরকে সশস্ত্র ইউনিটে একত্রিত ও সংগঠিত করছিল। এটা কিছুটা সচেতনভাবে ও পরিকল্পিতভাবে এবং কিছুটা স্বতস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃত্বে দেশের বহু জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেয়া হয়নি।

'নিগেদ' ভালভাবে গড়ে না ওঠাটা রণনৈতিক অঞ্চলে ঘাঁটির লক্ষ্যে শক্তি কেন্দ্রীকরণ না করার সাথে যুক্ত একটি সমস্যা আকারে আবির্ভূত হয়। ফলে প্রচুর অস্ত্র থাকলেও তা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। প্রচুর সার্বক্ষণিক কর্মী থাকলেও তাদেরকে বাহিনীর উচ্চতর সংগঠনে বিকশিত করার বদলে আরো আরো জায়গায় ছড়িয়ে দেবার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রচুর কৃষক ও ছাত্র-তরুণ গেরিলা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সার্বক্ষণিক গেরিলা হিসেবে দ্রুত টানা হয় না। ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের

বিকাশ ও বিপরীতে শত্রুর ভয়ানক আক্রমণের সাথে পাল্লা দিয়ে নিগেদ-গঠন বহু পিছিয়ে পড়ে। এমনকি আমাদের পার্টিতে প্রথমদিকে সচেতনভাবে যেটুকু গড়ে উঠেছিল তাকেও ছড়ানো সাংগঠনিক/সামরিক কাজের স্বার্থে বলি দেয়া হয়। এভাবে বাহিনী গঠনে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়।

এটা যুদ্ধ বিকাশে মারাত্মক খারাপ ফল দেয়। নিগেদ গঠন এবং বাহিনীর কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দমনরত শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা ও তার উপর আক্রমণ চালাতে আমরা ব্যর্থ হই। ব্যর্থ হই বাহিনীকে সেকশন থেকে প্লাটুন, বা আরো উচ্চতর স্তরে বিকশিত করতে। ব্যর্থ হই দমনরত শত্রুর চলমান ইউনিটের উপর এ্যামবুশ করতে, তাকে মাইনে পর্যুদস্ত করতে, তার ক্যাম্পগুলোতে রেইড আক্রমণ করে তা পূর্ণভাবে দখল করতে বা তার ১/২/৪টি সেনাকে হত্যা/জখম করে তার অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুর উপর আতংক ছড়িয়ে দিতে, ব্যর্থ হই শত্রুর ছোট ছোট ইউনিটে কমান্ডো আক্রমণ করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার ধারা সৃষ্টি করতে। এভাবে যুদ্ধকে উচ্চতর স্তরে বিকশিত করতে আমরা ব্যর্থ হই, যার বিপুল সম্ভাবনা সেসময়ে সৃষ্টি হয়েছিল।

– বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে আরেকটি দুর্বলতাকেও আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। তাহলো, যদিও এ পর্বে আমাদের বাহিনীর ব্যাপক অধিকাংশ ছিল অনিয়মিত গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত সংগঠন; বড় জোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত স্কোয়াড/ইউনিট গঠন করা হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব গেরিলাকে ইউনিট-ভুক্ত করা এবং গণলাইন বিকাশের প্রক্রিয়ায় গণমিলিশিয়া গড়ে তোলা। গ্রাম/পাড়া ভিত্তিক কৃষক-জনগণের গণমিলিশিয়া হলো আমাদের বাহিনীর ভিত্তি যা অবিরত নিগেদ-এর নিয়মিত গেরিলার জোগান দেবে এবং নিগেদ-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান ও লড়াই পরিচালনা করবে। নিগেদ কার্যক্রম সেভাবে বিকশিত না হওয়াতে এই গণমিলিশিয়ার কাজটিও সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি। যা আমাদের বাহিনী গঠনকে দুর্বল করে দেয়, কারণ, এদুটো একটি অন্যটির বিকাশের শর্ত সৃষ্টি করে, এবং একটি অপরটির পরিপূরক।

বাহিনী গঠনের এই সমস্যা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সাথে যুক্তভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। যেমন, আমাদের পার্টিতে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে মূল শ্রেণির মাঝে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন-গরীব কৃষক, কৃষি-মজুর ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা, গণলাইন-গণভিত্তির সমস্যা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমস্যা– যা কিনা আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে ডান বিচ্যুতি, ঘাঁটি প্রশ্নে ডান বিচ্যুতি, পার্টি-গঠন ও যুক্তফ্রন্ট গঠনে সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি প্রভৃতি রাজনৈতিক সমস্যার থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্যান্য কিছু ধারার ক্ষেত্রে এটা উদ্ভূত হয়েছিল খোদ গণযুদ্ধের রাজনীতিকে সঠিকভাবে আঁকড়ে না ধরে কার্যত সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী ধারাকে ব্যাপকভাবে ধারণ করার কারণে। এসব কারণে সবগুলো ধারা

বাহিনী গঠনে প্রচেষ্টা চালালেও সেক্ষেত্রে ব্যাপক বাস্তব বাধা গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হয়না।

ঘ) রণনৈতিক পরিকল্পনার অভাব ঃ

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে ঘাঁটি প্রশ্নে দুর্বলতার কারণে শুরু থেকেই বাছাইকৃত রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহকে আঁকড়ে ধরা, অঞ্চল সমূহের সংযুক্তি, অঞ্চলগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ভিত্তিতে নয় বরং রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করে তার রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সমস্যার সমাধান করা– এসবের কোনো রণনৈতিক পরিকল্পনা মাওবাদী আন্দোলনে ছিল না।

কিন্তু এছাড়া যুদ্ধ বিকাশের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরু করা এবং শুরুর পর তাকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেবার জন্য রণনৈতিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাওবাদী আন্দোলন যুদ্ধকে ঠিক এভাবে কখনই পরিচালনা করতে পারেনি।

শুধুমাত্র কমরেড এসএস 'বর্ষাকালীন রণনৈতিক আক্রমণ' নামে একটি রণনৈতিক পরিকল্পনা করেছিলেন '৭৩-সালে, যা রচিত হয়েছিল খতমের স্তর থেকে রাষ্ট্রবাহিনীর উপর আক্রমণের স্তরে যুদ্ধকে বিকশিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যদিও এতটা স্বচ্ছভাবে ও কেন্দ্রীভূতভাবে তখনও বিষয়টিকে উত্থাপন করা হয়নি। তা সত্ত্বেও মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল। আমাদের দেশে গণযুদ্ধ বিকাশে বর্ষাকালীন সুবিধাগুলোকে বিবেচনা করার এই চেতনাও একটি সৃজনশীল বিকাশকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু তার সমস্যা ছিল এই যে, একে 'বর্ষাকালীন আক্রমণ' ও 'শীতকালীন আত্মরক্ষা'– এভাবে যান্ত্রিক বিভক্তিকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বর্ষাকাল ছাড়িয়ে শীতকালেও এই আক্রমণাভিযান চলতে থাকে। এবং পরবর্তী বর্ষাকালেই বরং শত্রুর আক্রমণের মুখে তা পর্যুদস্ত হওয়া শুরু করে।

এই রণনৈতিক পরিকল্পনার আরো দুর্বলতা ছিল এই যে, '৭৩-সালে তার আশাতীত সাফল্যের পরও '৭৪-সালে একই ধারায় একই শিরোনামে একই পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হয়, এবং নতুন উচ্চতর কোন পরিকল্পনা করা হয় না। এভাবে রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনার একটা প্রাথমিক সূচনা হয়েও সে চেতনাকে বিকশিত করা যায়নি। ফলে '৭৪-সালে বাহিনী ও যুদ্ধ গুণগতভাবে আর এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, এই অভিযানকালেই তা শত্রুর দমনে বিপর্যস্ত হওয়া শুরু করে।

ঙ) গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম ঃ

মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে সশস্ত্র সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে একতরফাবাদী বিচ্যুতির কারণে গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে মাওবাদী প্রত্যেকটি ধারাই গুরুতরভাবে দুর্বল করে বসে। যদিও এর মাত্রা বিভিন্ন ধারার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ছিল, কিন্তু মৌলিক সমস্যাটি প্রত্যেকেরই একই ছিল। তাছিল,

গণসংগঠন ও ফ্রন্টের কাজ বিকাশ করতে না পারা, সচেতনভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নকে কার্যকর করতে না পারা, খণ্ড বা আংশিক সংগ্রামকে কার্যত বর্জন করা, প্রকাশ্য কাজকে মূলত বর্জন করা, এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য কৌশলগত কোনো কর্মসূচি আনার চিন্তা না করা।

পূবাকপা ধারাটি সিএম-এর অনুসরণে গণসংগঠন-গণআন্দোলনকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক মনে করেছে, এবং শুধুমাত্র বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ও তার সংস্থা হিসেবে গণসংগ্রাম ও গণকমিটির কথা মনে রেখেছে, যা আশুভাবে যুদ্ধের নিম্নপর্যায়ের কারণে তারা কখনো প্রয়োগ করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারেনি। ইপিসিপি ও বিএসডি ধারা সশস্ত্র কৃষক গণসংগ্রামকে গুরুত্ব দিলেও এইসব আশু অর্থনৈতিক (সশস্ত্র) আন্দোলন আর গণযুদ্ধের পার্থক্য করতে তারা কার্যত ব্যর্থ হয়। পিবিএসপি ধারা বিভিন্ন সময়ে গণসংগ্রাম, গণসংগঠন ও আশু আন্দোলনের কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তার কোনো প্রকাশ ছিল না, এবং এসব আলোচনা গোড়ামীবাদী ধরনে মার্কসবাদী কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্যের উত্থাপনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তবে আমাদের পার্টির এই ধারা তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিপ্লবী সশস্ত্র গণআন্দোলনকে হরতালের মাধ্যমে পরিচালনা করেছিল, যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এর বাইরে আর কোনো গণসংগ্রামগত তৎপরতা পার্টি গড়ে তুলতে পারেনি।

বাস্তবে গনআন্দোলনের স্বীকৃতি সত্ত্বেও কীভাবে বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়, এবং কীভাবে আর সব অসংখ্য ধরনের গণআন্দোলনকে গণযুদ্ধের সাথে সমন্বিত করা যায় সে প্রশ্নে অস্পষ্টতাই এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

তবে গণআন্দোলন শুধু নিরস্ত্র নয়, সশস্ত্র হতে পারে, হওয়া উচিত, এবং তা গণযুদ্ধের অংশ হতে পারে, সেটা এই প্রথম পর্বে উপরোক্ত সংগ্রামগুলোর মাধ্যমে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার খুবই গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু সশস্ত্র ছায়ায় গণসংগ্রামের প্রধান রূপ হলো ক্ষমতা দখল ও বিপ্লবী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম। সেজন্য জনগণের বিভিন্ন গণসংগঠন থাকতে হবে, যার কেন্দ্রীয় বিষয় হবে ক্ষমতার সংস্থা। এ ধরনের গণসংগঠন এবং তার মাধ্যমে বিবিধ বিপ্লবী গণসংগ্রাম গড়ে তোলায় মাওবাদী আন্দোলন এ পর্যায়ে মূলত সচেতন ছিল না। বিক্ষিপ্তভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধারার নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু এ জাতীয় তৎপরতা গড়ে উঠলেও তা একটা সামগ্রিক সুসংহত চেতনা ও কর্মধারা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। এ সমস্যাটি ঘাঁটি-প্রশ্নে সামগ্রিক বিচ্যুতি ও তা থেকে উদ্ভূত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও জনগণের ক্ষমতা দখলের কার্যক্রম গড়ে না তোলার সমস্যার সাথে যুক্ত ছিল।

কিন্তু তা ছাড়া অন্যবিধ গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বও খুবই বেশি। সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠার পূর্বে এর যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তা গড়ে উঠলে পরে তার বিকাশের স্বার্থে ও টিকে থাকবার জন্যও এর গুরুত্ব রয়েছে। যুদ্ধের

অঞ্চলগুলোকে ঘিরে সারা দেশজুড়ে এ ধরনের বহুবিধ গনসংগঠন ও গণআন্দোলন গণযুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা ও বিকাশের জন্য খুবই নির্ধারক এক শক্তি। বিশেষত শহরাঞ্চলে এই ধরনের বহুবিধ গণসংগঠন গণসংগ্রাম এবং জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত গড়ে ওঠা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা ও বিজয়ের দিকে পরিচালনা করা আজকের পর্যায়ে এক অসম্ভব কাজ। যদি আমরা আমাদের দেশের ভৌগোলিক, জাতিগত, এবং বর্তমানের আর্থ-সামাজিক বিশেষত্বগুলোকে মনে রাখি তাহলে এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যাবে। এইসব সংগঠন সংগ্রাম হতে পারে যেমন আদর্শগত ও বিপ্লবী কর্মসূচি-ভিত্তিক, তেমনি হতে পারে চলতি ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া কেন্দ্রীক। গণযুদ্ধের সমর্থনে, তার বিভিন্নমুখী সহায়তায় সংহতিমূলক অনেক গণসংগ্রাম করতে হলেও এ ধরনের ভিত্তি পার্টিকে গড়তে হবে, এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। অসংখ্য ধরনের বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক/অর্থনৈতিক/আশু/ আংশিক/ খণ্ডিত আন্দোলনের সংগঠন সংগ্রামের বহুবিধ নিরাপত্তা-জালের মধ্যেই শুধু পার্টি ও বাহিনীকে নিরাপদে সংরক্ষণ করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

– তাসত্ত্বেও এটা উল্লেখ করা উচিত যে, মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম নিঃসন্দেহেই ব্যাপক জনগণের সমর্থনধন্য ছিল এবং তার ভাল গণভিত্তি ছিল। কিন্তু তার সংগ্রামী জোয়ারের তুলনায় ব্যাপক সমর্থক জনগণকে সে কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে পারেনি। এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বমুখী গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্মিলিত এক ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা সশস্ত্র সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাকে সামরিকভাবে বিপর্যস্ত করায় শত্রুকে বিরাট সুবিধা করে দিয়েছে, যা এ সময়কার গণযুদ্ধের ব্যাপকতম ঢেউটির পরাজয়ের একটি বড় কারণ ছিল।

চ) গণযুদ্ধের প্রস্তুতি ঃ

ষাট-সত্তর দশকে যে উত্তাল দেশীয়-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলন সূচিত হয় এবং বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ হিসেবে গণযুদ্ধ শুরু করা হয় তাতে আশুভাবে তখন গণযুদ্ধের প্রস্তুতির প্রশ্নটি লাইনগত ও অনুশীলনগতভাবে তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি। বরং সেসময় "প্রস্তুতি হয়নি" বক্তব্য দ্বারা একটি অর্থনীতিবাদী গণসংগঠনবাদী লাইন বিভিন্ন মধ্যপন্থী কেন্দ্রের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়, যার সাথে রাপচারের মাধ্যমে অবিলম্বে গণযুদ্ধ শুরু করার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এর বিপরীতে বিপ্লবী ধারাগুলো "শূণ্য থেকে গণযুদ্ধ শুরু করা", "গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক-জনগণকে জাগরিত করা"– ইত্যাকার মাওবাদী তত্ত্বগুলোকে তুলে ধরেছিল, যা সঠিক ছিল।

কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, গণযুদ্ধের সামগ্রিক লাইনে "প্রস্তুতি"র প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব ধরে। বিশেষতঃ এই পর্বের গণযুদ্ধ যখন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন থেকে এ প্রশ্নটি আরো জোরালোভাবে উঠে আসতে থাকে।

একইসাথে আর্থ-সামাজিক যে রূপান্তরগুলো পরবর্তীকালে ঘটেছে (সাম্রাজ্যবাদের আরো অনুপ্রবেশ, পুঁজিবাদের বিকাশ, যাতায়াত যোগাযোগ ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিগুলোতে) তার প্রেক্ষিতে গণযুদ্ধের লাইনের বিকাশের সাথে সাথে প্রস্তুতির প্রশ্নটির গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু মাওবাদী আন্দোলন তার প্রথম যুগের এ দুর্বলতাকে অব্যাহত রেখে গণযুদ্ধের লাইনের ত্রুটিগুলো কাটাতে ও তার বিকাশ সাধন করতে বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়। বিশেষত আন্দোলন কিছু তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হয় যা এই শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন কাটিয়ে তুলতে পারেনি, বরং পূর্বতন দুর্বলতাকে বিচ্যুতির পর্যায়ে বিকশিত করে তোলে বিভিন্ন কেন্দ্র।

"শূন্য থেকে গণযুদ্ধ"– এই সঠিক মাওবাদী তত্ত্বকে গুরুতর একতরফাবাদী ও যান্ত্রিকভাবে আন্দোলন গ্রহণ করেছিল। ফলে গণযুদ্ধের জন্য যুদ্ধ-পূর্ব প্রস্তুতিকে আন্দোলনের পক্ষ থেকে গণযুদ্ধ বর্জন, বিপ্লবী রাজনীতি বর্জন, তথা মাওবাদ বর্জন বলে চিহ্নিত করার দিকে এগিয়ে নেয়া হয়। ফলত যুদ্ধের প্রস্তুতির নামে যারা প্রকৃতই মাওবাদ বর্জিত, গণযুদ্ধের রাজনীতি বর্জিত সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ নিয়ে আসতে চেয়েছিল তাদের মূল রাজনৈতিক সমস্যায় লাইন-সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করার বদলে তাদের বিরুদ্ধে লাইন-সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হয় তাদের সংগঠন ও সংগ্রামের রূপের বিরুদ্ধে। এটা সশস্ত্র সংগ্রামের অভ্যন্তরে বিপ্লবী রাজনীতি সংক্রান্ত সচেতনতাকে দুর্বল করে দেয় এবং সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ/সশস্ত্র সংস্কারবাদ গড়ে তোলে। অন্যদিকে গণযুদ্ধের বিপ্লবী প্রস্তুতির প্রশ্নটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গণযুদ্ধসহ বিপ্লবের লাইন-বিনির্মাণের ও তত্ত্বগত কাজের গুরুত্বকে তা অবহেলা করে। প্রাথমিক হলেও শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলার গুরুত্বকে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

একইভাবে "গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক-জনগণকে জাগরিত করা"র মাওবাদী তত্ত্বটিকেও যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়। এবং এভাবে একটি সফল গণযুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ অন্যান্য ধরনের সংগ্রাম, বিশেষত কৃষকের গণসংগ্রাম-গণসংগঠনের কাজ, এবং অন্যান্য সকল ধরনের আংশিক ও খণ্ডিত সংগ্রামের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থতা ডেকে নিয়ে আসে। এমনকি জরুরি রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোকে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়। এসব কিছুকে কার্যত বিপ্লব-বর্জনের কাতারে ফেলা হয়। বিগত শতক জুড়ে সবগুলো বিপ্লবী মাওবাদী ধারাই কার্যত এ ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকে। যদিও এই ধরনের সমস্যা থেকে আমাদের পার্টি বেরিয়ে আসবার পথে ধাপে ধাপে অগ্রগতি ঘটাতে থাকে, কিন্তু সামগ্রিক রাপচার না হওয়ায়, এবং পাশাপাশি গণযুদ্ধের লাইনটিকে সামগ্রিকভাবে ও সঠিকভাবে উত্থাপন করতে না পারায় এই পুরনো সমস্যা থেকে আমাদের পার্টিও বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে এটা উল্লেখ করতেই হবে যে, এই পুরনো সমস্যায় সবচেয়ে বেশী আচ্ছন্ন থাকে সমগ্র পূবাকপা ধারা এবং আমাদের পার্টি থেকে বিভক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন কেন্দ্র এমবিআরএম।

এসবই পরিবর্তিত ও প্রতিকূল বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতিতে গণযুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি-কাজকে এবং শক্ত পার্টি গড়ার কাজকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই প্রস্তুতি-লাইনটি শুধু গণযুদ্ধের পূর্বেই যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা নয়; সূচিত গণযুদ্ধকে রক্ষা করা, বিস্তৃত করা ও শক্তিশালী করার কাজেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এর সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত সংগ্রাম-সংগঠনের বিভিন্ন রূপকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর প্রশ্ন। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব না বুঝলে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্টগুলোর প্রেক্ষিতে গণযুদ্ধকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করা, টিকিয়ে রাখা এবং তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই, প্রস্তুতির লাইনটিকে গণযুদ্ধের লাইনের একটি অপরিহার্য অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে।

পার্টি-গঠনের সমস্যা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনা থেকেই অন্তত প্রধান ৪টি ধারায় বিভক্ত ছিল, যা পরে আরো বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের মৌলিক বহু প্রশ্নে সামগ্রিক সঠিক লাইন নির্মাণ করতে না পারাটাই এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল। যে লাইনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পার্টি-গঠনের প্রশ্ন।

সকল প্রকৃত মাওবাদীদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক কেন্দ্র গঠনের প্রশ্নটি পার্টি-গঠনের প্রধানতম একটি বিষয়। মাওবাদী ঐক্যের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, এবং সেজন্য কোনো প্রচেষ্টা এ সময়ে মাওবাদীদের মাঝে ছিল না, বা বিভক্তিগুলো ছিল নেহায়েত ভুল বোঝাবুঝিজনিত বা নেতৃত্বের কোন্দল উদ্ভূত– বিষয়টা আদৌ এরকম ছিল না। কিন্তু নিজেকে একমাত্র সঠিক বলে দাবি করা, এই সঠিকতাকে প্রায় সার্বিক ও সামগ্রিক মনে করা, একে বিকাশমান একটা প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখা, বিশেষত তার প্রাথমিক পর্যায়ে; এবং বিপরীতে অন্য কেন্দ্রগুলোকে সংশোধনবাদী মনে করা, এমনকি প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা বা সেভাবে আচরণ করা– এসবের মাঝে এই বিভক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক উৎস নিহিত ছিল।

আগেই এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাইন ও পার্টির বিকাশ সাধনকে আঁকড়ে ধরা হয়নি। পার্টি/কেন্দ্রগুলো দুই লাইনের সংগ্রাম যে করেনি তা নয়। কিন্তু আন্তঃমাওবাদী বিতর্ক ও সংগ্রামগুলো চালিত হয়েছে সংশোধনবাদবিরোধী বৈরী সংগ্রাম আকারে। ফলে এগুলো লাইনের বিকাশ ও ঐক্যের বিকাশের বদলে নিজ পার্টিগত বিশুদ্ধতাবাদকে বিকশিত করে এবং অন্যদের সম্পর্কে বিভেদাত্মক সংগ্রাম, অনেক সময় বিষোদগার ও আত্মগত প্রচারে, এমনকি অপপ্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। সমস্ত কেন্দ্রগুলোই কম/বেশি এটা করেছে। তত্ত্বকে

ব্যবহার করা হয়েছে অন্য মতকে পরাজিত করার জন্য, বিতর্ককে বিকশিত করা ও সত্য অনুসন্ধানে তত্ত্বের প্রয়োজনীয় প্রয়োগ বা তার গভীরতা অর্জনের জন্য নয়।

– এই মতাদর্শগত-রাজনৈতিক চেতনা প্রতিটি পার্টির নিজ অভ্যন্তরেও প্রযুক্ত ও অনুশীলিত হয়েছিল। পার্টি-প্রশ্নে মাওবাদের বিকাশকে মূলত বোঝা হয়নি। লেনিনবাদী পার্টি, বা পার্টির বলশেভিকীকরণের নামে কার্যত স্ট্যালিনীয় পার্টিধারা গড়ে ওঠে– যা বস্তুত স্ট্যালিনীয় পার্টির চেয়ে গুণগতভাবে ছিল নিচু স্তরের, কার্যত অমার্কসবাদী।

লেনিন পার্টি-প্রশ্নে মার্কসবাদের গুণগত বিকাশ ঘটিয়েছিলেন মেনশেভিকবাদী উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতাদর্শকে বিরোধিতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে। তিনি উপদলের স্বাধীনতার বিপরীতে কঠোর শৃংখলাবদ্ধ এককেন্দ্রীক পার্টি-ধারণাকে তুলে ধরেন, যা কিনা পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির ভিত্তিতে। এই লেনিনীয় নীতিকেই মাও চারটি সাংগঠনিক মূলনীতি দ্বারা প্রকাশ করেন, যথা– ব্যক্তি সংগঠনের অনুগত, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অনুগত, নিম্নস্তর উচ্চস্তরের অনুগত, এবং সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুগত। এ ধরনের স্বেচ্ছামূলক ও কঠোর শৃংখলাধীন পার্টি ব্যতীত সুতীব্র শ্রেণী সংগ্রামের ঝড়-তরঙ্গে সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। লেনিন-পরবর্তীকালে আরো বহু রাজনৈতিক মতাদর্শিক গুণাবলিসহ পার্টি-প্রশ্নে এ ধরনের রূপান্তরই পার্টির বলশেভিকীকরণ নামে পরিচিতি পায়। বলশেভিক ধরনের পার্টি বলতে এটাই বোঝায়। লেনিন-পরবর্তীকালে স্ট্যালিন এ নীতিকে সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন এবং কার্যকর করেন।

মাওসেতুঙ দ্বন্দ্ববাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পার্টি-প্রশ্নটিকেও এর আলোকে দেখেন ও ব্যাখ্যা করেন। যা জিপিসিআর-এর প্রস্তুতিকালে ও সময়ে মাও গুণগতভাবে এগিয়ে নেন। মাও দেখান যে, পার্টিও একটি দ্বন্দ্ব। এতেও সর্বদাই দুই মত, নীতি, কৌশল, পদ্ধতি ও লাইন থাকে। আমরা চাই বা না চাই, এটা হলো বস্তুগত নিয়মের অধীন একটি বস্তুগত বাস্তবতা। প্রকৃত কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হলো পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা নয়, বরং এর সঠিক পরিচালনা করা ও সঠিক মীমাংসা করা। কখনো এই দ্বন্দ্ব সারবস্তুগতভাবে বৈরী, কখনো-বা অবৈরী। অবৈরী দ্বন্দ্বকে অবৈরীভাবে মীমাংসা করতে হবে, যা সঠিকভাবে পরিচালনা না করলে তা বৈরী দ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে পার্টি ও বিপ্লবের নিদারুণ ক্ষতি করতে পারে। ঠিক এটাই ঘটেছে বিগত শতকের মাওবাদী আন্দোলনে, যাকিনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লেনিনীয় পার্টি শৃংখলা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে ঘটেছে। এমনকি সারবস্তুগতভাবে বৈরী দ্বন্দ্বগুলোও একটা পর্যায় পর্যন্ত অবৈরীভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে, এবং তার অবৈরী মীমাংসাও হতে পারে। পার্টি-অভ্যন্তরস্থ এই দ্বন্দ্ব হলো পার্টি বিকাশের পরিচালিকা শক্তি। একে সঠিকভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়ে একদিকে মূলত সঠিক লাইন/অবস্থান বিকশিত হয়ে ওঠে– নিজ সীমাবদ্ধতা-দুর্বলতা-অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতিগুলো কাটানোর মাধ্যমে, অন্যদিকে ভুল লাইন/অবস্থানগুলোর পুনর্গঠন ঘটে।

এভাবে উচ্চতর সঠিক মতাবস্থান গড়ে ওঠে এবং তার ভিত্তিতে পার্টিতে উচ্চতর ঐক্য সৃষ্টি হয়। অসচেতন কমরেডগণ সচেতন হয়ে ওঠেন, বিভ্রান্ত কমরেডগণ বিভ্রান্তি কাটিয়ে তোলেন, পার্টি-ঐক্য দৃঢ়তর হয়ে ওঠে, এবং সচেতন ও অসংশোধনীয় উপাদান থাকলে তা চিহ্নিত হয় ও বর্জিত হয়। এভাবে লাইন ও মতাবস্থান এবং ঐক্য এগিয়ে চলে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে।

সুতরাং মাওবাদী পার্টি-ধারণা লেনিনবাদকে গুণগতভাবে এগিয়ে নেয়, যা কিনা টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে পার্টির বিকাশ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন করে পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে একদিকে টুএলএস-এর নামে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাকে সংগ্রাম করার কর্তব্যও উপস্থিত হয়, যেমন কিনা অন্যদিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে মনোলিথিক পার্টি-ধারণাকে সংগ্রাম করার দায়িত্ব আসে। আমাদের মাওবাদী আন্দোলন এ উভয় প্রকার বিচ্যুতি দ্বারাই আক্রান্ত ছিল। আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, শৃংখলার নামে পার্টি তার এ প্রথম পর্বে সম্পূর্ণতই একটি মনোলিথিক ধরনের পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'চক্র' নির্মূলের নামে বৈরীভাবে তার মোকাবেলা এবং এমনকি মৃত্যুদণ্ডদানের মত গুরুতর অমার্কসীয় ধারাও এ সময়ে পার্টিতে গড়ে উঠেছিল, যাকিনা এসএস-মৃত্যুর অব্যবহিত পর পার্টির মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি হবার মত নিকৃষ্ট ধরনের লাইন আকারেও বিকশিত হয়ে ওঠে। বাস্তবে এমন একটি লাইনের ভিত্তি আগেই পার্টিতে বিরাজমান ছিল বলেই প্রতিকুল অবস্থায় ও অপরিপক্ক নেতৃত্বের অধীনে তা এতটা খারাপভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল।

পার্টি-গঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার লেনিনীয় নীতিমালাকেও মাওবাদী আন্দোলনে এ সময়ে ব্যাপকভাবে লংঘন করা হয়। এসএস আমলেই আমাদের পার্টির ইতিহাসে এক সময়ে এক-সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি বজায় রাখা (যদিও সাময়িকভাবে) এরই একটি খুব খারাপ দৃষ্টান্ত– যাকিনা এসএস পরবর্তীকালের সামগ্রিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে বর্ধিত মাত্রা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এ সময়ে পার্টি মূলত পরিচালিত হয়েছে পার্টি কমিটি দ্বারা নয়, ব্যক্তি পরিচালক দ্বারা।

যদিও একটি গোপন বিপ্লবী পার্টিতে প্রাথমিকভাবে সদস্যপদ প্রদান, পার্টি-শাখা গঠন, কমিটি নির্বাচন, যৌথ নেতৃত্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা সহজ নয়। অনেক সময় তাকে সেজন্য একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতেই হয়। কিন্তু একে যদি পার্টি গঠন ও পরিচালনার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাহলে এ প্রক্রিয়াটি পার্টিতে অনুসৃত হতে থাকবে। কিন্তু আমাদের পার্টিতে তার সর্বোচ্চ বিকাশ কালেই এই প্রক্রিয়াগুলো প্রায় ধ্বসে গিয়েছিল এবং ব্যক্তি পরিচালনার একটা অশুভ রীতি পার্টিতে গড়ে উঠেছিল। এটা কোনো শক্তিশালী পার্টির লক্ষণ নয়, যাকিনা প্রধান ব্যক্তি নেতৃত্ব

এসএস-এর শহীদ হবার সাথে সাথেই পার্টিতে বিশালভাবে ধ্বস নেমে যাবার একটা বড় কারণ ছিল।

– পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণির অগ্রযোদ্ধা বাহিনী। অবশ্যই পার্টি শ্রমিক শ্রেণির কোনো সাধারণ সংগঠন নয়। এটা হলো তার বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। এর অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণির যে চলমান বিপ্লব তাকে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক সংগঠনই হলো পার্টি। তাই, আমাদের মত দেশে যেখানে বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক– যা কিনা সারবস্তুতে কৃষি বিপ্লব– যে বিপ্লবে কৃষক হলো প্রধান শক্তি, গ্রাম হলো কাজের প্রধান ক্ষেত্র, সেখানে এ পার্টি স্বভাবতই গড়ে উঠবে প্রধানত গ্রামীণ সর্বহারা-আধা সর্বহারা শ্রেণী, অর্থাৎ, ভূমিহীন-গরীব কৃষক ও কৃষি মজুরদের মধ্য থেকে। এবং নাগরিক শিল্পীয় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজ ও সংগ্রাম হবে তার চেয়ে গৌণ।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এই বিপ্লবের নেতা হলো শ্রমিক শ্রেণি। শ্রমিক শ্রেণি অবশ্যই তার নেতৃত্ব প্রয়োগ করবে তার রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে, যাতে বহু বিভিন্ন শ্রেণির বিপ্লবী উপাদানরা জড়ো হন শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শ ও রাজনীতিকে গ্রহণ করে; কিন্তু খোদ শ্রমিক শ্রেণির নিজেকে অবশ্যই সে পার্টিতে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণির পার্টি।

আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি নগরকেন্দ্রীক এবং শিল্প-কারখানা ভিত্তিক। আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের অপ্রতুলতার কারণে এই ধরনের শিল্প কারখানার শ্রমিক সংখ্যায় কম, এবং তাদের একটা অংশ ক্ষুদে বুর্জোয়া চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে– লেনিন যাকে বলেছেন সেরকম "অভিজাত শ্রমিক" হিসেবে গড়ে উঠেছেন। কিন্তু অপরদিকে অভিজাত শ্রমিকের বাইরে এক বিরাট প্রকৃত সর্বহারা-আধাসর্বহারা শ্রমিক রয়েছেন যারা সর্বহারা রাজনীতির নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে প্রস্তুত। এই শ্রেণিতে ভর্তি হতে প্রস্তুত সর্বহারা, আধাসর্বহারা শ্রেণির সদস্য সংখ্যা আরো বিপুল। যাদের নিজস্ব পার্টি হিসেবে পার্টিকে গড়ে না তুললে পার্টি তার শ্রেণি চরিত্র থেকে দূরে সরে যাবে।

মাওবাদী আন্দোলন কৃষি বিপ্লব, কৃষক, গ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম আঁকড়ে ধরতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজ থেকে মৌলিকভাবে ও গুরুতরভাবে পিছিয়ে পড়ে। শহরাঞ্চলে ও শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্নমুখী গণসংগঠন, অর্থনৈতিক/আশু আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম কার্যত মাওবাদী আন্দোলন এ সময়কালে বর্জন করে বসার কারণে শ্রমিক শ্রেণিকে কার্যত ছেড়ে দেয়া হয় সংশোধনবাদী ও প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে। এ কারণে এক সময়কার কমিউনিস্ট দ্বারা সৃষ্ট শ্রমিক আন্দোলন দখল করে নেয় বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা। আমাদের পার্টির জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভিত্তি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে চলে, যা শ্রমিকদের মধ্যকার কাজ থেকে আমাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে নেয়। এটা মাওবাদী আন্দোলনে বিপুল পরিমাণে ক্ষুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ গড়ে তুলতে ভূমিকা

রাখে। শুধু তাই নয়, তার নিজ শ্রেণিকে ছেড়ে দেয়া হয় সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়াদের হাতে, যে সমস্যা পরবর্তীতেও মাওবাদী আন্দোলন কার্যকরভাবে কাটিয়ে তুলতে পারেনি। এই গুরুতর ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে মাওবাদী আন্দোলনের নিরলস দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

– সর্বহারা শ্রেণির পার্টি যেহেতু একটি বিপ্লবী পার্টি, নিছক সাধারণ কোনো শ্রেণি সংগঠন নয়, তাই, এটা সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত নিগৃহীত শোষিত শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়– যারা বিপ্লবে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে, যে গোষ্ঠীর তৎপরতা বিপ্লবের জন্য খুবই প্রয়োজন– তাদের মাঝে গুরুত্ব দিয়ে কাজ গড়ে তুলতে বাধ্য। তা না হলে বিপ্লবকে সমগ্র সমাজে ব্যপ্ত করা ও সমাজের সমস্ত অগ্রসর জায়গা থেকে বিপ্লবের শক্তি আহরণ করা, এবং বিশেষত সবচেয়ে ত্যাগী অগ্রসর উপাদানদেরকে পার্টিতে টেনে এনে পার্টিকে সত্যিকার একটি অগ্রসর বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গঠন করা সম্ভব নয়।

এই দৃষ্টিকোণ ও প্রয়োজন থেকে নারী সমাজ, আদিবাসী, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার কাজকে বিশেষ গুরুত্বদান করা ও সেখানে পার্টি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনে তেমন কোনো সচেতন প্রয়াস দেখা যায়নি।

এসএস নেতৃত্বে আমাদের পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মাঝে ভাল ভিত্তি গড়তে সক্ষম হলেও সেটা যতনা নিপীড়িত আদিবাসীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব থেকে এসেছিল, তার চেয়ে বেশি এসেছিল সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে– পাহাড়-জঙ্গল এলাকার গুরুত্ব থেকে। তথাপি এই কাজ অবশ্যই রণনৈতিক তাৎপর্যমন্ডিত ছিল।

নারী সমাজে পার্টি গড়ে তোলার মৌলিক প্রশ্ন হলো নারী প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি– যা সমগ্র আন্দোলনে গুরুতরভাবে দুর্বল/বিচ্যুতিসম্পন্ন ছিল। নারী-প্রশ্নের সাথে যুক্ত বিশেষ সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়নি– যেমন, বিয়ে-পরিবার-যৌন প্রশ্নে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আন্দোলন খুব একটা অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। আমাদের মত পশ্চাদপদ সমাজে নারীদের মধ্যকার কাজে কিছু বিশেষ সমস্যা থাকলেও নারী-প্রশ্নের বিপুল গুরুত্বকে বোঝা হয়নি। নারীদেরকে প্রায়ই সমস্যাসংকুল বা সমস্যা সৃষ্টিকারী বলে মনে করা হয়েছে। বিবাহ ও সন্তানাদির প্রশ্ন, অথবা সমাজে রেখে আসা পারিবারিক প্রশ্নগুলোকে সঠিকভাবে ধরা হয়নি। প্রেম ও যৌন প্রশ্নগুলোকে বিশুদ্ধতাবাদীভাবে দেখার কারণে, একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ও অতিরঞ্জিতভাবে শৃংখলার আওতায় আনার কারণে বাস্তবে বিপ্লবী স্বার্থ বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসবের ফল স্বরূপ কোনো না কোনোভাবে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে আন্দোলনে বজায় ছিল।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের অগ্রসরদের একটা অংশ অবশ্যই সরাসরি কৃষি-বিপ্লবে অংশ নেবেন, এবং পার্টির নেতৃত্ব পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু তাদের নিজ কাজের ক্ষেত্র, যেমন– সাংস্কৃতিক কাজ, পত্রিকার কাজ, তত্ত্বগত ও তথ্যগত গবেষণামূলক কাজ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবিত্ত অংশকে পার্টির পক্ষে টেনে আনবার কাজের বিপুল পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। মাওবাদী আন্দোলন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে, ব্যক্তিকেন্দ্রীক কিছু তৎপরতা চালালেও এই সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোকে কার্যত বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এভাবে পার্টি গঠনে, পার্টির বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রসরতা সৃষ্টিতে, সকল নিপীড়িত ও আলোকপ্রাপ্ত অংশকে পার্টির বলয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এভাবে পার্টি-গঠনের মৌলিক কাজ অসম্পূর্ণ, নিম্নমানের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, যা কিনা পরবর্তীকালে পার্টির নেতৃত্বসারির বিভিন্নধর্মী লসের প্রক্রিয়ায় প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে উপনীত হয়েছে।

– পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলা পার্টি-গঠনের জন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন, যার সঠিক মীমাংসা প্রয়োজন। লেনিন এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

পেশাদার বিপ্লবী গঠনের সাথে দুটো বিষয় যুক্ত। এক: সার্বক্ষণিক বিপ্লবী কর্মী যারা পুরোপুরিভাবে পার্টির ও বিপ্লবী কাজের জন্য নিবেদিত। দুই: সর্বহারা শ্রেণির পার্টি হিসেবে তার নেতৃত্ব কাঠামোকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার পরিচালনা থেকে অব্যাহতভাবে মুক্ত করার প্রক্রিয়া রাখা।

মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম উত্থান পর্বে মূলতঃ তরুণ ও নবীন বিপ্লবীরা তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক জীবন ত্যাগ করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যারা তখনো অধিকাংশই কোনো ব্যক্তিমালিকানায় জড়িত নন, স্ত্রী/স্বামী বা সন্তানের সমস্যা থেকে মুক্ত। ফলে এ সমস্যার সাথে জড়িত জটিলতাগুলো সেসময়ে তেমন একটা গুরুতরভাবে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু যখনই কৃষকের মাঝে পার্টি ভিত্তি গাড়তে শুরু করে, এবং সেখান থেকে প্রচুর বিপ্লবী বের হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাধারণভাবেও পেশাদার বিপ্লবীর ক্ষেত্রে বহু সময়ই ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি-উদ্ভূতদের ব্যক্তিগত সম্পদের প্রশ্ন, পরিবারের প্রশ্ন উঠে আসে, যার সাথে তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা ও পার্টি-গঠনকে এগিয়ে নেয়াটা জড়িত।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এ পর্বে সমগ্র আন্দোলনেই খুব কম আলোচিত হয়েছে। ফলে তা মীমাংসিত হয়নি। এর কুফল হিসেবে পরবর্তীকালে আন্দোলন যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তখন বহু কমরেড ব্যক্তিগত/পারিবারিক ভরণপোষনের জন্য ব্যক্তিগত পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন এবং কার্যত বিপ্লব থেকে ঝরে গেছেন।

– সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির একটি শক্তিশালী বিকাশমান ফান্ড গড়ে তোলা, সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়মিত আয়ের সংস্থান সৃষ্টি, পেশাদারদের

ব্যক্তিসম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পিত ব্যবহার প্রভৃতি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও যাবতীয় বৈষয়িক প্রশ্নে স্বার্থত্যাগ ও উদ্বুদ্ধকরণই মূল বিষয়, যাকে অবশ্যই কখনো দুর্বল করা উচিত নয়।

যুক্তফ্রন্ট প্রশ্ন

পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট– এ তিনটি হলো মাও-বর্ণিত বিপ্লবের তিন যাদুকরী অস্ত্র (ম্যাজিক উইপন)। এই মাওবাদী সূত্রকে মাওবাদী আন্দোলন সূচনা থেকেই তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ফ্রন্ট-লাইনের বাস্তব প্রয়োগে গুরুতর দুর্বলতা ও বিচ্যুতি আমরা মাওবাদী আন্দোলনে লক্ষ্য করি, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তার এ প্রথম পর্বেই। বিপ্লবের ব্যর্থতার এটা একটা বড় মৌলিক কারণ হয়ে রয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট হলো আন্দোলন ও বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা। যুক্তফ্রন্টের মৌলিক বিষয় হলো পার্টির নেতৃত্বে সরাসরি জনগণের বিভিন্ন মিত্র শ্রেণিকে সংগঠিত করা, যারা বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করবেন এবং বিপ্লবী ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট শুধু বিপ্লবী আন্দোলন নয়, সব ধরনের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যও কাজ করে বটে। সুতরাং সরাসরি বিপ্লবী ক্ষমতার সাথে যুক্ত নয়, এমন বহুসব প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যও যুক্তফ্রন্ট প্রয়োজন। অবশ্য সেসব আন্দোলনই বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবেই কাজে লাগাতে হবে, এবং তার অধীনেই তাকে রাখতে হবে। এ বিষয়গুলোতে মাওবাদী আন্দোলনে তেমন একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

একটা প্রবণতা ছিল এই যে, বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা আকারেই শুধু একে গড়ে তোলা যায়, এমনকি ক্ষমতা অর্জিত হবার পরে মাত্র (পূবাকপা)। এতে একদিকে ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ফ্রন্টের কাজকে পরবর্তীকালের কাজ হিসেবে ফেলে রেখে শুধু দুই অস্ত্র– পার্টি ও বাহিনী নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। এটা মাওবাদ থেকে সরে গিয়েছিল। পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠন গড়ে তোলার নীতি/পদ্ধতি গড়ে না ওঠাও, কার্যত গণসংগঠনের কাজকে বর্জন করাও, এই প্রশ্নে বাস্তব সাংগঠনিক কার্যক্রম গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও রাজনৈতিকভাবে কেউ যুক্তফ্রন্টের প্রযোজনীয়তাকে বাদ দেয়নি।

আমাদের পার্টি এসএস-নেতৃত্বে '৭৩-সালে উপর থেকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল কাগুজে ও গোড়ামীবাদধর্মী। এমনকি, বিভিন্ন গণসংগঠনের যে ঘোষণা তখন দেয়া হয়েছিল সেটাও নিছক কাগুজে ছিল। বাস্তবে গণসংগঠনের কোনো কার্যক্রম গড়ে তোলার নীতি/পদ্ধতি আমাদের পার্টি তখন গড়ে তুলতে পারেনি। বিশেষত ঘাঁটি-প্রশ্নে বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষমতা দখলের সমস্যা, এবং একই কারণে ও

শ্রেণিলাইন-গণলাইনের দুর্বলতা ও গণসংগঠনের নীতি/পদ্ধতির অভাবে আমরা শক্তিশালী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা সত্ত্বেও এমনকি প্রাথমিক ধরনের গেরিলা অঞ্চলগুলোতেও জনগণের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন গণসংগঠনে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হই। অন্যদের ক্ষেত্রেও কম/বেশি একই সমস্যা ঘটেছিল।

– কিন্তু আরো সমস্যা হয়েছে যুক্তফ্রন্টের কাজকে শুধু পার্টির সরাসরি নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ করে ফেলার কাজের ধারা থেকে। বিপ্লবের এক সামগ্রিক জোয়ার আসার পূর্ব পর্যন্ত পার্টির সশস্ত্র অঞ্চলগুলো বাদে পার্টির সরাসারি নেতৃত্বের বাইরেই অধিকাংশ জনগণ সংগঠিত থাকেন। তাদের সচেতন অংশ সংগঠিত থাকেন অন্যান্য গণতন্ত্রী ও বিপ্লবী সংগঠনে, তাদের একটা বড় অংশ সংগঠিত থাকেন বিভিন্ন ধরনের সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী সংগঠনে। মাওবাদী আন্দোলনে প্রথম পর্বের সময়কালটিতে এটা ব্যাপকভাবে ছিল, কারণ, তখন দেশে ও বিশ্বে একটা উত্তাল বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

যুক্তফ্রন্টের লাইন পার্টিকে সক্ষম করে তোলে এইসব জনগণের সাথে যৌথ আন্দোলন-সমঝোতা-মিত্রতা ও নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে, তাদেরকে সচেতন করে তুলতে, বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে, যা কিনা বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে বিভিন্নভাবে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। যুক্তফ্রন্ট প্রশ্নে মাওবাদী আন্দোলন এই ধরনের পদক্ষেপ থেকেও প্রায় দূরেই সরে ছিল, যদিও খুব মাঝে মাঝে খুব খণ্ডিত ও সাময়িক কিছু কিছু উদ্যোগ বিভিন্ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এসেছিল।

– আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই এমনকি মাওবাদী কেন্দ্রগুলো পরস্পরকে সংশোধনবাদী বলার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী বলার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি এক ধরনের বৈরী বিভেদাত্মক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। মাওবাদী বহির্ভূত বিভিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামী বা গণআন্দোলনপন্থী কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য ছিল। এটা যুক্তফ্রন্টের কাজে যে এক গুরুতর বাধার সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

– মাওবাদী আন্দোলন প্রকাশ্য গণআন্দোলন-গনসংগঠন মূলত বর্জন করেছিল। ৬০/৭০-দশকের এ সময়টাতে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পাশাপাশি যে বিরাট ও ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনসহ বহুমূখী গণআন্দোলনের জোয়ার এদেশে বয়ে যায় তাতে মাওবাদী আন্দোলন তার সামর্থ্যের তুলনায় খুবই কম ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। আন্দোলনের এই সেক্টরে যুক্তফ্রন্ট-লাইনের যে বিশাল গুরুত্ব ছিল তা কার্যত কোনো প্রয়োগেই যায়নি।

– রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান গুরুত্বের সাথে রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের প্রশ্নটিকে সমন্বিত করা হয়নি। ফলে তা রণনৈতিক যুক্তফ্রন্টের কাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

পার্টির সরাসরি নেতৃত্বে রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করার কাজ হলো একটি স্থায়ী ও দীর্ঘসূত্রী কাজ। এমনকি বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন পার্টি-বহির্ভূত শক্তির জোট গঠনটিও দীর্ঘস্থায়ী কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ইস্যুভিত্তিক অসংখ্য ধরনের সাময়িক বা অস্থায়ী জোট গড়ে উঠতে পারে– বিশেষত গণআন্দোলনে, জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে, প্রকাশ্য কাজে– যার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ধরনের কাজে আংশিক সংগ্রাম, বা কৌশলগত কর্মসূচির গুরুত্বকে না বোঝার কারণে এ ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের লাইনকেও প্রয়োগের প্রশ্ন আসেনি। অথচ পার্টির একক নেতৃত্ব ও উদ্যোগের বদলে এ ধরনের যৌথ আন্দোলন, এমনকি যুগপৎ আন্দোলন– যুক্তফ্রন্ট লাইনেরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র। এরা একে অন্যকে এগিয়ে দেয়। এর সুচারু সংযুক্তকরণ ব্যতীত "যাকেই সম্ভব তাকেই ঐক্যবদ্ধ কর"– এই মাওবাদী নীতিকে আমরা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হবো, যা এ সময়কালে গুরুতরভাবে ঘটেছে।

বরং বিপরীতে যুক্তফ্রন্ট-লাইনের এই ধরনের দুর্বলতা ও বিচ্যুতির কারণে গণতন্ত্রী শক্তির সাথে বা আন্তঃমাওবাদী বৈরী সংঘর্ষেও মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়তে বা তার উপক্রম হতে দেখা গেছে, যা বিপ্লবী সংগ্রামকে দুর্বল করেছে, জনগণকে হতাশ করেছে ও বিভক্ত করেছে।

– জাতিগত আন্দোলনগুলোর সাথে রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। এটা জাতি সমস্যার সঠিক উপলব্ধির সাথে জড়িত বিষয়। জাতিগত আন্দোলনগুলো ক্ষুদে বুর্জোয়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত। ফলে স্বভাবতই সেগুলোতে বিপুল পরিমাণে সংকীর্ণতাবাদ এবং কম/বেশি প্রতিক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান। কিন্তু একইসাথে তা প্রধান শত্রু রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত/সংগ্রামরত বলে তার সাথে আমাদের যুক্তফ্রন্ট গঠন হতে পারে, অথবা সে লাইন থেকে তাদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক আচরণ থাকতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মাঝে পার্টির স্বতন্ত্র কাজ বিকাশের গুরুত্বের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্টের এই প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করতে হবে।

এসএস-নেতৃত্বাধীন আমাদের পার্টি পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের একাংশের মাঝে ভাল কাজ গড়তে সক্ষম হলেও এক্ষেত্রে সঠিক নীতি দ্বারা চালিত হতে পেরেছিল সেটা বলা যাবে না। বরং বিপরীতে আমাদের মাঝে পার্টিজান সংকীর্ণতাবাদ ছাড়াও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতে আমরা ব্যর্থ হই। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি সঠিকভাবে উত্থাপন করলেও আমাদের পার্টিসহ সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, তথা বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

* এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে '৭৪-সাল ও পরবর্তী কিছু সময়জুড়ে বিশেষ অগ্রসর কিছু অনুশীলনের বিষয়ে আমাদের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। সেখানে এ

সময়ে নিগেদ গড়ে উঠেছিল, পার্টির নেতৃত্বে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের গণসংগঠন ও গণক্ষমতার ভ্রুণ হিসেবে গণকমিটি ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল এবং এভাবে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের কাজে অগ্রগতি ঘটেছিল। ফলে গণযুদ্ধকে বিকশিত করা ও ঘাঁটির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে এখানে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু সে সময়ে আমাদের পার্টি এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলোর বিপুল তাৎপর্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাকে সেভাবে আঁকড়ে ধরা হয়নি এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধারণ নীতি-পদ্ধতি গড়ে তুলে পার্টি-লাইনকে বিকশিত করতে পারেনি। বিশেষত ঘাঁটি-সংক্রান্ত লাইন ও পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিচ্যুতির থেকে এটা উদ্ভূত হয়েছিল। এ কারণেই পার্বত্য-কাজের এসব অগ্রসরতাকেও ভালভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা যায়নি। পরবর্তীতে এসএস-এর মৃত্যুর পরই পার্টি ভেঙ্গে যায়, এবং আরো অনেক কারণে এই সংগ্রাম আরো কিছুটা এগিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

** উপরে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ও তার প্রথম পর্বের উত্থানকালের আলোচনাটি কিছুটা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে, কারণ, এটাই আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে শুধু দেশীয় আন্দোলনই নয়, সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় এবং একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আন্দোলন পাড়ি দেবার কারণে আন্দোলনের এমনিতরো জোয়ার আর কখনো সৃষ্টি হতে পারেনি। এই উত্থান পরাজিত হবার পর ব্যাপকতম অংশ অধঃপতিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পর্বে নতুন করে এ আন্দোলন গড়ে উঠলেও তার মাঝে এই ভিত্তিগুলো থেকে যায় কম/বেশি করে। সুতরাং আজকে যখন একটা সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হয়েছে– শুধু দেশীয় নয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও, তখন এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের এই ভিত্তিতে যে মৌলিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলো কাজ করেছে তার সুস্পষ্ট উদ্ঘাটনই প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর উপলব্ধির সাথে বিগত শতকের সমগ্র যুগের সাথে প্রকৃত রাপচার ঘটানোর সফলতা জড়িত। যাকিনা একটি নতুন যুগের নতুন কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রথম কাজ।

– এখানে গুরুত্বসহকারে যা মনে রাখা দরকার তাহলো, উপরে আলোচিত কিছু ত্রুটি অবশ্যই ছিল ঐতিহাসিক– যা সেসময়কার মতবাদ বিকাশের ও তার উপলব্ধির অনিবার্য দুর্বলতা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু পাশাপাশি ত্রুটিগুলোর অনেক কিছুই ব্যাপক আকারে ছিল ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী-চরিত্র উদ্ভূত এবং মালেমা'র উপলব্ধিগত দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত একতরফাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের সমস্যা থেকে সৃষ্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি যেকারণেই

ঘটুক না কেন, ভুল ভুলই। সেটা তার ছাপ রেখে গেছে সংগ্রামের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সুতরাং তার সুস্পষ্ট ও নির্মম উদ্ঘাটন ব্যতীত বিপ্লব বিকশিত হতে পারে না।

এই প্রথম পর্বের উত্থান সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয় '৭৪-সাল থেকেই। আমাদের পার্টিসহ বিপ্লবী সংগ্রামগুলো বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। কমরেড এসএস-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের এই বিপর্যয় গুণগতভাবে এগিয়ে যায় বললে ভুল হবে না। পার্টিগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। নতুনতর বিভক্তি আন্দোলনকে গ্রাস করে। আন্দোলনে ব্যাপক নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সামগ্রিক এক হতাশা, ঝরে পড়া, সুবিধাবাদীতা, বিভ্রান্তি ও এমনকি পথভ্রষ্টতা, অধঃপতন ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম হয়।

এটা ঘটে এমন এক সময়ে যখন মাত্র অল্প পরেই ১৯৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যান মাও-এর মৃত্যু এবং চীনের তেংপন্থা ও আলবেনিয়ার হোক্সাপন্থার বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনও এক সার্বিক বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন রুশ-বিপ্লব পরবর্তী ৬০ বছর পর এই প্রথম তার ঘাঁটি এলাকা হারিয়ে ফেলে, একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র-বিহীন হয়ে পড়ে, একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইনের অভাবে ভুগতে থাকে। স্বভাবতই দুনিয়াজোড়া জনগণের বিপ্লবী উত্থানও বিপর্যস্ত হয়ে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন এক সামগ্রিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এ দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলন-এর সংকট সুগভীরভাবে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এরই মাঝে এই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসবার নতুন উদ্যোগ আন্দোলনের মধ্য থেকেই জাগরিত হতে থাকে। সেটা হলো এক নতুন অধ্যায়ের শুরু– দেশে ও বৈশ্বিক পরিসরে, উভয় ক্ষেত্রেই।

প্রথম পর্বের সামগ্রিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসা– ৮০-দশক

নতুন সারসংকলন, নতুন বিকাশ কিন্তু সীমা ছাড়াতে না পারা

মাওবাদী আন্দোলনের উপরোক্ত প্রথম পর্বের সার্বিক বিপর্যয়ের শুরু থেকে, এবং কিছু পরেই, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক বিপর্যয়ের অংশ হিসেবে ও তার প্রভাবে, উপরে আলোচিত প্রধানতম ৪টি ধারাসহ ছোট-খাট সমস্ত ধারা-উপধারার মাঝে ব্যাপক পুনর্গঠন-ভাঙন-রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। চীনা-তেং সংশোধনবাদ ও আলবেনীয়-হোক্সাবাদ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। পূর্বোক্ত ৪টি প্রধান মাওবাদী ধারার অন্যতম আ.হক নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি/এমএল মূলত সর্বাংশেই সংশোধনবাদে অধঃপতিত হয়– একাংশ তেং পন্থা ও অন্য অংশ হোক্সাপন্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বিএসডি, পূবাকপা ও আমাদের পার্টিতে গুরুতর ভাঙন ধরে। ভাঙনকারীরা শেষ পর্যন্ত হয় তেং পন্থা নতুবা হোক্সাপন্থায় অধঃপতিত হয়। মাওবাদ, তথা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে টিকে থাকে প্রধানত ক্ষুদ্র দুই শক্তি– কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি ও কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরীর নেতৃত্বে পূবাকপা।

তবে প্রাথমিকভাবে এই দুটো কেন্দ্রও চীনের এই নববিকাশ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। মাও-পরবর্তী হুয়া চক্রের চক্রান্তকে বুঝতে না পারা, তিন বিশ্ব তত্ত্বকে মাও-এর লাইন বলে বিভ্রান্ত হওয়া ইত্যাদি ধরনের মধ্যপন্থা এ উভয় কেন্দ্রেই এসেছিল। পূবাকপা'র কেন্দ্রে লিনপন্থারও আবির্ভাব ঘটেছিল। এর কারণ অবশ্যই নিহিত ছিল মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে মাওবাদ সম্পর্কে উপলব্ধি, বিশেষত জিপিসিআর-এর সামগ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধির দুর্বলতার মাঝে। এগুলো উদ্ভূত হয়েছিল জিপিসিআর-কালের টুএলএস-গুলোকে, বিশেষত তেংবিরোধী মাও-এর শেষ লড়াইটিকে যথেষ্ট ভালভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি না করার কারণে। ফলে মাওবাদ উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা ও অস্পষ্টতা ছিল তার প্রকাশ আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে না পারার মধ্য দিয়ে এই সময়ে কিছুদিনের জন্য ঘটেছিল।

যাহোক, মাওবাদের প্রতি আস্থা এবং বিশেষত জিপিসিআর-এর শিক্ষাগুলোর গভীরতর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এই দুটো কেন্দ্র তা কাটিয়ে তোলে। নিজেদের মাওবাদ উপলব্ধিকে এগিয়ে নেয়। এবং মাওবাদী আন্দোলনের এই চরম বিপর্যস্ত ও প্রতিকূল সময়ে মাওবাদের ঝান্ডাকে উর্ধে তুলে ধরে। একই সময়ে বিএসডি ধারা থেকেও কমরেড মোশতাকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র অংশ এই সঠিক ধারায় সামিল হয়। এই তিনটি কেন্দ্রের দ্বারা মাওবাদের এই রক্ষার গুরুত্ব দেশীয় পরিসরে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল। কারণ, এর ফলেই এদেশে তেংপন্থী ও হোক্সাপন্থীসহ নতুন পুরনো সব ধরনের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মাওবাদের ভিত্তিতে এক নতুন মতাদর্শগত সংগ্রাম জাগরিত হয়ে ওঠে। যাকিনা এক নতুন প্রজন্মকে মাওবাদে শিক্ষিত করে তোলে। পুরনো প্রজন্মের প্রকৃত বিপ্লবীদের মাঝে নবপ্রেরণার সৃষ্টি করে। এবং ফলশ্রুতিতে এদেশে মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলন, তথা গণযুদ্ধের ধারা বহমান থাকতে সক্ষমতা অর্জন করে। সুতরাং এই নতুন আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কে মাওবাদের এই রক্ষা ও উপলব্ধির গভীরতা অর্জনের কৃতিত্বকে কোনো ক্রমেই ম্লান করা যাবে না। তাকে সুউচ্চে তুলে ধরতে হবে। এবং এর প্রধানতম নেতৃত্বগণের এই অবদানকে সুরক্ষা করতে হবে।

* কিন্তু দেশীয় আন্দোলনের পুনর্গঠনের জন্য শুধু এই মতবাদিক বিতর্কের প্রশ্নে মূলত সঠিক অবস্থান গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট ছিল না। এটা অবশ্যই ছিল তার সূচনা বিন্দু– যা কিনা উপরের তিনটি কেন্দ্র কম/বেশি করেছিল। কিন্তু মৌলিক কর্তব্য ছিল এই তাত্ত্বিক সূচনাকে সম্প্রসারিত করা দেশীয় আন্দোলনের বিগত পর্বটির সারসংকলনের মাধ্যমে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন দিশা দেয়ার ক্ষেত্রে, যার ভিত্তিতে এক নতুন ও উচ্চতর বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

বিএসডি/এমএল ধারাটি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে মাওবাদের পক্ষে দাড়ালেও বাস্তব বিপ্লবী অনুশীলনে তারা কার্যত বিপ্লবী ধারা অনুশীলনে ব্যর্থ হয়। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বিপ্লবী রাজনীতিকে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করলেও তার প্রয়োগ থেকে তারা সরে যায়। এর লাইনগত কারণ অবশ্যই ছিল– যাকিনা কার্যত "শীর্ষ তত্ত্ব" আকারে তাদের মাঝে পূর্বেই আসন গেড়ে নিয়েছিল। এর ফলে তারা দীর্ঘকালের জন্য বা চিরতরে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্যত একটা নিরস্ত্র অর্থনীতিবাদী লাইনকে তুলে ধরে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা এই অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিপূর্ণ লাইনকেও প্রয়োগ করে না, মূলত কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, কৃষকদের আশু কোনো আন্দোলনও তারা গড়ে তোলে না। এভাবে এ পার্টিটি এক ধরনের সীমিত তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। কর্মী-জনগণকে কোনো বিপ্লবী দিশা দিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে শুকিয়ে যাবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পেশাদার বিপ্লবীদের দ্বারা সবল একটি পার্টিকেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে পার্টি-গঠনকে এগিয়ে নেয়া, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি সৃষ্টির জন্য

প্রধানত কৃষকের মাঝে যাওয়া ও কৃষক ভিত্তি গড়ে তোলা– এগুলো না করার কারণে এই ধারাটি ক্রমান্বয়ে অস্তিত্বের হুমকির মুখে পড়তে থাকে, যা শতাব্দীর প্রথমে তার প্রধান নেতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কার্যত বিলীন হবার মুখে এসে পড়েছে।

– কমরেড চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ধারাটি বিগত শতকের শেষ পর্যন্ত কোনো ধরনের মৌলিক লাইনগত সারসংকলনের পথে এগোতে ব্যর্থ হয়। যদিও ৯০-দশক জুড়ে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এই পার্টি নতুন এক উত্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল মূলত তাদের ১ম পর্বের লাইনেরই পুনঃঅনুশীলন মাত্র। এ সম্পর্কে আমরা পরে কিছুটা আলোচনা করবো। মৌলিক বিষয় হলো এই যে, এ শতাব্দীর গোড়ায় পূবাকপা বিভক্ত হওয়া এবং কমরেড রাকা *(রাকেশ কামাল)*-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র থেকে এই ধারার সমগ্র কাজের এক সামগ্রিক ও মৌলিক লাইনগত সারসংকলন-কাজ সূচনার পূর্ব পর্যন্ত পূবাকপা ধারাটি লাইনের দিক থেকে নতুন কোনো বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়। বরং নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো লাইনটিকে তার সমস্ত দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলোসহ পুনঃপ্রয়োগের এই চেষ্টা একটা ট্র্যাজেডীতে পরিণত হয়, যাতে রাজনৈতিক বিচ্যুতিগুলো বৃদ্ধি পাওয়াই শুধু নয়, নৈতিক অধঃপতনের একটা ভয়াবহ সংকটেও শেষ পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন অংশ নিপতিত হয়।

এ অবস্থায় দেখা যায় যে, শুধুমাত্র আমাদের পার্টি কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের সার্বিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা প্রকৃত ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যায়। কারণ, এ পার্টিই '৭৭-সাল থেকে ইতিবাচক সারসংকলনের একটি ধারায় প্রবেশ করে এবং অব্যাহত সারসংকলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়। এরই ফলশ্রুতি ছিল আমাদের পার্টির নেতৃত্বে ৮০-দশকের এক নতুন বিপ্লবী উত্থান– যা '৮৭–'৮৯-সালে দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন গতি সৃষ্টি করে, যখন কিনা এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনটিও দেশব্যাপী জেগে উঠেছিল। সে ধরনের একটি জাতীয় পরিস্থিতিতে শুধু আমাদের পার্টিই এককভাবে একটি মাওবাদী আন্দোলনের পুনর্জাগরণকে নেতৃত্ব দেয়। শুধু তাই নয়, সেটা দেশব্যাপী ব্যাপক জনগণের পক্ষ থেকে চালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একমাত্র ও শক্তিশালী প্রকৃত বিপ্লবী ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এদেশের বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনই শুধু নয়, এদেশের জনগণের আন্দোলনের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে ৮০-দশকের নতুন উত্থানটিকে লাইনগতভাবে পুনরায় পর্যালোচনা করাটা বিশেষ গুরুত্ব ধরে।

– এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মাও-পরবর্তী সার্বিক বিপর্যয়কালে নতুন যে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে মাওবাদের সপক্ষে দাড়ানোর প্রক্রিয়ায় আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে প্রথমবারের মত সরাসরি সংযুক্ত হয়। যার একটা ফল হলো,

'৮৪-সালে 'রিম' (RIM--Revolutionary Internationalist Movement/বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন)-এ পার্টির যোগদান; এবং পরবর্তীকালে রিম-এর মাধ্যমে এই সম্পর্ককে গুণগতভাবে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। ৮০-দশকে আমাদের বিপ্লবী উত্থান, এবং লাইনগত বিকাশের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল– যদিও ইতিপূর্বেই তার ভিত্তি অভ্যন্তরীণভাবেই রচিত হয়ে যায়– তার সবলতা ও দুর্বলতা সহকারে।

* ৮০-দশকে সমগ্র সারসংকলন প্রক্রিয়াটি ছিল খণ্ড খণ্ড, আংশিক ও ক্রমান্বয়িক। এটা শুরু থেকে মৌলিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে কেন্দ্রীভূত করে সামগ্রিক লাইনগত সারসংকলন আকারে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে ধাপে ধাপে তা এগোয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে ছোট ছোট, যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উল্লম্ফন ঘটানোর প্রক্রিয়ায় তা বিকশিত হতে থাকে। আজকে মাওবাদী আন্দোলনের বিগত যুগ থেকে রাপচারের অবস্থান থেকে বলা চলে যে, ৮০-দশক বহু গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক সারসংকলন করলেও, এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র অবদান রাখলেও, যাকিনা আজকের সার্বিক রাপচারকে সম্ভব করতেও ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তা ছিল প্রথম পর্বের মৌলিক কাঠামোর ভিতরকারই একটা নতুন স্তর; আরো সঠিকভাবে বলা চলে যে, সেটা ছিল প্রথম পর্ব ও বর্তমান রাপচারের মধ্যকার একটি সেতুবন্ধন– যাতে উভয় পর্বের ইতিবাচক উপাদান আমরা পাবো।

এটাই ছিল কারণ যে, কেন দীর্ঘ লয়ে ধাপে ধাপে আমাদের এ অগ্রগতিটা ঘটে। এর দুর্বলতা ও ত্রুটির পাশাপাশি ভাল ফলটা ছিল এই যে, ৮০-দশক জুড়ে সারসংকলনের নামে বিগত বৈপ্লবিক পর্যায়টিকে বাতিল করে দেবার যে সংশোধনবাদী ও বিলোপবাদী থাবা আন্তর্জাতিকভাবে ও দেশীয়ভাবে জোয়ার তুলে ফেলেছিল, আমরা তার থাবা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি।

তবে এটাও দেখতে হবে যে, একটা বড় সময় ধরে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে সারসংকলনকে এগোনোর যে উৎস এবং যে প্রক্রিয়া তাতে ৮০-দশক নতুন কিছু নিজস্ব/স্বতন্ত্র সমস্যা/বিচ্যুতিকেও গড়ে তোলে। এই মধ্যবর্তীকালটি দীর্ঘসময় ধরে তার নিজস্ব অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটিও সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং ৮০-দশকের অগ্রগতিগুলোকে তার সীমাবদ্ধতা/দুর্বলতাসহ এবং তার নতুন ধরনের বিচ্যুতিগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

* ৮০-দশকে আসবার আগে তার পূর্ববর্তী অল্প কিছু সময়কালের অন্তর্বর্তীকালের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিও প্রয়োজনীয়– ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বোঝার সুবিধার্থে।

আমাদের পার্টিতে '৭৪-সাল থেকেই বিপর্যয় শুরু হওয়া, '৭৫-সালের সূচনাতে কমরেড এসএস-এর লসের মধ্য দিয়ে তা ঘনীভূত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও '৭৫-সাল জুড়ে কার্যত তৎপূর্ব ধারার এক যান্ত্রিক অসৃজনশীল অনুশীলন হতে থাকে। ফলে কিছু প্রশ্নে

ইতিপূর্বকার গৌণ ত্রুটি প্রাধান্যে চলে আসে। বিশেষতঃ আন্তপার্টি দ্বন্দ্বের মীমাংসার ক্ষেত্রে একটা বাম সংকীর্ণতাবাদী বিভেদবাদী সমরবাদী লাইন পার্টিতে প্রাধান্য পেয়ে যায়– যা সামগ্রিক বিপর্যয়কে দ্রুততর করে। এর ফলশ্রুতিতে '৭৬-সাল নাগাদ জিয়াউদ্দিন, মতিন ও কামাল হায়দারের নেতৃত্বে পার্টি প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি এই তিনটি অংশ আত্মঘাতী বৈরী ও রক্তাক্ত বিভেদে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে জিয়াউদ্দিন-আরিফ-রানার নেতৃত্বাধীন ধারাটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি অংশ আরিফ-রানার নেতৃত্বে বিগত বিপ্লবী উত্থানকে নেতিকরণের এক পরিপূর্ণ ডান বিলোপবাদী লাইনে অধঃপতিত হয়; এবং অন্য অংশটি অল্প কিছু পরে জিয়াউদ্দিন-কামরুলের নেতৃত্বে হোক্সাবাদে গড়িয়ে পড়ে।

'৭৬-সালে কামাল হায়দারের নেতৃত্বে পার্টির প্রধান ধারাটি বিগত পর্বের একটি সারসংকলনের উদ্যোগ নেয়। এটি শ্রেণি লাইন-শ্রেণি অনুশীলনের প্রশ্নে পার্টির ডান বিচ্যুতির সমালোচনা করে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এটা ছিল মৌলিক সারসংকলনের একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু এটা কোনো সামগ্রিক লাইন ও কর্মধারাকে এবং সঠিক সারসংকলন আনতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু গণসংগঠনের প্রশ্নে সারসংকলনের ক্ষেত্রে এটি শীর্ষ-তত্ত্বের একটি প্রাথমিক সংস্করণে পা রাখে। এছাড়াও ব্যক্তিতাবাদী সারসংকলনের মধ্য দিয়ে বিগত বিপ্লবী পর্বটিকে নেতিকরণের একটি বিপজ্জনক পথেও সে পা রাখে, যা বহুবিধ নতুন বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত হয়। সর্বোপরি, সে সময়কার সর্বাধিক আশু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন– পার্টির বিভক্তি ও পার্টি-অভ্যন্তরস্থ দুই লাইনের সংগ্রামের প্রশ্নে চরম বিভেদাত্মক ও সমরবাদী লাইনকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে সংকটকে ভীষণভাবে ঘনীভূত করে তোলে।

ঠিক এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্ব পার্টিতে গৃহীত হয়। তাঁর নেতৃত্বে '৭৭-সাল থেকে পার্টিতে যে সারসংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সেটাই তৎকালীন কেন্দ্র সবিপ'র নেতৃত্বে পার্টির বিপ্লবী মাওবাদী সকল অংশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে (যার মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সবিপ'র সাথে কমরেড মতিনের নেতৃত্বাধীন অংশ "সত্তা"র ঐক্য) এবং সেই ধারাটিই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ৮০-দশকের বিপ্লবী উত্থানের লাইনগত ভিত্তি স্থাপন করে।

যদিও ৮০-দশকের সেই উত্থানটিও শেষে পর্যুদস্ত হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তীতে ৯০-দশক জুড়ে রাপচার প্রক্রিয়া শুরু করা ও তাকে সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে নেয়া, এবং নতুন শতাব্দীতে বিগত চার দশকের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের এক নতুন সংশ্লেষণ পর্যন্ত এগিয়ে নেবার দুরূহ লাইনগত কাজটিকে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্ব নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা পার্টির প্রথম পর্বের সামগ্রিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসবার পূর্ব-আলোচনায় আবার যাবো।

* '৭৪-পরবর্তীকালে পার্টির বিভক্তি-সমস্যা ও আত্মঘাতী বৈরিতাকে পর্যালোচনায় নেয়া এবং নতুন নীতি-পদ্ধতি বিকাশের মধ্য দিয়ে পার্টির নতুন ঐক্য গড়ে তোলা এ সময়কার প্রধানতম সফলতাগুলোর অন্যতম। অন্য যে প্রশ্নগুলোতে পার্টি এ সময়ে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটায় তার মাঝে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে অতিগুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো শ্রেণি-লাইন ও গণ-লাইনের প্রশ্ন। শুধু জনগণকে সংগঠিত করবার সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রেই নয়, পার্টি-গঠনের ও পার্টি-পরিচালনাসহ আন্তঃপার্টি সংগ্রামের মীমাংসার ক্ষেত্রেও গণলাইনের প্রশ্নটিকে অনেক জোরালোভাবে এসময়ে নিয়ে আসা হয়। যা কিনা পার্টি ঐক্য, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা, আন্তঃপার্টি সংগ্রাম, যৌথ নেতৃত্ব, কৃষক ও শ্রমিকের মাঝে ভিত্তি স্থাপন, গণসংগ্রাম-গণসংগঠন গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের ক্ষেত্রে নতুনতর ও উচ্চতর ভিন্ন মাত্রা পার্টিতে এনে দেয়। পার্টিকে উচ্চতর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে, নতুন সাংগঠনিক বিস্তার ঘটায়, নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলে এবং নতুন সংগ্রামের দিকে পার্টিকে এগিয়ে নেয়।

এ সময়টিতেই পার্টি মাও-পরবর্তী আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের সুকঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। প্রথমদিকে এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা ও মধ্যপন্থার সমস্যা এলেও পার্টি তা কাটিয়ে তোলে। এবং পার্টি দেশীয় ক্ষেত্রে চীনা-তেং ও হোক্সা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রামকে জাগরিত করে তোলে। এই সংগ্রাম মাওবাদ সম্পর্কে পার্টির উপলব্ধি ও ধারণাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশীয় মাওবাদী আন্দোলনে এই প্রথম মাও-কর্তৃক স্ট্যালিনের সারসংকলনকে আত্মস্থ করার কাজ শুরু হয়। জিপিসিআর-এ মাও-এর তেংবিরোধী শেষ সংগ্রামকে আলোচনা ও শিক্ষায় নিয়ে আসা হয়। মাও-এর দর্শন সংক্রান্ত গুণগত বিকাশের জিপিসিআর-পর্বটি এই প্রথম দেশের মাওবাদী আন্দোলনে অধ্যয়ন হয়। যাকিনা পার্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবং জিপিসিআর-এর শিক্ষার উপলব্ধি এভাবে গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

কিন্তু পার্টি এই মতাদর্শগত মহাবিতর্কের শিক্ষাকে নিছক তত্ত্বগত বা একাডেমিক আলোচনার মত করে সম্পন্ন করেনি। বরং বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তা দেশীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সারসংকলন কাজকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে শুরু করে। পার্টি প্রধানভাবে বাহিনী গঠনের পাশাপাশি গনসংগঠন-গনআন্দোলনের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করতে থাকে। এক্ষেত্রে নতুনতর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, এবং বহু বাস্তব নীতি-পদ্ধতিগত সমস্যার সমাধান করে। শ্রেণি লাইন-শ্রেণি অনুশীলন পার্টির ইতিপূর্বকার লাইন থেকে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি কাটাতে শুরু করে। যা একদিকে প্রধান দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত ত্রুটি, তথা আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রতি নতুন দৃষ্টিতে তাকানোর একটি নতুন চেতনার জন্ম দেয়, অন্যদিকে পাহাড়ী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, এ সময়ে পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্মতৎপরতায় সংযুক্ত হয়। এটা ছিল এক বিরাট অগ্রগতি, কারণ এটা পরবর্তীকালে আরো নতুনতর অগ্রগতি ঘটাবার পথ আমাদের সামনে খুলে দেয়– লাইনগত বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিপুল ইতিবাচক অবদান রাখার মধ্য দিয়ে।

– ৮০-দশকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো ফ্রন্ট-লাইনের প্রয়োগে অগ্রগতি। একদিকে গণসংগঠন-গণআন্দোলন প্রশ্নে বিকাশ, অন্যদিকে বিভিন্ন বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে সঠিক শ্রেণিগত ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও তাদের সাথে অবৈরী সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের ও ঐক্য-সমঝোতার এক নতুন অধ্যায় শুরুর দ্বারা যুক্তফ্রন্ট কার্যক্রমে পার্টির লাইনগত চেতনা বাস্তবায়নে বিকাশ ঘটে। পাশাপাশি ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের কৌশলগত লাইনের বিকাশ এবং যৌথ আন্দোলন ও যুগপৎ আন্দোলনের ধারা এ প্রশ্নটিকে আরো উচ্চতর মাত্রা দান করে।

– পার্টির মতাদর্শগত লাইনের বিকাশ নারীপ্রশ্নে পার্টির চেতনায় নতুন উল্লম্ফন ঘটায়।

– রাজনৈতিক কাজ ও পত্র-পত্রিকার কাজে পার্টি নতুনতর অগ্রগতির সৃষ্টি করে।

– শ্রেণি লাইন, গণলাইন, পার্টি-গঠন, যুক্তফ্রন্ট, আন্তর্জাতিকতাবাদ, নারী প্রশ্নসহ মৌলিক প্রশ্নাবলীতে পার্টির মতাদর্শগত-রাজনৈতিক অগ্রগতি অবধারিতভাবে পার্টির সামরিক কর্মকাণ্ডেও ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটায়। খতম-প্রশ্নে সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদকে অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়, অন্তত তার গুরুতর সমালোচনা হাজির করা হয়। সশস্ত্র অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটে। আর্থিক প্রশ্নে গণনির্ভরতা গড়ে ওঠে। বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে নিগেদ-তৎপরতা বিকশিত হতে থাকে।

* কিন্তু উপরোক্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সত্ত্বেও মৌলিক রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনে পার্টি ইতিপূর্বকার মৌলিক কাঠামোর সাথে তখনো রাপচার করতে পারেনি। শ্রেণি দ্বন্দ্বের বদলে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার (এবং '৭১-পূর্বকালের ও বৃটিশ-ভারতের সমাজ-বিশ্লেষণের) জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিপূর্ণ লাইনই অব্যাহত থাকে। সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণির বিপুল বিকাশ ও তার দ্বারা আর্থ-সামাজিক রূপান্তরকে আঁকড়ে না ধরে আধা-সামন্তবাদকে পুরনো ধারায় তুলে ধরা অব্যাহত থাকে। এবং সামরিক ক্ষেত্রে খতম দ্বারা সূচনা ও তাকে একটা স্তর পর্যন্ত প্রধানতম/কেন্দ্রীয় এ্যাকশন-রূপ হিসেবে অব্যাহত রাখার সাধারণ লাইন বজায় থাকে। প্রয়োগবাদী ধরনে প্রথমে সাংগঠনিক পদ্ধতি হিসেবে, ও পরে দেশব্যাপী ছড়ানো বেশি বেশি গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য 'এলাকা আঁকড়ে ধরা' হলেও ঘাঁটি-প্রশ্নে অস্পষ্টতা ও বিচ্যুতি অব্যাহত থাকে। গণসংগঠন-গণআন্দোলনের কাজ শুরু করা হলেও পার্টি-গঠন, যুক্তফ্রন্ট এবং যুদ্ধ গড়ে তোলা ও

বিকশিত করার জন্য গণসংগঠন-গণআন্দোলনের সামগ্রিক চরিত্রসম্পন্ন ভূমিকার উপলব্ধির অভাবে শহরে গণসংগঠন, গ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম ও তার ছায়ায় বিপ্লবী গনসংগঠন– এভাবে একটি খণ্ডিত কার্যক্রম গড়ে ওঠে। উপরন্তু, গণযুদ্ধ থেকে সরে যাবার নয়া অমাওবাদী লাইনকে সংগ্রামে তাকে "গণসংগঠনবাদ" বলে চিহ্নিত করার ফলে সে লাইনের অন্তর্নিহিত মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নটিতে, তথা অর্থনীতিবাদের প্রশ্নটিতে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত না হয়ে সংগঠনের রূপের উপর জোর পড়ে, যা গণযুদ্ধের সামগ্রিক লাইন, তার প্রস্তুতিসহ, বুঝতে আমাদের দুর্বলতা সৃষ্টি করে। মাওবাদী দাবীদার পার্টি-সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা, সমঝোতা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হলেও সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের নামে আন্তঃমাওবাদী বিভক্তির পূর্বকার সংকীর্ণতাবাদী ও বাম বিভেদাত্মক ধারা থেকে পরিপূর্ণভাবে রাপচার করতে আমরা ব্যর্থ হই।

এভাবে মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম উত্থান পর্বে স্থাপিত লাইনগত ভিত্তির সাথে রাপচারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আমরা ব্যর্থ হই। এবং তা করতেও ব্যর্থ হই। ফলত ইতিপূর্বকার বহু সমস্যা ও তার ক্ষত আমাদের মাঝে থেকে যায়। কিছু কিছু মৌলিক অগ্রগতি ও উল্লম্ফন ঘটলেও, এবং ৮০-দশক একটি নতুনতর ও উচ্চতর ধারা শুরু করলেও সেটা পূর্ব লাইনের গণ্ডি মূলত অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত সেসব ক্ষেত্রে নতুন ও গুণগতভাবে উচ্চতর সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়, যদিও তার অনেক উপাদানকে সে তৈরি করে দিয়েছিল।

একদিকে এই অসম্পূর্ণতা সংগ্রামের আরো উচ্চতর স্তরে আমাদেরকে এগিয়ে দিতে অক্ষম ছিল। অন্যদিকে প্রথম পর্বের কিছু অগ্রসর অনুশীলন ও চেতনা পরিবর্তিত অবস্থায় বজায় রাখতে আমরা ব্যর্থ হই; কিছু ক্ষেত্রে অতীত ভুলকে সংশোধন করার পথে কিছু নতুন ভুলের সূত্রপাত করি। এ সম্বন্ধে আলোচনা ও উপলব্ধিটাও জরুরি, কারণ ৮০-দশকের অগ্রগতির সাথে সাথে এই দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলোও আমরা পার্টিতে ও জনগণকে শিখিয়েছি ও প্রয়োগ করেছি। এসব থেকে মুক্ত না হলে, এগুলো সম্বন্ধে স্পষ্ট না হলে নতুন পর্যায়ের যে বিপ্লবী রাপচার তাতে আমরা সক্ষম হবো না।

– ৮০-দশকে আশু সমস্যাকে আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিবাদ, পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুনোর মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়বাদ, দ্বান্দ্বিকতার নামে সমন্বয়বাদ এবং রাপচার সম্পন্ন না করার মধ্য দিয়ে মধ্যপন্থা– এসব সমস্যার কম/বেশি উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এইসব মতাদর্শগত-রাজনৈতিক বিকাশ আমাদের সামরিক-সাংগঠনিক কাজেও ছোট/বড় খারাপ প্রভাব রেখেছিল। এসবের প্রকাশগুলোকে নিচে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

৮০-দশকের একেবারে শুরুতে, বা তার কিছু আগে থেকে যখন মাদারীপুর সংগ্রাম গড়ে ওঠে তখন সেটা পার্টির পুনর্গঠন ও সার্বিক বিপর্যয় কাটিয়ে তোলা, শ্রেণি ও গণলাইনের উচ্চতর প্রয়োগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আন্দোলনের ১ম পর্বের সামগ্রিক বিপর্যয়ের পর এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার কাজে মাদারীপুর-সংগ্রামের অবদানকে কোনোভাবেই খাট করা যাবেনা।

– কিন্তু এ সংগ্রামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তার "জাসদ-বিরোধী সংগ্রাম"। মাদারীপুরের গ্রামাঞ্চলে সেসময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাসদের সশস্ত্র তৎপরতা গণবিরোধী ফ্যাসিস্ট তৎপরতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তারা সাধারণ জনগণের উপর এক সার্বিক অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। একইসাথে তারা এ অঞ্চলে পার্টিকে উচ্ছেদের এক প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। তারা পার্টির নেতা-কর্মীদের হত্যা করার এক সার্বিক অভিযান চালায়। এমনকি এসব কাজে তারা কম/বেশি পরিমাণে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক ভূমিকাও পালন করে। সুতরাং জাসদের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়ানো তখন দুঃসাধ্য, সম্ভবত অসম্ভব ছিল।

কিন্তু তাসত্ত্বেও এ প্রশ্নে আমরা যে স্বতঃস্ফূর্ততা/আশু সমস্যার লেজুড়বৃত্তি করেছিলাম এবং জাসদবিরোধী সংগ্রামকে এক পর্যায়ে এক সামগ্রিক ও প্রধান সংগ্রামে পরিণত করেছিলাম সেটা সঠিক ছিল না। সে সময়কার দেশব্যাপী সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে জাসদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আমরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারিনি। যদিও খতম লাইন, জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান, জাসদের চরিত্র নির্ধারণ, অন্যান্য সংশোধনবাদী পার্টিগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তখনো চলমান অতীত ত্রুটিগুলোর থেকে এই সমস্যা বিচ্ছিন্ন ছিল না, কিন্তু তাসত্ত্বেও এ ত্রুটির জন্য ৮০-দশককেও দায়ী করতে হবে। শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত করার বিপ্লবী রাজনীতির জায়গায় এ সংগ্রামকে সামনে নিয়ে আসাটা পার্টিতে সংস্কারবাদী-অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিকে বিকশিত করে।

– ৮০-দশকে এসে বাস্তব ও আত্মগত পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পূর্বতন খতম লাইনের অনুশীলনও পার্টিতে অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ ও ক্রমান্বয়বাদকে শক্তিশালীকরণে ভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে। কারণ, এ সময়টাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আক্রমণ উত্তীর্ণ করাটা ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে আসতে থাকে। বাংলাদেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্র ইতিমধ্যেই তার শৈশবকাল পাড়ি দিয়েছিল। তার প্রাথমিক বিশৃংখলা ও দুর্বলতা সে কাটিয়ে তুলেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতির পথে হাঁটা শুরু করেছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি অনেক বেশি করে তার স্থানিক চরিত্রকে বদলে ফেলে জাতীয় চরিত্রের অঙ্গিভূত হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে জনগণের বিপ্লবী উত্থান থিতিয়ে এসেছিল। বিশেষত মাওবাদী আন্দোলন বহুধা বিভক্তি ও অধঃপতনের পথে হাঁটছিল। তাই, সশস্ত্র সংগ্রাম প্রথম পর্বে যতটা সহজসাধ্য ছিল,

ধীরে ধীরে তা ততটাই জটিল ও কঠিন হয়ে উঠছিল। সুতরাং খতম যথাসাধ্য কমিয়ে আনা, এবং সংস্কারবাদী ধারার খতম তৎপরতাকে যথাসাধ্য এড়ানোর ইতিবাচক প্রচেষ্টা আগের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও খতমকে একটা স্তর হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আক্রমণে উন্নীত করবার পর্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিবাদী চেতনা ও ধারা আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে।

* এ সময়টাতে বাহিনী ও যুদ্ধ, তথা, সংগ্রাম ও সংগঠনের বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির পূর্বতন (এসএস-আমলের) পর্যায়ভিত্তিক বিকাশের ভুল চেতনা নতুনভাবে সূত্রায়িত করা হয়– যা প্রথমে "তিন-স্তর" ও পরে "দুই-স্তর" বিশিষ্ট বিকাশের প্রকল্প উপস্থাপন করে। এটা ছিল পূর্বের মতই সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী ও প্রয়োগবাদী। তবে পূর্বতন বাহিনী ও যুদ্ধের সাথে সাথে এটি গণসংগঠন, গণভিত্তি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নগত নতুন ধারার কাজগুলোকে সমন্বিত করেছিল মাত্র।

বাস্তবে এই তিন-স্তর বা দুই-স্তর– এসবই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন-সংগ্রামের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে চিহ্নিত করেছিল। সুতরাং তা যুদ্ধকে বাতিল করার বা পরের কাজে পরিণত করার কোনো লাইন ছিল না, যেমনটা ৯০-দশকে টুএলএস চলাকালে ভিন্নমতকারী কমরেডদের অনেকে বলেছিলেন। তার প্রকৃত সমস্যাটি ছিল এই যে, সেটা প্রথমত খতম-স্তরের সামরিক লাইনের ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। দ্বিতীয়ত তা গণভিত্তি স্থাপন, গণসংগঠন গঠন ও প্রাথমিক কর্মসূচি বাস্তবায়নকেও খতম-পরবর্তী কাজের একটা স্তর/পর্যায়ের মত করে এনেছিল, যা কিনা খতম স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, খতম দিয়ে সূচনার সাধারণ লাইন, বা খতম-স্তরের লাইন কেন ভুল। যুদ্ধের সূচনা থেকেই রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদকে কেন্দ্রে রেখে সকল ধরনের এ্যাকশন রূপকেই কার্যকর করার প্রচেষ্টা রাখতে হবে, যখন যেখানে যেটা সম্ভব তা দ্বারা; অনিয়মিত গেরিলা সংস্থানের পাশাপাশি নিয়মিত গেরিলা দল (নিগেদ) বিকাশের পদক্ষেপ রাখতে হবে; বাহিনীর পাশাপাশি গণসংগঠন গড়ার পদক্ষেপ নেয়া, গণভিত্তি অর্জন, এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরুর প্রচেষ্টা রাখতে হবে– যেসব কিনা যুদ্ধের বিকাশের সাথে সাথে এগিয়ে চলে। এসব কাজ নিশ্চয়ই আমাদের সামর্থ্যের সাথে মিলিয়ে নিম্ন পর্যায় ও মাত্রা থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর পর্যায় ও মাত্রায় উঠতে থাকে। যাকে একেকটা সময়ে বস্তুগত ও আত্মগত পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা বিকশিত করতে পারি। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ, সংগঠন ও রাজনৈতিক কাজকে যদি তার এ্যাকশনরূপ বা সংগঠনের রূপের ভিত্তিতে লাইনগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়, তাহলে অনির্বাযভাবেই তা যুদ্ধ ও সংগঠনের নীতিসমূহের সমগ্রতা সম্পর্কে দুর্বল উপলব্ধি সৃষ্টি করবে। এমনকি তা একপেশেভাবে কোনো এক নিম্ন পর্যায়ে আটকে পড়তে পারে, যাকিনা যুদ্ধবিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যুদ্ধকে

পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বাস্তবে এটা হলো পরিকল্পনার কাজ, যাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় ও লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করতে হবে।

এভাবে সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লাইনগতভাবে পর্যায়/স্তর বিভক্তি আমাদের মাঝে প্রয়োগবাদের গুরুতর ত্রুটি থেকে উদ্ভূত, ক্রমান্বয়বাদ বিকাশের একটি বড় প্রকাশ। যা এক ধরনের অর্থনীতিবাদের ভিত্তিও সৃষ্টি করেছিল।

* প্রথম পর্বে '৭৩/'৭৪-সালে থানা-ফাঁড়ি দখলের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আক্রমণের যে রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার সারসংকলন প্রচেষ্টা এ সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল। উক্ত লাইনে রণনৈতিক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করার বদলে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার উপর জোর প্রদান করা, দখলকৃত অস্ত্রকে বাহিনী গঠনে ব্যবহার না করে কার্যত ব্যাপকভাবে ফেলে রাখা ও এভাবে বাহিনী গঠনকে দুর্বল করে ফেলা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষমতা দখলের উপর কম গুরুত্ব দেয়া, শ্রেণি লাইনের দুর্বলতা, গণলাইন-গণভিত্তি-গণসংগঠন গঠনে দুর্বলতা বা তা না করা– ইত্যাকার যে সমস্যাদি ঘটেছিল– যা কিনা মূলত ঘাঁটিপ্রশ্নে আমাদের ডান বিচ্যুতি/অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী বিচ্যুতির রাজনৈতিক ও সামরিক ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল– সেসবের উদ্ঘাটন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমরা এ্যাকশনের রূপের উপর আমাদের আলোচনাকে ভুলভাবে কেন্দ্রীভূত করি। শুধু তাই নয়, সশস্ত্র সংগ্রামকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আক্রমণে উন্নীতকরণের পূর্বতন ইতিহাসের ইতিবাচক সামরিক তাৎপর্য থেকে আমরা লাইনগতভাবে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ি।

এটা সত্য যে, '৭৩-সালের এই রণনৈতিক পরিকল্পনাকে যান্ত্রিকভাবে পুনঃঅনুশীলন করে চলার দুর্বল সামরিক চেতনা তখনই বিকশিত হয়েছিল, যা পরে, ৮০-দশকে একইভাবে অনুসরণ করতে যাওয়া অবশ্যই ভুল হতো। কারণ, সেটা সেভাবে আর কখনো প্রয়োগযোগ্য ছিল না। এটাও সত্য যে, ৮০-দশকে উক্ত এ্যাকশন রূপকে আমরা বেশ গুরুত্বসহকারেই ও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে যেতে সক্ষমও হই– যা ৮০-দশকের বিপ্লবী উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু আমরা ক্রমান্বয়ে এমন একটি চেতনার দিকে অগ্রসর হই যে, দমনরত শত্রুবাহিনীর উপর নিগেদ-ভিত্তিক এ্যামবুশ আক্রমণই হবে আমাদের যুদ্ধের মূল রূপ। এভাবে আমরা 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' লাইনের একটি ভুল চেতনার ভিত্তি স্থাপন করি। বাস্তব অনুশীলনে আমরা পুরোপুরিভাবে 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' লাইন অনুশীলন করেছি তা নয়, বরং আমরা প্রথম পর্বের অনুশীলনের সাথে একটা সমন্বয় করি। এভাবে বাস্তব কাজে একটি সমন্বয়বাদ গড়ে উঠে। কিন্তু লাইনের দিক থেকে এটা 'প্রতিরোধ যুদ্ধ'র ভুল লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই সারসংকলনের ইতিবাচক প্রবণতা ছিল এই যে, একটা রণনৈতিক অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়/শত্রু দমনের মধ্যে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে এবং আক্রমণ করে টিকে

থাকতে হবে– এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্যার প্রতি এটা দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার কথা বলে– যা প্রথম পর্বে মীমাংসিত হয়নি। এমনকি কার্যত উত্থাপিতও হয়নি। বরং তখন ভুলভাবে ছড়ানোর উপর প্রধান গুরুত্বদানের মধ্য দিয়ে টেকার চেতনা ও কর্মধারা সমস্যা-সমাধানের বিপরীত পথে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকি '৭৪-সালের শেষে তৎকালীন শক্তিশালী অঞ্চলগুলোতে বিপর্যয় ও সংকট দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার পর তার সারসংকলনে বিপরীতমুখী ধারা গড়ে ওঠে এইভাবে যে, কোনো অঞ্চল উচ্ছেদ হবে, আবার অন্য কোনোটা এগিয়ে যাবে– এটাই নিয়ম। এই সারসংকলন অঞ্চল আঁকড়ে ধরা– বিক্ষিপ্ত ছড়ানোর উপর জোর প্রদানের বদলে; নিগেদ গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া– অনিয়মিত গেরিলা সংস্থান গড়ে তোলার উপর জোর দেবার বদলে; এবং যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় অবিলম্বে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু করা– তাকে ভবিষ্যতের জন্য বা ঘাঁটি এলাকার জন্য ফেলে রাখার বদলে– এই মূলগত বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে আসে। এর সাথে যুক্ত করে শ্রেণি লাইন ও গণলাইন/গণভিত্তির বিকাশ সাধনের বিষয়গুলো। এই বিষয়গুলোকে তখন ৫টি সূত্র– শ্রেণী লাইন, গণলাইন, এলাকা, বাহিনী ও কর্মসূচি– আকারে আমরা তুলে ধরি। যদিও এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৮০-দশকেও ৭০-দশকের লাইন-নীতির মতো করে রণনৈতিকভাবে অঞ্চল আঁকড়ে না ধরা ও পশ্চাদপসরণের নামে এক অঞ্চলের সংগ্রামে ধাক্কা খাবার পর তা থেকে প্রায় সরে গিয়ে নতুন অঞ্চলের উপর জোর প্রদানের সমস্যা ব্যাপকভাবে রয়ে গিয়েছিল, যা আমাদের সংগ্রামকে গুণগতভাবে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতি করেছে।

যাহোক, এই সমস্যাগুলো সত্ত্বেও আমরা এসময়টাতে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসা শুরু করি, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক এবং সামরিক-সাংগঠনিক অগ্রগতির বিষয় ছিল। কিন্তু এগুলো ঘাঁটির রাজনৈতিক-সামরিক লাইনে নিজেকে তখনো উত্তরণ ঘটাতে না পারার কারণে ঘাঁটি-প্রশ্নে পূর্বতন ধারা থেকে রাপচার করতে ব্যর্থ হয়। ফলে এলাকা আঁকড়ে ধরা দুর্বল হয়, সামরিকভাবে বাহিনী আশানুরূপ বিকশিত হয়না, এবং দমনরত শত্রু-বাহিনীর উপর কাংক্ষিত আক্রমণে সফল হতে আমরা মূলত ব্যর্থ হই। অন্যদিকে এটা সামরিক ক্ষেত্রে অন্তত লাইনের দিক থেকে এ্যাকশনের একটি রূপকে (এ্যামবুশ) অযথার্থভাবে একতরফা জোর দেয়, এ্যাকশনের সমস্ত রূপগুলোই-যে প্রকৃত যুদ্ধেরই অংশ, এবং তার সমগ্র যোগফলই যে যুদ্ধকে ও আমাদের সামর্থ্যকে এগিয়ে দেয় এবং শত্রুকে দুর্বল করে– এই সঠিক চেতনাকে দুর্বল/ঝাপসা করে দেয়। এটা লাইনের দিক থেকে নির্দিষ্ট সংগ্রামী অঞ্চলে যুদ্ধকে সংকীর্ণ করে ফেলার বিপদ সৃষ্টি করে এবং গেরিলা যুদ্ধে এ্যাকশনের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্যের বদলে প্রতিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্যকে শক্তিশালীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যা কিনা বহির্লাইনে আক্রমণ এবং দেশব্যাপী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের রাজনৈতিক-

সামরিক দিশাকে দুর্বল করে দেয়। এভাবে প্রথম পর্বে যা ঘটেনি, তেমন একটি 'প্রতিরোধ যুদ্ধ'-লাইনের নতুন বিচ্যুতি এ সময়ে গড়ে ওঠে, যা ঘাঁটি-প্রশ্নে চলমান দুর্বলতার সাথে যুক্তভাবে আমাদের ৮০-দশকের পরাজয়ের মূল সামরিক কারণ হয়ে রয়েছে।

* এ সময়টাতে আমরা 'রিম'-এ যুক্ত হই। এবং 'রিম'-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চলমান গণযুদ্ধে প্রযুক্ত লাইন সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত হতে শুরু করি। বিশেষত ভারতের ও ফিলিপিনের বহুবিধ লাইনগত বিচ্যুতি ও প্রবণতার মাঝে সঠিক দিকগুলো আমরা খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময়কার সবচেয়ে অগ্রসর গণযুদ্ধ– পেরুর গণযুদ্ধ থেকে আমরা পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। এর একটা বড় কারণ ছিল এই যে, পরবর্তীকালে পেরুর গণযুদ্ধের শিক্ষাগুলো যতটা ব্যাপকভাবে বাইরে এসেছে, ৮০-দশকে তখনো সেটা সুসংহতভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়নি। বিশেষতঃ '৮৮-সালে পেরুর পার্টির কংগ্রেস এবং 'রিম'-এর সাথে '৯০/'৯১-সালে সর্বপ্রথম এক সার্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে যখন পেরু-অভিজ্ঞতা সত্যিকারভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন বাস্তবে আমাদের সংগ্রাম তার বিকাশের শীর্ষস্থান থেকে বিপর্যয়ে প্রবেশ করেছে। এভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষাগুলোকে আমরা তখনো বড় একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে নিতে পারিনি। ৮০-দশকের সংগ্রামের বিপর্যয় পার্টিকে এবং সেই সাথে এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে এক নতুন অধ্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়। ৯০-দশকের শুরুতেই এই নতুন অধ্যায়ের শুরু, যখন কিনা বিগত আন্দোলন থেকে এক সামগ্রিক রাপচার শুরু হয়। এটা বিপর্যয় থেকে আন্দোলন উদ্ধারের এক নতুন প্রচেষ্টা, যা ৯০-দশক জুড়ে অব্যাহত থাকে।

যদিও ৯০-দশক জুড়ে পূবাকপা দেশের পশ্চিমাঞ্চলে তাদের পার্টির নেতৃত্বে এক নতুন উত্থানকে নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু যেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে উত্থান ছিল মূলত তার পূর্ব লাইনেরই ধারাবাহিকতা। পূবাকপা '৭২/'৭৩-সালে তাদের ১ম উত্থান-পরবর্তী একটি সারসংকলন করেছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে শুধু আন্দোলন নয়, পূবাকপা ধারা নিজেরাই কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে তার ভূমিকা সম্পর্কে এখন তেমন কিছু বলা যাচ্ছে না। পূবাকপা কমরেড চৌধুরীর নেতৃত্বে যে নতুন ধারা রচনা করে, তা না ছিল নতুন, না ছিল মতাদর্শগত-রাজনৈতিকভাবে উচ্চতর। এটা ছিল– তাদের পুরনো লাইনেরই একচ্ছত্র প্রয়োগ, ফলত তা ছিল নতুনতর পরিস্থিতিতে এক পশ্চাদপদ প্রচেষ্টা। সেজন্য দেখা যায় যে, এই ধারা এ সময়টিতে রাজনৈতিক-মতাদর্শগতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর নিম্নগামী হয়। সর্বোপরি, এটা আন্দোলনকে লাইনের দিক থেকে ও সংগঠন-সংগ্রামের দিক থেকে উচ্চতর স্তরে নিতে ব্যর্থ হয়, যদিও এ্যাকশন-রূপের ক্ষেত্রে এ সময় কিছু কিছু নতুন উপাদান পরিলক্ষিত হয়, যেমন, শহরে এ্যাকশন ও খতম, অথবা পুলিশের উপর আক্রমণে সফল বোমা এ্যাকশন– যা থেকে আন্দোলনকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে।

এই পার্টি এ শতাব্দীর শুরুতে বিভক্ত হবার পরই মাত্র কমরেড রাকা ও কমরেড কামরুল মাস্টারের নেতৃত্বাধীন অংশটি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার এক সামগ্রিক সারসংকলনের পথে অগ্রসর হয়। যা কিনা একই সময়কালে আমাদের পার্টির বিগত শতকের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের সামগ্রিক ও মৌলিক সারসংকলনের মাধ্যমে তার সাথে এক বিপ্লবী রাপচার ঘটানোরও সময়কাল। এই শতাব্দীর শুরু থেকে সূচীত এই প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে।

মধ্যবর্তী ৯০-এর দশকটিকে কার্যত চলমান রাপচার প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ধাপ ও অন্তর্বর্তীকাল বললে ভুল হবে না। সে পর্যায়টিকেও আমাদের ভালভাবে আলোচনা করতে হবে, কারণ, এ সময়টা ছিল কার্যত আমাদের পার্টি তথা মাওবাদী আন্দোলনে এক সামগ্রিক টুএলএস বিকাশের পর্ব– যাকিনা অপরিণত অবস্থাতেই আমাদের পার্টিতে এক সার্বিক বিভক্তি সৃষ্টি করে। আজকের নবপর্যায়ের পরিস্থিতিটি বুঝতে হলে ৯০-দশকে মাওবাদী আন্দোলনের এই নব-বিভক্তি ও সামগ্রিক টুএলএস-কে মনোযোগ দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। যাতে তা থেকে আমরা লাইনগত শিক্ষাটিকে আয়ত্ত করে নিতে পারি।

রাপচার শুরু, কিন্তু অসম্পূর্ণ ও বিচ্যুতিসম্পন্ন– ৯০-দশক

প্রথম পর্বের উত্থানের একটি ক্রমান্বয়িক সারসংকলনভিত্তিক দ্বিতীয় বিপ্লবী উত্থান ৮০-দশকের শেষে এসে যখন বিপর্যস্ত হয়ে গেল, তখন উচ্চতর লাইন-বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় পুনরায় আমাদের পার্টিই শুধু ব্রতী হলো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পূবাকপা তখনো পুরনো বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ। আর বিএসডি-ধারা এ সময়টাতে নিজেকে আরো গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। বিপ্লবী উত্থানে সামগ্রিক বিপর্যয়ের পর যা সর্বত্রই ঘটে থাকে, ৯০-দশকে আমাদের পার্টির ইতিহাসও তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। ব্যাপকহারে ঝরে পড়া, হতাশা, বিভ্রান্তির পাশাপাশি পার্টির মধ্যে এর সারসংকলনকে ঘিরে নতুনতর টুএলএস-এর উদ্ভব এরই অংশ ছিল। ৮০-দশকের সারসংকলন এবার রাপচারে এগিয়ে যেতে শুরু করে। স্বভাবতই পার্টি-অভ্যন্তরস্থ মতপার্থক্য হয় অনেক ব্যাপক। প্রথমদিকে এই মতপার্থক্য ছিল সুপ্ত। কিন্তু নতুন সংগ্রাম জাগরিত করবার পুনঃপ্রচেষ্টার সারসংকলনকে ঘিরে দ্রুতই এই মতপার্থক্য কার্যত সমগ্র অতীত ইতিহাসকে ধরে টান দেয়। এর সাথে যুক্ত হয় নতুন পরিস্থিতিজাত (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) নতুনতর বিষয়াবলী। যা শেষ পর্যন্ত দশকের শেষ পর্যায়ে এসে পার্টির বিভক্তিতে পর্যবসিত হয়। নতুন সংগ্রাম জাগরিত করবার প্রচেষ্টার সারসংকলনকে ঘিরে এই মতপার্থক্য সূচিত হলেও বাস্তবে এর উৎস নিহিত ছিল এ পর্যন্তকার মাওবাদী আন্দোলনে পুরনো লাইন, সংগ্রাম, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা– তথা পুরনো ধারার থেকে অপরিহার্য রাপচারের প্রয়োজনকে ঘিরে এক সার্বিক চরিত্রের দুই লাইনের সংগ্রাম।

* ৯০-দশকের সূচনায় আমাদের পার্টি সারসংকলনের ক্ষেত্রে দুটো মৌলিক প্রশ্নে অতীতের সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়। যাকে আমরা ৩য় কংগ্রেস লাইন বলে থাকি। ১) আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন; ২) সামরিক ক্ষেত্রে খতম লাইনের প্রশ্ন।

এ দুই ক্ষেত্রে অতীত থেকে সরে আসার মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি-ইতিহাসে অতীতের লাইনের সাথে সামগ্রিক রাপচার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে। ৯০-দশক জুড়ে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে, টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে, যা এই শতকের প্রারম্ভে এসে এক নতুন স্তরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঠিক এ সময়টাতে এসেই পূবাকপা'র সবচেয়ে অগ্রসর অংশটি কমরেড রাকা'র নেতৃত্বে এই সামগ্রিক সারসংকলনের জগতে ধাপে ধাপে প্রবেশ করতে থাকে, যা আন্দোলনে গুণগত অগ্রগতির এক নতুন দুয়ারকে উন্মোচন করে। এরই প্রকাশ আমরা আজকের মাওবাদী আন্দোলনে দেখতে পাবো, যে সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এর আগে ৯০-দশকের প্রচেষ্টা,

টুএলএস এবং আমাদের পার্টির ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম ভাঙনটিকে* আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।

* ৯০-দশকের শুরুতে আমাদের পার্টি লাইনের-ক্ষেত্রে যে সমস্ত মৌলিক নতুন সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেছিল সেগুলো হলো–

ক) মতবাদকে 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা'র বদলে 'মাওবাদ' বলে সূত্রায়ন করা।
খ) আমাদের পার্টি-ইতিহাসে তৎপূর্ব সময়কালে রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণে যে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ঘটেছিল তার উদ্ঘাটন করা।
গ) সামরিক ক্ষেত্রে পার্টির ইতিপূর্বকার খতম লাইনকে পরিবর্তন করা।
ঘ) আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সাথে শ্রমিক-কৃষকসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করা। এবং,
ঙ) আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে 'আধা-সামন্ততন্ত্র' পরিবর্তে 'বিকৃত পুজিবাদ' মূল্যায়ন গ্রহণ করা।

এইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এই অধ্যায়ে ইতিবাচক অগ্রগতি যেমন ছিল, তেমনি ছিল কতকগুলো গুরুতর অসম্পূর্ণতা। একইসাথে ছিল অনেক বিষয়ে অতীতের ভুলের জের টেনে চলাও। পাশাপাশি কিছু নতুন বিচ্যুতি ও ত্রুটিও এখানে সংযুক্ত হয়।

সুতরাং এক জটিল সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের শুরু, যা শীগগিরই নিজ নিজ সামগ্রিক মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হতে থাকে। একটা পর্যায়ে এই ধারাগুলোর মধ্যে বিভক্তি ঘটে। এই শতাব্দীতে এসে বিভক্ত ধারাগুলো নিজ নিজ কার্যক্রম ও বিকাশের চরম সীমায় পৌঁছাতে থাকে– যার মূল্যায়ন আলোচনা আমরা পরে করবো।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নে নতুন মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও প্রয়োগগতভাবে সামরিক লাইনের প্রশ্নটিই আশুভাবে সামনে চলে আসে, কারণ, পার্টি অতিদ্রুত নতুন সশস্ত্র সংগ্রাম জাগরিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেক্ষেত্রে সামরিক লাইনের পরিবর্তনটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে। এভাবে কিছু পরেই পার্টিতে যে মতপার্থক্য গড়ে উঠতে থাকে তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সামরিক লাইনের প্রশ্নটি। সুতরাং এর উপরই আমরা প্রথমে আলোচনা করতে চাই।

১। সামরিক লাইন ও খতম লাইন ঃ

এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে খতম লাইনের সুবিপুল প্রভাবের প্রেক্ষিতে তার সাথে বিপ্লবী রাপচার খুব সহজ ছিল না। ইতিপূর্বে খতম লাইন বর্জনের সকল উদ্যোগগুলো ছিল কার্যত সংশোধনবাদী ও বিপ্লব বর্জনের অবস্থান থেকে– যেগুলো

* *পার্টির ইতিহাসে ইতিপূর্বে আরো দুইটি প্রধান ধরনের ভাঙন ঘটেছিল। তার প্রথমটি ঘটেছিল ১৯৭২ সালে কমরেড এসএস-আমলে ফজলু-সুলতান চক্রের উদ্ভবের দ্বারা। আর দ্বিতীয়টি ঘটেছিল এসএস-এর মৃত্যুর পরপরই '৭৫ ও '৭৬ সালে পার্টির বৃহৎ বিভক্তির মধ্য দিয়ে।*

মধ্য সত্তর-দশক থেকে শুরু করে সমগ্র ৮০-দশক জুড়ে রাজত্ব করে। তাই, এত বছর পর একটি বিপ্লবী অবস্থানের ভিত্তিতে খতম লাইনের এ সারসংকলন কাজ শুরু করাটা একটা বিরাট ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কীভাবে এ লাইন গণযুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে খতমকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে এবং একটি স্তর পর্যন্ত তাকে চালিয়ে যাবার কথা বলার মাধ্যমে গণযুদ্ধকে প্রথম থেকেই রাষ্ট্রবাহিনীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করার রাজনৈতিক ও সামরিক চেতনা এবং বাস্তব বিপ্লবী পদক্ষেপকে দুর্বল করে দিয়ে সামরিক ক্ষেত্রে পরাজয় ডেকে আনে, কীভাবে এথেকে উদ্ভূত হয় সংস্কারবাদ ও অর্থনীতিবাদ– এ সকল মূল্যায়নের বিপুল বিপ্লবী গুরুত্ব ছিল, যা প্রাথমিকভাবে এই সারসংকলনকালে সৃষ্টি হয়।

কিন্তু খতম লাইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুতর ত্রুটি ও দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। প্রথমত গণযুদ্ধের একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের বদলে এই সারসংকলন এ্যাকশন-রূপকে ধরে মূল্যায়ন করে। এবং খতমের পরিবর্তে প্রথম থেকেই রাষ্ট্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ– গণযুদ্ধ সূচনার এই নতুন ধরনের একতরফাবাদী সাধারণ লাইন হাজির করে।

উপরন্তু গণযুদ্ধ সূচনার এই নতুন সাধারণ লাইনে অন্তর্নিহিত আরো যে দুটো বিপদ যুক্ত ছিল তাহলো– এক: রাষ্ট্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র জন্য যে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, এমনকি সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তাকে উপলব্ধি না করে মাওবাদী আন্দোলনের এতদিনকার একতরফাবাদী ধারা অনুসরণ করে 'শূন্য থেকে যুদ্ধ' বা 'প্রথম থেকেই যুদ্ধ'– এই নীতিকে যান্ত্রিকভাবে চালু রাখা; দুই: ৮০-দশকে রাষ্ট্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে একতরফাভাবে 'দমনরত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে নিগেদভিত্তিক এ্যামবুশ লড়াই'-এর নামে 'প্রতিরোধ যুদ্ধ'-ধর্মী লাইন হিসেবে দেখার ও এভাবে লাইন আনার যে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ভুল নীতিকেও চালু রাখা।

কিন্তু 'শূন্য থেকে' এবং 'প্রথম থেকে'ই এ ধরনে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আমাদের দেশে বর্তমান বস্তুগত ও আত্মগত অবস্থায় আমরা সাধারণত সক্ষম নই। এবং তখনও তার দ্বারা নতুন সূচনা করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না।

তবে আমাদের আত্মগত পরিস্থিতির জায়গা থেকে সেসময়কার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল এই যে, খতম স্তরকে আমাদের সংগ্রাম অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। ৮০-দশকের সংগ্রাম বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রবাহিনীর উপর আক্রমণকে সামরিক সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু করা এবং যত দ্রুত সম্ভব তাতে উত্তীর্ণ হওয়াটা তখন ছিল জরুরি। যাকিনা রণনৈতিক পরিকল্পনায় আনতে হতো, আমরা তা এনেছিলাম, এবং তা আনাটা সঠিকও ছিল। কিন্তু একে লাইন হিসেবে নিয়ে আসার ফলে প্রথম পর্যায়ের তৎপরতার সারসংকলনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিতে তৎকালে বিরাজমান বিভিন্নমুখী ভুল চেতনার প্রকাশ পেতে থাকে, যা পরবর্তীকালে এক বৃহৎ দুই লাইনের সংগ্রাম আকারে বিকশিত হয়ে ওঠে।

* বাস্তবে আমাদের চলমান সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমরা না পারতাম সূচনাতে খতম-কে বাদ দিতে, না পারতাম '৭৩/'৭৪-ধর্মী ও ৮০-দশকেও ব্যাপকভাবে অনুশীলিত কমান্ডো এ্যাকশনের মাধ্যমে থানা-ক্যাম্পের উপর আক্রমণ ও অস্ত্রদখলের এ্যাকশনকে এড়িয়ে গিয়ে প্রথমেই নিগেদ-ভিত্তিক দমনরত শত্রুবাহিনীর উপর এ্যামবুশ-জাতীয় আক্রমণ হানতে। কার্যত এ দুটোই আমরা রাখলাম। লাইনের আরো বিকাশের কথা বললাম। রাজনৈতিক প্রচারের উপর জোর দিলাম। সীমিত খতমকে যুদ্ধের প্রস্তুতিকাজ বলে আখ্যায়িত করলাম। কমান্ডো এ্যাকশনের রূপে রাষ্ট্রবাহিনীর উপর আক্রমণকে অস্ত্র-দখলের 'বিশেষ' এ্যাকশন বলে চিত্রিত করলাম। কিন্তু তাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা আনার প্রচেষ্টায় আমরা এসবকে 'যুদ্ধ' বা 'প্রকৃত যুদ্ধ' না বলে যুদ্ধ-পূর্ব 'সশস্ত্র সংগ্রাম'-এর একটা পর্যায় বলে সূত্রায়িত করলাম, যাকে গণযুদ্ধের একটা প্রস্তুতি-পর্যায় বলেও আমরা মুল্যায়ন করলাম। এভাবেই 'সস-পর্যায়' নিয়ে পার্টির নতুন পর্যায়ের লাইনগত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটলো।

– এই বিতর্ক প্রকৃত আলোচনা ও বিতর্ককে ভুলভাবে অন্য জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে, সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে। সিসি-ধারা থেকে আমরা বলেছিলাম যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত, এমনকি দমনরত শত্রু-বাহিনীর উপর নিগেদ-ভিত্তিক এ্যামবুশ আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম প্রকৃত যুদ্ধ নয়। আমরা এটাও বললাম যে, যুদ্ধ হলো দুই বাহিনীর মধ্যকার লড়াই। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে উন্নীত না হলে অন্যবিধ সশস্ত্র তৎপরতাগুলো প্রকৃত যুদ্ধ নয়। কিন্তু "শূন্য থেকে" সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার কারণে এই ধরনের অন্যবিধ সশস্ত্র তৎপরতা আমরা করতে বাধ্য। এটা একটা পৃথক পর্যায়, যা যুদ্ধ-পূর্ব একটা সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়, যাকিনা সেই যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র উপায়ে প্রস্তুতিও বটে।

অন্যদিকে ভিন্নমতগুলো মূলত যে ভিত্তির উপর নিজেকে দাঁড় করায় তাহলো "সস-পর্যায়" যে খতম বা অন্যবিধ সশস্ত্র এ্যাকশন করছে তা সংস্কারবাদী, কারণ, তা রাষ্ট্রকে আক্রমণ করছে না, তাই এই 'প্রস্তুতি পর্যায়' গ্রহণ সঠিক নয়, এবং শুরুতেই রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ না করলে তা বিপ্লবী যুদ্ধ বা গণযুদ্ধ হবেনা, এবং তা বিপ্লবী রাজনীতিও হবে না।

উপরোক্তভাবে বিতর্ক কার্যত যুদ্ধ প্রশ্নে মৌলিক মাওবাদী শিক্ষাটিকে আড়ালে নিয়ে গেল, বিপ্লবী রাজনীতি সংক্রান্ত ধারণার অতীত দুর্বলতাকেও অব্যাহত রাখলো, এবং এভাবে বিতর্কের মৌলিক জায়গাগুলোতে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো।

– যুদ্ধ হলো রক্তপাতময় রাজনীতি, আর রাজনীতি হলো রক্তপাতহীন যুদ্ধ। এটা বহুচর্চিত মাওবাদী শিক্ষা। সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রাম– যা কিনা রক্তাক্ত হতে বাধ্য– তা যে মাত্রা ও স্তরেই থাকুক না কেন, সেটা হলো যুদ্ধ। সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রাম যুদ্ধ কি যুদ্ধ নয়– সেটা আদৌ বিতর্কের কোনো প্রকৃত বিষয় ছিল না। তাই, খতমকে যুদ্ধ মনে না করা, বা খতম লাইনকে বিপ্লবী লাইন মনে না করাটাও গুরুতর ভুল ছিল–

যদিও সেরকম সরাসরি বক্তব্য আমাদের আসেনি, কিন্তু খতম লাইন থেকে রাপচারে আমাদের ক্রটি থেকে যাওয়ায় এরকম মনে করবার একটি ভিত্তি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। খতম লাইন থেকে রাপচার করার সঠিক যুগান্তকারী কাজটি করতে গিয়ে আমরা এই মৌলিক জায়গাটিতে গুরুতর ভুল সৃষ্টির একটা জায়গা তৃতীয় কংগ্রেসেই করেছিলাম। তারই প্রকাশ ঘটে উপরোক্ত বিতর্কে– যদিও একেক পক্ষ একেকটি অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ থেকে একে তুলে ধরছিল।

একে আরো গুরুতর শর্ত দেয় 'শূন্য থেকে যুদ্ধ' নীতিকে যান্ত্রিকভাবে দেখার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের 'প্রস্তুতি'-প্রশ্নটি বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনে আদৌ না থাকার বিষয়টি, যা বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে এমন একটি ভুল ও যান্ত্রিক ধারণার সাথে যুক্ত ছিল যে, সশস্ত্র সংগ্রাম হলেই সেটা বিপ্লবী, আর তা না করলে অবিপ্লবী রাজনীতি। যার ফলে 'প্রস্তুতি' মানেই যুদ্ধ-বর্জনের একটা গুরুতর একতরফাবাদী ও যান্ত্রিক লাইনগত চেতনা মাওবাদী আন্দোলনে ও আমাদের পার্টিতে মজ্জাগত ছিল। এই উভয় সংকট থেকে বেরুবার একটা সমন্বয়বাদী ভুল প্রয়াশই ছিল 'সস'-এর 'যুদ্ধ-পূর্ব' একটি 'পর্যায়' লাইন তুলে ধরা।

এই অপ-বিতর্ক পার্টি ও বিপ্লবের নয়া পুনর্গঠনের একটা গোটা সম্ভাবনাকেই ধ্বংস করে দেয়। যদিও সঠিকভাবে তত্ত্ব, নীতি ও সারসংকলনকে উত্থাপন করতে পারাটাই শ্রেয় ছিল, কিন্তু বিদ্যমান সামগ্রিক তত্ত্বগত ও লাইন সম্পর্কিত দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলো না কাটিয়ে আমরা এর থেকে বেরুতে অক্ষম ছিলাম। এজন্য দ্বন্দ্বমান প্রতিটি পক্ষ দায়ী হলেও প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মসমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

* তাহলে সে সময়ে বিতর্কের প্রকৃত মূল বিষয়টা কী ছিল?

আগেই বলা হয়েছে, সশস্ত্র সংগ্রাম যুদ্ধ কি যুদ্ধ নয়– এটা লাইন-বিতর্কের প্রকৃত বিষয় ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রাম যুদ্ধেরই ভিন্ন নাম। আলোচনার মূল বিষয়টা হলো যুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্রটা কী, এবং তার নীতি/পদ্ধতি কী হবে? এবং সেক্ষেত্রে আমাদের অতীতে বিভিন্ন পর্যায়ের লাইন/অনুশীলনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো কী কী। যুদ্ধ মানেই সেটা বিপ্লবী রাজনীতি নয়। যুদ্ধ সংস্কারবাদী রাজনীতিকেও ধারণ করতে পারে। যুদ্ধের নীতিমালার মাঝ দিয়েও তার নিজস্ব রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে আক্রমণই বিপ্লবী, আর খতম সংস্কারবাদী– এমন কোনো সূত্রায়নও সঠিক নয়। যদিও ঠিক এভাবে আমরা বিভক্তিকরণ করিনি, কিন্তু এরকম একটি প্রবণতা আমাদের টুএলএস-এর সমগ্র আলোচনায় সুপ্ত ছিল।

আমাদের প্রকৃত সমস্যাটি ছিল, আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম/যুদ্ধ– যে নামেই তাকে ডাকিনা কেন, সেটি গণযুদ্ধের নীতি ও কৌশল প্রয়োগে কোথায় কোথায় ভুল করেছে, বিশেষত রাজনৈতিকভাবে ও সামরিকভাবে। আমাদের নীতি-পদ্ধতিগুলোর

কোনগুলো কীভাবে গণযুদ্ধের নীতি-পদ্ধতি থেকে সরে গেছে, এবং কী কী উপায়ে তার সৃজনশীল প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে তারই উদ্ঘাটন করা। এবং তার উদ্দেশ্যে বর্তমান রাজনৈতিক-সামরিক-সাংগঠনিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে তার আলোকে সামরিক করণীয় নির্ধারণ করা। বিতর্ককারী পক্ষগুলো বিভিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড সঠিক বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও সামগ্রিক কোনো সঠিক লাইন এ সময় আনতে না পারার কারণে এই টুএলএস-এর কোনো ইতিবাচক মীমাংসা আমরা ৯০-দশকে পাইনি। অথচ তার একটা বিরাট সম্ভাবনা এ সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। সকল পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইনগত, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও এটা হতে পারার যে সম্ভাবনাটি জিয়মান ছিল তা সে সময়কার মত নস্ট হয়ে যায় ভিন্নমতকারীদের পক্ষ থেকে পার্টিকে কার্যত সংশোধনবাদী ও বিপ্লব-বর্জনকারী বলে চিহ্নিত করে স্বেচ্ছায় পার্টি-ত্যাগের মাধ্যমে টুএলএস-টির ইতি টেনে দেবার কারণে।

* এই বিতর্কে সিসি 'সস পর্যায়'-লাইনের প্রবক্তা হয়– যা কিনা পার্টিতে বেশি গৃহীত হয় পার্টিতে তার জন্ম থেকে এ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে জমে থাকা প্রয়োগবাদী/অভিজ্ঞতাবাদী মতাদর্শগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত-পদ্ধতিশাস্ত্রগত ক্রটির কারণে। একইসাথে ভিন্নমতকারী লাইনগুলোও কোনো সঠিক সমাধান দিতে সমভাবে বা আরো অধিক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, তারা ইতিপূর্বকার, বিশেষত ৮০-দশকে, মতাদর্শগত-রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সামরিক অগ্রগতিগুলোকে অপলাপ করার প্রক্রিয়ায় অতীতের ভ্রান্তিগুলোকে গ্রহণ করা শুরু করে *(ক-গ্রুপ)*, বা ভিন্ন ধরনের বিলোপবাদী পথে এগুতে থাকে *(খ/গ-গ্রুপ)*। এভাবে বরং তারা 'সস পর্যায়' লাইনটির জন্য শুধু পথ করে দেয় তা নয়, তারা তৃতীয় কংগ্রেস-লাইনের সঠিকতাগুলো রক্ষার মাধ্যমে তার ক্রটিগুলো শোধরানোর পথ থেকেও দূরে সরে যায়। যা শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা পার্টির বিভক্তি সৃষ্টির পথে তাদেরকে পরিচালিত করে।

* তাই, দেখা যাচ্ছে যে, খতম-লাইনের থেকে রাপচার ঘটানোর এক যুগান্তকারী সাহসী ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ এভাবে গুরুতর কিছু নতুন ভুলের জন্ম দেয়, এবং ব্যর্থ হয় সশস্ত্র সংগ্রামের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সারসংকলন ও তত্ত্বগত বিতর্কের সঠিক মীমাংসার মাধ্যমে এক নতুন সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এদেশে গণযুদ্ধের একটি উচ্চতর লাইন বিনির্মাণে।

– সেই সাথে অতীতের ভুলের জেরগুলোও চলতে থাকে। বিশেষত ঘাঁটি-প্রশ্নে দুর্বলতা অব্যাহত থাকলো। এই এই কারণে একটি/দুটি অঞ্চলে 'ঘাঁটি সম্ভব নয়'-ধরনের অতীত নেতিবাচক প্রবণতা ও ডানবিচ্যুতিকে এটা অব্যাহত রাখে; যদিও তা ইস্যুটিকে কাছিয়ে আনে 'ঘাঁটি হলো লক্ষ্য', আর 'গণক্ষমতা হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু'– এমন কিছু নতুন সূত্রায়ন আনবার মধ্য দিয়ে (অক্টোবর দলিল/'৯৩)। বাস্তবে এই নতুন সূত্রায়ন এসেছিল পেরু-পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত "ঘাঁটি হলো

গণযুদ্ধ'র সারবস্তু"– এই মূল্যবান সঠিক সূত্রায়নটিকে তখনো পর্যন্ত বুঝতে না পেরে ঘাঁটি-প্রশ্নে আমাদের ঐতিহাসিক লাইনগত ডান বিচ্যুতি ও অভিজ্ঞতাবাদী ধারা থেকে প্রশ্নটিকে তুলে ধরবার প্রয়োজন থেকে। এরইসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে 'সমান্তরাল ক্ষমতা' ও 'গেরিলা অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিত'-নামীয় ভারতীয় অভিজ্ঞতার ক্রমান্বয়বাদও আমাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

– একইসাথে অতীত ধারা থেকে 'শুন্য থেকে যুদ্ধ' বা 'প্রথম থেকেই যুদ্ধ'-র নীতি যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়ে 'প্রস্তুতি'-কে সম্পূর্ণ বাতিল করার ত্রুটি অব্যাহত থাকলো। যদিও 'সস পর্যায়'-কে গণযুদ্ধের প্রস্তুতি বলার মধ্য দিয়ে আমরা "প্রস্তুতি"-কে এক ধরনে মেনেও নিলাম, কিন্তু বাস্তবে এ প্রশ্নে অতীত থেকে রাপচার না ঘটিয়ে তা একটি সমন্বয় ঘটালো, কার্যত এ প্রশ্নে একটি সমন্বয়বাদী লাইন হাজির করলো এবং গণযুদ্ধ প্রশ্নে নতুন লাইনগত সমস্যা আমদানি করলো।

* ভিন্নমতকারী মতগুলো সকলেই গণযুদ্ধ-প্রশ্নে এই সংকট থেকে বেরুবার কোনো ইতিবাচক পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়, যদিও এই বিতর্কে সিসি-সহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন আংশিক ইস্যুতে কেউ এক ক্ষেত্রে, কেউ অন্য ক্ষেত্রে সঠিকতা ধারণ করতো। কিন্তু আমাদের পার্টির সমগ্র সামরিক ইতিহাসকে, মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে সারসংকলন করার মধ্য দিয়ে সঠিক কোনো দিশা পার্টিতে অনুপস্থিত ছিল গোটা ৯০-দশক জুড়েই। ভিন্নমতকারীরা বলতে চাইলেন সিসি গণযুদ্ধ বর্জন করেছে, যা মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে সৃষ্ট টুএলএস-এ সংকীর্ণতাবাদী বিভেদবাদী লাইনের অনুসরণে দ্রুত উপদল ও বিভক্তির দিকে পার্টিকে এগিয়ে দেয়।

যদিও এ প্রশ্নের সাথে মালেমা'র উপলব্ধি, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, এসএস-এর মূল্যায়ন, মাওবাদী ঐক্য– ইত্যাদি আরো অনেক মৌলিক প্রশ্নাবলী ক্রমান্বয়ে উঠে আসতে শুরু করেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলা সঠিক হবে না যে, শেষ পর্যন্ত পার্টি-অভ্যন্তরস্থ বিতর্ক সামরিক লাইনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন থেকে সরে যেতে পেরেছিল। যদিও ঐসব প্রশ্নে বিকাশমান মতপার্থক্য ও প্রবণতাগুলো এই বিতর্কে শর্ত সৃষ্টি করছিল অবশ্যই।

* উপরে আলোচিত মতাদর্শগত-রাজনৈতিক-সামরিক লাইনের বিষয়াবলীতে মতপার্থক্য থাকলেও পার্টির ভাঙন যে আশু কারণে ঘটেছিল তাহলো ভিন্নমতকারী কমরেডদের পক্ষ থেকে মাওবাদীদের অভ্যন্তরীণ বিতর্ককে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে একাকার করে ফেলার অতীত একতরফাবাদী সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদবাদী ভুল থেকে বেরোতে না পারা এবং গুরুতর ভুলভাবে পার্টির সিসি-কে সংশোধনবাদী মূল্যায়ন করা। একবার এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলবার পর তাদের পক্ষে বেশিদিন পার্টির অভ্যন্তরে থেকে দুই লাইনের সংগ্রামকে বিকশিত করা সম্ভব ছিল না। ফলে পার্টির বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে তারা দুই

লাইনের সংগ্রামের সুযোগ নেই অভিযোগ তুলে স্বেচ্ছায় পার্টি ত্যাগ করার গুরুতর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিসি'র পক্ষ থেকে দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনায় কোনো ত্রুটি ছিল না বিষয়টা এরকম নয়। তবে তা সত্ত্বেও এদেশের মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই ছিল সেসময় পর্যন্ত দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনায় সবচেয়ে উচ্চ মানের অভিজ্ঞতা। তাসত্ত্বেও এটা আমাদেরকে বিনয়ের সাথে স্বীকার করতে হবে যে, এই লাইন-সংগ্রামে ভিন্নমতকারী কমরেডগণ যখন সিসি-কে কার্যত বিপ্লব বর্জনকারী ও মাওবাদ বর্জনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং কার্যত পার্টি-বিভক্তির দিকে এগিয়ে চলেন, সেসময়ে আমরা রাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে সাংগঠনিক প্রশ্নকে অধিক গুরুত্ব দেই, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত লাইনসহ মৌলিক লাইন-প্রশ্নের চেয়ে মতাদর্শগত সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেই যা সঠিক ছিল না। যা এদেশের আন্দোলনের অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা তখনও অনেকটা ধারণ করছিলাম, এবং এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ রাপচার সাধনের তখনো বাকী ছিল।

* বিভক্তির পর সিসি-বহির্ভূত কেন্দ্রগুলো ক্রমবর্ধিতভাবে পুরনো মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সামরিক ধারার ত্রুটিগুলোকে আঁকড়ে ধরার কারণে, এবং কেউ কেউ নতুন ধারার বিলোপবাদী লাইন সামনে নিয়ে আসার কারণে তারা সঠিক লাইনের থেকে ক্রমান্বয়ে তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে চলতে থাকে। অন্যদিকে সিসি অব্যাহত সারসংকলনের প্রক্রিয়ায় পুনরায় ছোট ছোট উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে একদিকে রাপচার সম্পূর্ণ করার দিকে এগোতে থাকলো, এবং অন্যদিকে একটি সামগ্রিক সারসংকলনের ভিত্তিতে নতুন এক উচ্চতর স্তরের সামরিক লাইনের দিকে অগ্রগতি ঘটাতে থাকে।

– সিসি-বহির্ভূত যে দুটো প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে তার একটি এমপিকে লাইন-বিনির্মাণের নামে বিশেষত গণযুদ্ধকে এগিয়ে নেবার জরুরি প্রয়োজন ও চাহিদা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। এমনকি তারা ক্রমান্বয়ে গণযুদ্ধের বাস্তব প্রস্তুতি হিসেবে বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রাম থেকেও নিজেদেরকে অব্যাহতভাবে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। তারা মুখে নতুন উচ্চতর লাইন বিনির্মাণের কথা বললেও বহু ক্ষেত্রে পুরনো ভুলগুলোকে নতুন করে ফেরি করতে থাকে। তারা মালেমা'র বিমূর্ত শিক্ষার কথা বলে সামরিক প্রশ্ন তো বটেই, রাজনৈতিক, সাংগঠনিকসহ সমগ্র ক্ষেত্রে মূর্ত নির্দিষ্ট দিশা প্রদান থেকে বিরত থাকে। এভাবে দ্রুতই এই অংশটি ও সমমনারা নিজেদের বিলোপের পথে নিয়ে যায়। শুধু সাংগঠনিকভাবেই নয়, লাইনগতভাবেও। পার্টি-বিভক্তির মাত্র চার/পাঁচ বছরের মধ্যে এমপিকে'র বিলুপ্তি বাস্তব সীমাবদ্ধতা জনিত নয়, বরং এর বিলোপবাদী লাইনেরই একটি অনিবার্য ফল মাত্র।

অন্য প্রধান কেন্দ্র এমবিআরএম রাষ্ট্রবাহিনীর উপর আক্রমণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সশস্ত্র তৎপরতার দ্বারা গণযুদ্ধের একটি নতুন ঢেউ সৃষ্টির পথে প্রাথমিকভাবে কিছুটা এগুতে সক্ষম হলেও এদেশে গণযুদ্ধের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার একটি নির্মোহ

সার্বিক সারসংকলনের মধ্য দিয়ে সামরিক লাইনকে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। বরং তারা একটি এ্যাকশনবাদী লাইনকে তুলে ধরে এবং এভাবে নিজেদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক অধঃগতি ঘটায়। মতাদর্শগত-রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে সামরিক প্রশ্নের ঊর্ধ্বে স্থাপন না করার ফলে, পার্টি-গঠন, যুক্তফ্রন্ট কাজ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, লাইন-বিনির্মাণসহ মৌলিক কর্তব্যসমূহে তারা শুধু পিছিয়ে পড়ে তা-ই নয়, বরং তারা তাদের এ্যাকশনবাদী ধারায় একটি সমরবাদী সংগঠনে পরিণত হবার ঝুঁকিতে পতিত হয়। যা একটা পর্যায় পরে সূচিত গণযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ-তো হয়ই, উপরন্তু বহুবিধ নৈতিক অধঃপতনের পথে হাঁটতে শুরু করে। পুরনো দিনের বহুবিধ নেতিবাচক দিককে ধারণ করে তাকে বিপুলভাবে তারা বাড়িয়ে তোলে। এভাবে তারা মাওবাদী আন্দোলনের নববিকাশের পথে নিজেদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করে।

২। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ঃ

আমাদের পার্টিতে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিকে বর্জনের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ শ্রেণি দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে আসা এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের গুরুত্বকে তুলে ধরাটা ৯০-দশকের রাপচার সূচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ।

কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে গুরুতর অসম্পূর্ণতা এ সময় ঘটে। 'আধা-সামন্ততন্ত্র' বদলে 'সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর বিকৃত পুঁজিবাদ' নির্ধারণ ছিল খুবই সরলরৈখিক বিশ্লেষণ ও খুবই অপর্যাপ্ত পর্যালোচনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

– এটা ধরিয়ে দেয়াটা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সামন্তবাদ পূর্বের মত (চীনের ৩০/৪০ দশক, এবং এদেশে ও ভারতে জমিদারী উচ্ছেদের পূর্বকার সময়কাল) এখন এদেশে আর বিরাজ করছে না। সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ অর্থনীতিতে এক বিশাল রূপান্তর ঘটিয়েছে, ভূমি-মালিকানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, এবং পুরনো ভূমি মালিকানাভিত্তিক সামন্ত-জোতদার শ্রেণির জায়গায় শাসকশ্রেণির প্রধান প্রতীভূ রূপে আবির্ভূত হয়েছে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলোকে শুধু আদি ভুমি-মালিকানাভিত্তিক এবং আদি মহাজনী শোষণভিত্তিক মনে করলে ভুল করা হবে, যাকিনা সেসময়ে করা হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র তার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে বহুবিধ নতুন রূপে বিরাজ করছে যার ভাল মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিকে কেন ও কীভাবে সামন্তবাদী বলা হয় *(মাও এটা বলেছিলেন)*, তারও ভাল বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এর সাথে পুঁজিবাদ কাকে বলবো, আর কাকে সামন্তবাদ বলবো এ বিষয়গুলোতে তাত্ত্বিক স্পষ্টতাও প্রয়োজন।

এ সমস্ত বিষয়েই আমাদের গুরুতর ঘাটতি ছিল।

ফলে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পাশাপাশি দেশীয় আন্দোলনেও এই নতুন অবস্থান নিয়ে আমরা তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক খুব একটা জোরালো সংগ্রাম ও পর্যালোচনা গড়ে তুলতে পারিনি।

তবে আমরা একদিকে বিকৃত পুঁজিবাদী মূল্যায়ন বলার পাশাপাশি সামন্ততন্ত্রের সাথে দ্বন্দ্বকে মৌলিক দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করা অব্যাহত রেখেছি। আমরা কৃষকের হাতে ভূমি-বন্টনকে অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হিসেবে অব্যাহত রেখেছি। আমরা কৃষি বিপ্লব ও নয়া গণতন্ত্রকে তুলে ধরেছি। কিন্তু অন্যদিকে বিকৃত বা সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর হলেও পুঁজিবাদী বলেছি। এগুলো একটি সমন্বয়বাদী লাইনকে প্রকাশ করে কিনা তা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

– তবে আমরা যে কারণগুলোতে তখন জোর দিয়েছিলাম সেগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্থাপনও এখানে প্রয়োজন, কারণ, সেগুলো যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ছিল না তা নয়।

আমরা ৯০-দশকে নতুন মতাবস্থানের পক্ষে যে তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলাম সেগুলো হলো– ১) গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ ভূমি-মালিকানা ভিত্তিক আদি সামন্ত-তান্ত্রিক শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, বহু জায়গায় তার বিলুপ্তি, এভাবে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণিসমূহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর; ২) সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকদের সাথে কৃষকের দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে আর অব্যাহত না থাকা; বরং শাসক আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির সাথে শ্রমিক-কৃষকসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়া; এবং ৩) এই পরিবর্তিত অবস্থায় এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকদের কৃষি-জমি দখল করে খোদ কৃষকদের মাঝে বন্টনের কর্মসূচির গুরুত্ব কমে আসা, এবং তা কৃষি বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে আর অব্যাহত না থাকা। বরং আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নিয়ন্ত্রণ থেকে কৃষির বিচ্ছেদ ঘটানো তার কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে পরিণত হওয়া।

উপরোক্ত যুক্তিগুলোকে ও তথ্যগত উপস্থাপনকে অবশ্যই পুনঃপর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা 'আধা-সামন্তবাদী' বলার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

– এটা সত্য যে, 'আধা সামন্ততন্ত্র' মতাবলম্বীগণও তাদের অবস্থানের পক্ষে এখনো পর্যন্ত কোনো জোরালো যুক্তি ও তথ্যের আলোচনা উত্থাপন করতে পারেননি। তাদের যুক্তি ও তথ্যের বিপরীতে আমরাও অনেক জোরালো যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপন করেছি। কিন্তু সেটা এই মৌলিক প্রশ্নে মাওবাদী আন্দোলনের দুর্বলতাকে কাটাতে পারেনি। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এক কথায় এখানে শুধু এটুকু বলা যায় যে, নতুন লাইন গ্রহণ করলেও, এবং তাতে কিছু বিষয়ে সঠিক উপাদান থাকলেও, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের মৌলিক প্রশ্নে দুর্বলতা কাটানো যায়নি, যাকিনা আন্দোলনের বিভক্তি ও দুর্বলতার একটা বড় কারণ বটে।

৩। মালেমা'র উপলব্ধি ঃ

আমাদের মতবাদের তৃতীয় স্তরকে এদেশসহ সারাবিশ্বের মাওবাদী আন্দোলনের ঊষালগ্নে 'মাওচিন্তাধারা' হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছিল। আমাদের দেশেও মাও-চিন্তাধারা বলতে সত্যিকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও মাওবাদীরা মতবাদের তৃতীয় স্তরে বিকাশকেই চিহ্নিত করতো, যার উল্লম্ফন ঘটেছিল জিপিসিআর-কালে।

৮০-দশকের শুরুতে পেরুর পার্টি একে মাওবাদ বলে সূত্রায়িত করে। মাও-এর অবদান যে মার্কস বা লেনিনের চেয়ে কম নয়, এবং মাও-যে তার অবদানসমূহ দ্বারা সমগ্র মতবাদকেই গুণগতভাবে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছেন তাকে সুস্পষ্ট করেছিল 'মাওবাদ' সূত্রায়ন। ৯০-দশকের শুরুতেই রিম-ভুক্ত অন্য অনেক পার্টির মত করে আমাদের পার্টিও মাওবাদ গ্রহণ করে। '৯৩-সালে রিম-এর বর্ধিত সভায় রিম এই সূত্রায়ন গ্রহণ করে। রিম মাওবাদ গ্রহণ করার পর রিম-বহির্ভূত বিশ্বের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মাওপন্থী পার্টিগুলো মাওবাদ গ্রহণ করে– যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফিলিপিন ও ভারতের প্রধান মাওবাদী পার্টিসমূহ। আমাদের দেশে পূবাকপা'ও মাওবাদ গ্রহণ করে।

– মাওবাদ গ্রহণ করলেও এই সূত্রায়ন গ্রহণে রিম-ভুক্ত ও বহির্ভূত সকল পার্টির উপলব্ধি ও অবদান একই রকম ছিল না। এখনো পর্যন্ত যে পার্থক্যগুলো কম/বেশি বিরাজমান। 'মাওচিন্তাধারা' থেকে 'মাওবাদ' গ্রহণ নিছক নামকরণের পার্থক্য– এ ধরনের একটি ভুল প্রবণতা আমাদের পার্টিতেও ছিল। রিম-ভুক্ত একটি শক্তিশালী ভুল প্রবণতা– মাওবাদ-ই প্রথম মতবাদের তৃতীয় স্তরকে সূত্রায়িত করে, অথবা মাও-চিন্তাধারা ও মাওবাদ– আমাদের মতবাদ বিকাশে দুটো গুণগতভাবে ভিন্ন স্তর– এর ন্যায্য বিরোধিতা আমাদের ভুলকে শর্তায়িত করে।

মাওবাদ সূত্রায়ন গ্রহণকে নিছক নামকরণের পার্থক্য হিসেবে গ্রহণ করলে ভুল হবে। যদিও মাওচিন্তাধারা মতবাদের তৃতীয় স্তরে বিকাশকেই চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে বহুবিধ অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা তখনো ছিল। যেমন, মাওবাদের প্রধান স্তম্ভ জিপিসিআর-কে বাদ দিয়ে শুধু নয়া গণতন্ত্র, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ অথবা দার্শনিক মতবাদিক প্রশ্নে বিশেষত বিপ্লব-পূর্ব মাও-এর অবদানগুলোকে গণ্য করার একটা শক্তিশালী ভুল প্রবণতা বা ধারা সারা বিশ্বজুড়েই তখন বিরাজমান ছিল। এটা জিপিসিআর-কে কাগুজেভাবে স্বীকৃতি দিলেও তার সারমর্মকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি মাওচিন্তাধারাকে নিছক চীনের প্রেক্ষিতে মাও-এর অবদান বলে তার বিশ্বজনীন তাৎপর্যকে অস্বীকার করার প্রকাশও ছিল। মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে আমাদের দেশেও এ ধরনের বহু সমস্যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

এমনকি যারা যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে জিপিসিআর-কে গ্রহণ করেছিল এবং তাকে গভীরতরভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন অনুভব করেছিল, তাদের মাঝেও দুর্বলতা ছিল। যা স্বাভাবিকই ছিল। কারণ, জিপিসিআর তখনো মাত্র তার সূচনা পর্বে ছিল। বাস্তবে

আমাদের দেশে বা ভারতে প্রথম পর্বের মাওবাদী বিপ্লবী উত্থান সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত হবার পরও জিপিসিআর চলমান ছিল। তাই, আমরা দেখি যে, কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে ভারতের মাওবাদী উত্থানে জিপিসিআর-এর দ্বিতীয় লড়াইটি, অর্থাৎ, লিনবিরোধী সংগ্রামটির কোনো উল্লেখ ছিল না। বরং লিনপন্থার বিভিন্ন রূপী প্রভাব তাতে লক্ষ করা যায়। আর সারাবিশ্বেই জিপিসিআর-এর শেষ যে লড়াই, মহাগুরুত্বপূর্ণ তেং-বিরোধী সংগ্রামের শিক্ষাগুলো গৃহীত ও আত্মস্থ তখনো হয়নি।

তাই মাওচিন্তাধারার উপলব্ধির মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য দেখা গিয়েছিল, যা প্রকট হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে। মাওবাদ-সূত্রায়ন মাও-মৃত্যু পর্যন্ত তার নেতৃত্বে মতবাদের সামগ্রিক বিকাশকে সামগ্রিকভাবে ও অখণ্ডভাবে প্রকাশ করে, যাকিনা মাওচিন্তাধারা সূত্রায়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় না। তাই, মাওবাদ সূত্রায়ন শুধুমাত্র নামকরণের পার্থক্য ছিল না, এর বিষয়বস্তুগত এবং উপলব্ধিগত পার্থক্যকেও প্রকাশ করতো। ষাট-দশকের শেষার্ধের মাওচিন্তাধারার সাথে মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালের মাওবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যই রয়েছে, যার স্বীকৃতি না দিলে মতবাদিক উপলব্ধি ষাট-দশকেই পড়ে থাকবে, এবং তাতে মাওবাদ হতে গুরুতর পশ্চদপদতা থেকে যাবে।

আমরা মাওবাদ সূত্রায়ন যখন প্রথমে গ্রহণ করি, তখন সূত্রায়নের এই পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে আমাদের অস্পষ্টতা ছিল।

যদিও এ সময়ের বেশ পূর্বেই, ৮০-দশকের একেবারে শুরুতেই আমাদের পার্টি জিপিসিআর-সম্পর্কিত আমাদের ইতিপূর্বকার অসম্পূর্ণ ও দুর্বল জানাজানি অনেকটা কাটিয়ে তুলেছিল, জিপিসিআর-কালে মাও-এর শেষ সংগ্রাম, তথা তেংবিরোধী সংগ্রামের যে টুএলএস তাকে মৌলিকভাবে আয়ত্ত করেছিল, এবং চীনা পার্টির অধপঃতন ও হোক্সাপন্থী নয়া সংশোধনবাদকে এদেশেও সৃজনশীলভাবে সংগ্রাম করেছিল। এরই প্রক্রিয়ায় আমাদের পার্টি রিম-এ যোগ দিয়েছিল, রিম-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, মাওবাদ নিছক সূত্রায়নের বদল ছিল না, ৬০/৭০-দশকে মাওচিন্তাধারা দ্বারা যে উপলব্ধি প্রকাশ পেত তার চেয়ে উচ্চতর উপলব্ধিকে এটা প্রকাশ করে– এভাবে আমরা না বোঝার কারণে পূর্বোক্ত রিম-ভুক্ত যে শক্তিশালী ভুল প্রবণতা, তাকে সঠিকভাবে আমরা সংগ্রাম ও পুনর্গঠন করতে অগ্রসর ভূমিকা রাখতেও পারিনি।

** মধ্য-৯০ দশক থেকে পার্টির মধ্যে যে টুএলএস-এর উদ্ভব ঘটে, তার সূত্র ধরে রিম-কমিটির মাধ্যমে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সাথে আমাদের লাইন পর্যালোচনা-বিতর্ক-সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এই বিতর্ক ও পর্যালোচনা ভিন্নমতকারীদের দ্বারা পার্টি থেকে বেরিয়ে যাবার কারণে যথেষ্ট ভালভাবে এগিয়ে না গেলেও ক্রমান্বয়ে এই সংগ্রামকে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে নেই। এ প্রক্রিয়ায়, এবং পাশাপাশি বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতাগুলোর সারসংকলনের প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও বিচ্যুতিগুলোকে কাটিয়ে তুলি এবং এ শতাব্দীর শুরুতে এসে পরিপূর্ণ রাপচারে

প্রবেশ করি, যা কিনা ধাপে ধাপে আমাদের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক লাইনগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন ও উচ্চতর এক ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। যার আলোকে আমরা এদেশের বিগত সময়ের মাওবাদী আন্দোলনের একটি সমগ্র গোটা স্তরকে নতুন আলোকে মূল্যায়ন ও সারসংকলন করার কাজে হাত দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিশ্ব মাওবাদী/কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আজকে আমাদের দেশীয় ক্ষেত্রে আন্দোলনের যা পরিস্থিতি– তার লাইনগত উপলব্ধি ও সংগঠন-সংগ্রামের বাস্তবতা, সেটা বিশ্ব আন্দোলনের বাস্তবতা দ্বারা বিপুলভাবে শর্তায়িত, তারই বরং অংশ, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা আদৌ সঠিক নয়। তাই, মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিগত সিকি-শতাব্দীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে আমরা করবো। সে আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা আজকের আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পারবো এবং আমাদের করণীয়গুলো নির্ধারণ করতে পারবো।

আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যাবলী

মতবাদিক লাইনের সাথে মতাদর্শগত বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু মতবাদিক লাইনের আলোচনায় আসে না এমন মতাদর্শিক কিছু বিচ্যুতি/ধারা/প্রবণতাকে আমাদের আলোচনা করতে হবে পৃথকভাবে। আন্দোলনের এই মতাদর্শিক পুনর্গঠন ছাড়া মতবাদিক লাইনকে আত্মস্থ করাও কঠিন, যদিও একে অন্যের পরিপূরক। হতে পারে এইসব মতাদর্শগত সমস্যা শুধু আমাদের দেশেরই সমস্যা নয়, স্ট্যালিন-পরবর্তী একটি গোটা পর্যায়ের বিশ্বব্যাপী সাধারণ সমস্যার অন্তত কিছু বিষয়ের সাথে এগুলো জড়িত। সুতরাং মতাদর্শগত এইসব প্রবণতার আলোচনা বিশ্ব-আন্দোলনের আলোচনাতেও কোনো না কোনো জায়গায় কোনো না কোনো মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মাওবাদী আন্দোলনের সবগুলো ধারার মতাদর্শগত প্রবণতা একইরকম ছিল না। তবে সমগ্রভাবে কিছু সাধারণ সমস্যা/দুর্বলতা/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় যার কোনোটা কোনো পর্বে কোনো ধারায় শক্তিশালী ছিল, আর অন্য কোনোটি হয়তো ভিন্ন পর্বে ভিন্ন ধারায় জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজকের এক নতুন যুগসন্ধিক্ষণে নতুনতর সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে বটে। কিন্তু বিগত সুদীর্ঘ যুগব্যাপী সমস্যাগুলোকে ভালভাবে চিহ্নিত না করলে আমরা বর্তমানের নতুনতর সমস্যাগুলোকেও ধরতে পারবো না।

সমস্যাগুলো নিম্নরূপ–

১। প্রয়োগবাদ ঃ

সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন জুড়ে, বিশেষত তার বিপ্লবী ধারায় প্রয়োগবাদ একটি গুরুতর মৌলিক সমস্যা আকারে বিরাজমান ছিল। মাও-এর 'অনুশীলন সম্পর্কে' তত্ত্বকে খুবই যান্ত্রিকভাবে ও একপেশেভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এর বিভিন্নমুখী প্রকাশ ও রূপ আমরা দেখতে পাই– যার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক) এ্যাকশনবাদ–

প্রয়োগবাদের একটা বিশেষ রূপ হিসেবে সশস্ত্র আন্দোলনে এ্যাকশনবাদ গড়ে ওঠে। এ্যাকশনই সব, লাইন বা মতাদর্শ-রাজনীতি তেমন একটা বড় বিষয় নয়, অথবা সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তত্ত্বের কচকচি– এ ধরনের চেতনা গুরুতররূপে বিকশিত হয় গণযুদ্ধের পরিমণ্ডলে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি বিপ্লবী মাওবাদী

আন্দোলনের সবগুলো ধারার মাঝেই। পরবর্তীকালে পূবাকপা ও এমবিআরএম-এর মাঝে এ সমস্যা গুরুতররূপে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি।

খ) সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ–

প্রয়োগবাদ অবধারিতভাবে সংকীর্ণ অভিজ্ঞাতাবাদে নিজেকে প্রকাশ করে। সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাই যে সত্য নয়, সত্যে উপনীত হবার জন্য যে অনুশীলন ও তত্ত্বের, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার অনেকগুলো আবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়– তা ব্যাপকভাবে বাতিল হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার সারসংকলনকে তত্ত্ব ও নীতির সাথে সংযুক্ত না করা সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, যা মাওবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে দেখা গেছে।

গ) তত্ত্বের গুরুত্বহীনতা–

মাওবাদী আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে অবনমিত হয়ে যায়। অথবা তাকে মূলতই মাও-অধ্যয়নে সীমিত করে ফেলা হয়, যদিও এ সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাও-অধ্যয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। এমনকি আমাদের পার্টিতে গোড়ামীবাদ বিরোধী সংগ্রামের নামে এক পর্যায়ে পার্টি-সাহিত্যের বাইরে মালেমা'র বিজ্ঞান অধ্যয়ন, আত্মস্থ করা ও আলোচনার গুরুত্ব গুরুতরভাবে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। তত্ত্ব ও অনুশীলনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, কখনো কখনো তত্ত্ব/লাইনের প্রাধান্য– ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রায় ভুলে যাওয়া হয়।

২। ব্যক্তিতাবাদ ঃ

ক) লিন-পন্থার প্রভাব–

ব্যক্তিতাবাদ হলো বুর্জোয়া/ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিবৈশিষ্ট্য যা শ্রেণি, লাইন, পার্টি ও জনগণের চেয়ে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

এর একটি বিশেষ প্রকাশ ছিল লিনপন্থার মাঝে। জনগণ নয়, ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এই হলো লিনপন্থার সূচনা বিন্দু। পরবর্তীকালে পেরু-পার্টিতে উদ্ভূত 'জেফেতুরা' তত্ত্বও এরই একটা বড় বহিঃপ্রকাশ ছিল।

ইতিহাসে ও বিপ্লবে ব্যক্তির অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যাকে তুলে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তি তার লাইনগত/রাজনৈতিক ভূমিকা দ্বারাই নেতৃত্বের মর্যাদা পান। তাই, 'মহান নেতৃত্ব' বা 'কর্তৃত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব'– এ জাতীয় শব্দমালার মধ্য দিয়ে লাইনের উর্ধ্বে তাকে স্থাপন, পার্টির উর্ধ্বে তাকে স্থাপন বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার বাইরে স্থাপন– এসবই লিনপন্থার বিভিন্নমূখী প্রকাশ, যা জিপিসিআর-এর প্রথম পর্বে মাওবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

'চিন্তাধারা' বা 'শিক্ষা'– এ জাতীয় সূত্রের মাধ্যমে তাকে মতবাদের স্তরে নিয়ে এসে নেতৃত্বের অবদানকে মতবাদের উর্ধ্বে নিয়ে আসা এই ধরনের ব্যক্তিতাবাদকেই

প্রকাশ করে। আমাদের দেশে আমরা এর গুরুতর প্রভাব দেখি এসএস-আমলে আমাদের পার্টিতে, পূবাকপা ধারার মধ্যে এবং পরবর্তীকালে এসএস-চিন্তাধারার তত্ত্ব তুলে ধরার মধ্য দিয়ে।

খ) মতাদর্শগত সংগ্রামের নামে ব্যক্তিগত শুদ্ধিকরণ সংগ্রাম পরিচালনা ভাল কমিউনিস্ট হবার লিউ শাওচী-পন্থার প্রভাব–

ব্যক্তিতাবাদী এই সমস্যা আমাদের পার্টিতে ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল ও রয়েছে। মতাদর্শগত সংগ্রাম, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা পার্টির ও কমরেডদের অসর্বহারা চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি কাটিয়ে তোলার জন্য পার্টির মধ্যে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। কিন্তু এর নামে প্রায়শই পার্টি-অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি সংগ্রাম সামনে চলে আসে। এটা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক প্রশ্নকে দুর্বল করে দিয়ে ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে আসে। উপরন্তু ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণের মধ্য দিয়ে এটা কমরেডদের মধ্যকার ঐক্যকে বিনস্ট করে, নবীন কমরেডদের হীনমন্য করে ফেলে। এটা প্রকারান্তরে ব্যক্তিশুদ্ধিকরণের লিউশাওচী-পন্থী মতাদর্শকে পার্টিতে নিয়ে আসে।

৩। অভ্যন্তরীন ও দুই লাইনের সংগ্রামকে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে কেন্দ্রীভূত না করা ঃ

পার্টিকে দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে হয়। কারণ, পার্টি অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মতের উদ্ভব ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, যা হলো একটি বস্তুগত বাস্তবতা। একইসাথে, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভিন্নরূপী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এ সমস্ত সংগ্রাম প্রায়শই লাইন তথা রাজনৈতিক প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হয়নি। মতাদর্শ ও রাজনীতির মাঝে মতাদর্শ হলো প্রথম– এই সূত্র দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালিত হয়ে মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রায়ই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়, রাজনীতিক প্রশ্ন পিছিয়ে পড়ে, এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রায়ই লাইনগতভাবে না হয়ে মতাদর্শগত শুদ্ধির ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যক্তিতাবাদী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়।

বিপ্লবে ভাল মানুষ, ত্যাগী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, সাহসী মানুষ ও দক্ষ মানুষ অবশ্যই দরকার। কিন্তু সর্বোপরি দরকার বিপ্লবী রাজনীতিতে সজ্জিত মানুষ। এবং এটা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল– কিন্তু পরেরটা হলো প্রধান। পার্টি হলো প্রথমত রাজনৈতিক সংগঠন। সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐকমত্য হলো পার্টি-ঐক্যের ভিত্তি। যাকে আরো সঠিকভাবে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন বলা যেতে পারে।

এ প্রশ্নে স্পষ্টতার অভাব ও অনুশীলনগত ত্রুটি আমরা দেখতে পাই লাইনকে, তথা মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনকে প্রাধান্য না দিয়ে টেকনিক্যাল প্রশ্নে গুরুত্বদান/অতি জোর প্রদানের মধ্যে। এটা আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনে পার্টি-অভ্যন্তরের সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। টেকনিক্যাল

বিষয়ের মতপার্থক্যসহ সব কিছুকেই লাইনগত সংগ্রাম বলে কার্যত প্রকৃত লাইনের প্রশ্নকে ঝাপসা করে দেয়া হয়েছে।

৪। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের নামে নীতি থেকে বিচ্যুতি, এবং নীতির নামে সৃজনশীলতা প্রয়োগে ব্যর্থতা ও গোড়ামীবাদ ঃ

এ উভয় সমস্যাই মাওবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আমাদের পার্টির ইতিহাসে প্রথম ধরনের বিচ্যুতির প্রাধান্য ছিল। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ছাড়া মার্কসবাদ হয়না। এটা হলো মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এর নাম করেই নীতি থেকে বিচ্যুতিও ঘটে থাকে। আমাদের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আসবার ক্ষেত্রে, ঘাঁটি-প্রশ্ন থেকে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালের 'সস পর্যায়' লাইনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতিগুলো এই সমস্যা থেকেই ঘটেছিল।

অন্যদিকে নীতির নামে বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণকে বাদ দেয়ার মধ্য দিয়ে গোড়ামীবাদী বিচ্যুতিরও বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

৫। জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি, এবং বিদেশী পার্টি/লাইনের অসৃজনশীল লেজুরবৃত্তি ঃ

মাওবাদী আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল একটা আন্তর্জাতিক-বিহীন অবস্থায়। মাও-এর জীবিতকালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিলুপ্তকরণের সারসংকলন হয়নি এবং নতুন কোনো আন্তর্জাতিক গঠনের উদ্যোগও নেয়া হয়নি। যদিও মাও-নেতৃত্বাধীন চীনা পার্টি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইন বিনির্মাণে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সারসংকলনে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকা রেখেছিল, কিন্তু 'আন্তর্জাতিক' গড়ে না ওঠা আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শগত ধারায় একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত করে দেবার পর থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির একটা বিশেষ রূপ গড়ে ওঠে। যে যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত করা হয়েছিল, সে সব সমস্যার বাস্তবতা থাকলেও এই সিদ্ধান্ত কিছু ভুল প্রবণতা ও বিচ্যুতিকে গড়ে তোলে। প্রতিটি দেশের পার্টি স্বাধীন, পার্টিগুলোর সম্পর্ক ভ্রাতৃপ্রতিম, সমান সমান, গুরুশিষ্যের নয়; একটি একক কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দেশের বাস্তবতা বোঝা ও বিপ্লবের গাইড করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন পার্টি একে অন্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় শুধু করবে, কেউ কাউকে মূল্যায়ন করাটা নর্মবিরোধী; প্রতিটি দেশের লাইন নির্মাণের দায়িত্ব সেদেশের সর্বহারা শ্রেণির, 'বাইরে' থেকে কিছু বলাটা সঠিক নয়– ইত্যাকার ভুল চেতনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো থেকে এসমস্ত চেতনা গড়ে উঠবার শর্ত

পেলেও সারবস্তুতে এসব চেতনা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে দুর্বল করে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকের গঠন ও পরিচালনার নীতি/পদ্ধতিকে গুণগতভাবে উন্নত করার সঠিক পথের বদলে তাকে বিলুপ্ত করে দেবার ভুল পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির একটি নতুন রূপের উদ্ভব ঘটে। এটা সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী চরিত্র ও দায়িত্ব, এবং সে কারণে একটি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইন গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে তার ভিত্তিতে ঐক্য ও সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অনেক দুর্বল করে দেয়।

– কিন্তু এরই পাশাপাশি নিজ পার্টির লাইনকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য বিদেশী পার্টি বা কমরেডদের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা, বা সেসবের অসৃজনশীল লেজুড়বৃত্তি করা– এসব বিচ্যুতিপূর্ণ চেতনাও আন্দোলনে ব্যাপক শক্তিশালী ছিল।

এই উভয় ধরনের মতাদর্শগত বিচ্যুতিকে সংগ্রাম না করে কোনো সঠিক আন্তর্জাতিকতাবাদী পার্টি গড়ে তোলা যাবে না।

৬। সামগ্রিকতা ও অংশ, সাধারণ ও বিশেষ, রণনীতি ও রণকৌশল, বিপ্লবী সংগ্রাম ও আংশিক সংগ্রাম, গোপন কাজ ও প্রকাশ্য কাজ, সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণসংগ্রাম, গ্রামের কাজ ও শহরের কাজ, কেন্দ্রীভূত কাজ ও ছড়ানো কাজ, মূল শ্রেণির কাজ ও অন্য শ্রেণির কাজ, পার্টির কাজ ও ফ্রন্টের কাজ, আদর্শগত কাজ ও রাজনৈতিক কাজ, তাত্ত্বিক কাজ ও বাস্তব অনুশীলনগত কাজ– এই দ্বন্দ্বসমূহের মীমাংসার ক্ষেত্রে একতরফাবাদ। দ্বন্দ্ববাদের উপলব্ধি ও প্রয়োগের সমস্যা ঃ

প্রায় ক্ষেত্রেই মাওবাদী আন্দোলনে প্রধান প্রবণতা ছিল উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসায় একতরফাবাদের আশ্রয় নেয়া।

মাও দ্বন্দ্ববাদ বিকাশে মৌলিক অবদান রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলন দ্বন্দ্ববাদ অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করেছে সবচেয়ে কম করে।

এর কারণে মাওবাদী আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল বিনির্মাণে গুরুতর ধরণের একতরফাবাদী বিচ্যুতি কাজ করেছে।

৭। দ্বন্দ্ববাদের স্থলে সমন্বয়বাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলন তার প্রথম পর্বে মতাদর্শগতভাবে যে যান্ত্রিক একতরফাবাদের ভিত্তি গেড়েছিল তাকে পরবর্তীকালে আমাদের পার্টিতে কাটিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়, এবং দ্বন্দ্ববাদ উপলব্ধি ও প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে।

কিন্তু এটা করতে গিয়ে পার্টিতে সমন্বয়বাদের একটা প্রভাব বেড়ে ওঠে। মতাদর্শগতভাবে সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখা গেলেও তার প্রধান প্রভাব পড়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নতুন কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি ও লাইন গ্রহণের মধ্যে। 'সস পর্যায়'–লাইন এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

সমন্বয়বাদ নিজেকে বস্তুর সকল দিক দেখতে পারার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলেও তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুর মূল চরিত্রটিকে উপস্থাপন করতে না পারা। তাই, কোনটা দ্বন্দ্ববাদ, আর কোনটা সমন্বয়বাদ– সে বিচারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি জোর দেয়া প্রয়োজন কোনটা যান্ত্রিক একতরফাবাদ, আর কোনটা বিপ্লবী মাওবাদ– সে বিচারেও।

৮। প্রধান দ্বন্দ্ব ও মূল দ্বন্দ্বের প্রশ্নে দার্শনিক দুর্বলতা ঃ

মাওবাদী আন্দোলন মাও-এর প্রধান দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল, যা ইতিবাচক ছিল। এক্ষেত্রে প্রথম পর্বে কমরেড এসএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু মূল দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিকে একই মাত্রায় দুর্বল করে ফেলা হয়।

মূল দ্বন্দ্বের সমাধান ব্যতীত সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয় না। তাই, প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির জন্য মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মূল দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্বের সম্পর্ক বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব, মৌলিক দ্বন্দ্ব, তীব্রতম দ্বন্দ্ব– এইসব শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব মাওবাদী আন্দোলনে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিভক্তির জন্ম দিয়েছিল।

এই বিষয়গুলোতে দার্শনিকভাবে স্পষ্টতা প্রয়োজন, যা এখনো ভালভাবে মীমাংসা হয়নি।

৯। মার্কসবাদী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা ঃ

মাওবাদী আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে রাজনীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু একইসাথে সমাজের ভিত্তি হিসেবে তার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা দ্বারা চালিত হয়েছে। মার্কসবাদী অর্থশাস্ত্র বিষয়ে গুরুত্বহীনতা আন্দোলনে জেঁকে বসে।

সুদীর্ঘদিন এই ধারা অনুসরণের কারণে মার্কসবাদী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিশাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্দোলনে দুর্বলতা গড়ে ওঠে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াবলিতে আত্মগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কুঅভ্যাস ও বিচ্যুতি গড়ে ওঠে।

মাওবাদী আন্দোলন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর উপর গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

১০। যুক্তিবাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলনে উপরোক্ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতার হাত ধরে বিকশিত হয় যুক্তিবাদ। যুক্তি সত্যে উপনীত হবার একটি উপায় বটে, কিন্তু যুক্তিবাদ যুক্তি-তর্কের উপসংহারকেই সত্য মনে করে। কিন্তু সত্য হলো বস্তুগত বাস্তবতা, যা বহু সময় আপাতভাবে যুক্তিহীন মনে হতে পারে।

বিশেষত দুই লাইনের সংগ্রাম ও বিতর্কের ক্ষেত্রে আন্দোলনে, বিশেষত আমাদের পার্টিতে ব্যাপকভাবে যুক্তিবাদের চর্চা হয়েছে। এ সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। এবং তার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

১১। ক্রমান্বয়বাদ ঃ

মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিশ্ব রাজনৈতিক উত্তাল সময়টা পার হবার পর বিশ্ব ও দেশীয় আন্দোলন এক সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়, এবং একটা দীর্ঘ লয়ে তার পুনরুদ্ধারের দুরুহ কাজ এদেশের মাওবাদী আন্দোলন হাতে নেয়। সে সময়ে মতাদর্শগতভাবে আন্দোলনে ব্যাপকভাবে ক্রমান্বয়বাদী বিচ্যুতি গড়ে ওঠে। এর পেছনে বিচ্যুতিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিও কাজ করেছে।

মার্কসবাদী দর্শন দ্বন্দ্ববাদে বিকাশের একটি নিয়ম হিসেবে পরিমাণগত বিকাশের প্রক্রিয়ায় গুণগত বিকাশকে তুলে ধরা হতো। দার্শনিক এই প্রতিপাদ্যের একটা তত্ত্বগত প্রভাব ছিল মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়বাদ বিকাশের ক্ষেত্রে।

যদিও মাও পরে দেখিয়েছিলেন যে, এ নিয়ম (পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন) প্রকৃতি ও সমাজে দেখা যায় বটে, তবে এটি বিকাশের ক্ষেত্রে বিপরীতের একত্বের মূল নিয়মেরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু দর্শনে মাও-এর এই বিকাশকে তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও মাওবাদী আন্দোলনে ইতিপূর্বকার পরিমাণগত-গুণগত নিয়মের একটা বড় প্রভাব বজায় ছিল। এরই প্রকাশ ঘটে ক্রমান্বয়বাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে।

ক্রমান্বয়বাদ হলো বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধীর লয়ে পরিমাণগত বিকাশের এক পর্যায়ে তারই ফলশ্রুতিতে আপনা আপনি গুণগত বিকাশ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। এটা সত্য যে, পরিমাণগত পরিবর্তন ব্যতীত গুণগত পরিবর্তন আসে না। কিন্তু বিকাশের গুণগত প্রশ্নটি হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে পরিমাণগত পরিবর্তনও আসলে ছোট ছোট উল্লম্ফন ও গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে।

বিশেষত সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী গুণগত পরিবর্তন সচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা আরোপ করতে হয়। এটা পূর্বতন প্রক্রিয়ার সাথে সচেতন বিচ্ছেদ ও পরিকল্পিত উল্লম্ফনমূলক কাজ ছাড়া ঘটে না। বিশেষত যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যখন আমাদের বিকাশকে আটকে দেবার জন্য বিপরীত একটা শক্তিশালী শত্রু সক্রিয়, তখন এই রাপচার বা

সচেতন ও পরিকল্পিত উল্লম্ফন ব্যতীত গুণগত রূপান্তর ঘটে না। ফলে বিপ্লব আটকে যায়। অথবা তার সঠিক ও দ্রুত বিকাশলাভ ঘটে না।

ক্রমান্বয়বাদ দার্শনিকক্ষেত্রে উল্লম্ফন ও রাপচারকে দুর্বল করে দেয়– যদিবা তাকে বাতিল না করে। রাজনৈতিকভাবে এটা সংস্কারবাদী বিচ্যুতি নিয়ে আসে।

১২। নারী-প্রশ্ন ঃ

নারী-প্রশ্নে সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনে গুরুতর দুর্বলতা, সমস্যা ও বিচ্যুতি বিরাজমান ছিল। যদিও ৮০-দশকে আমাদের পার্টি এক্ষেত্রে মৌলিক অগ্রগতি ঘটায়– যা ধারাবাহিকভাবে বিকাশমান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মাওবাদী আন্দোলন এক্ষেত্রে গুণগতভাবে পশ্চাদপদতার পরিচয়ই দিয়েছে।

নারীদের মধ্যে কাজ করা অথবা নারী কেডার বা যোদ্ধা গড়ে তোলা, আর নারী-প্রশ্ন সমার্থক নয়। যদিও প্রথমোক্ত কাজগুলো অবশ্যই নারী-প্রশ্নে অগ্রগতির জন্য গুরুত্ব ধরে। প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন কম/বেশি পরিমাণে এ কাজ করেছিল বটে, কিন্তু নারী-প্রশ্নে তার চেয়ে বেশি কোনো অগ্রগতি দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগে আন্দোলনে তখন ঘটেনি। ফলে নারীর অংশগ্রহণও আন্দোলনের ব্যাপ্তির তুলনায় ছিল অনেক পেছনে।

নারীমুক্তি বিপ্লবের অধীন অবশ্যই, কিন্তু তার বিশেষ ক্ষেত্র ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যার অন্যতম মৌলিক বিষয় হলো যৌন প্রশ্ন, পরিবার প্রশ্ন, নৈতিকতার প্রশ্ন– যাকে অবশ্যই সামাজিক মূল্যবোধ থেকে বিপ্লবী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নবতরভাবে তার নির্মাণ, পুনর্গঠন ও শিক্ষার এক নিরন্তর কাজ চালানো প্রয়োজন– পার্টির ভেতরে তো বটেই, পার্টির বাইরেও জনগণের মাঝে, যেখানে যেভাবে তা প্রযোজ্য সেভাবে।

কিন্তু এভাবে সমস্যাটিকে উপলব্ধি করা ও আঁকড়ে ধরা হয়নি। বরং বহু সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনে বিরাজমান ছিল। আমাদের পার্টির প্রথম পর্বে 'ভ্রষ্টতা' বিরোধী যে চেতনাকে বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছিল তা সামাজিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। এছাড়া প্রেম-বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও পার্টি-বিপ্লবের স্বার্থ– এদুয়ের দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা করতেও পার্টি ব্যর্থ হয়েছে। এসবের জন্য বহু খেসারত পার্টিকে দিতে হয়েছে, বহু ভুল মূল্যায়ন ও ভুল শাস্তিদানের পদক্ষেপ পার্টি গ্রহণ করেছে, পার্টিতে ফজলু চক্র উদ্ভবের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে পার্টির ভুল নীতি বড় শর্ত হিসেবে কাজ করেছে, এমনকি '৭৫-সালে বিপ্লবী আন্দোলনের চরম এক সংকটকালে গুটিকয় শীর্ষ নেতৃত্বের একজনকে *(অসস-সদস্য ক.রফিক)* মৃত্যুদণ্ডদানের ভয়ংকর ভুলের মাঝেও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিল।

মাওবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় কম/বেশি করে নারীদেরকে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য একটা বড় শক্তি হিসেবে না দেখে একটা বড় সমস্যা হিসেবে

দেখার কু-ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। প্রেম-বিয়েকে অনেক সময়ই ঝামেলা মনে করা হয়েছে। অনিবার্য সন্তানাদি ও পারিবারিক সমস্যাকে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলত নারী কেডার সেভাবে গড়ে ওঠেনি, যারা এসেছেন তারা অনেকে বাস্তবেই সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় ধরনের পুরুষ কমরেডদেরকেও সংশ্লিষ্ট দুই ধরনের কারণে আন্দোলন হারিয়েছে।

অবশ্য পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নারী-মুক্তির প্রশ্নে জোরালো অবস্থানের কারণে আমাদের পার্টিতে বর্তমানে পুরুষতান্ত্রিকতা ভিন্নরূপেও প্রকাশিত হয়, যা সমাজের বুর্জোয়া রূপান্তর থেকে এসেছে। শাশ্বত প্রেমের চেতনা, সবকিছুর উর্ধ্বে প্রেম, যৌন ও সন্তান প্রশ্নে বুর্জোয়া অধিকার, যত্নশীলতার নামে পার্টি-বিপ্লবের স্বার্থের উর্ধে স্ত্রী-স্বার্থের সেবা করা– ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনে নারীর পক্ষাবলম্বনের নামে অবিপ্লবী চেতনা সমাজে বিপুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যাকিনা আমাদের পার্টিতেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নারী-মুক্তির প্রশ্নে এ জাতীয় বিচ্যুতি এবং স্বার্থবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকেও পার্টিতে ভালভাবে সংগ্রাম করতে হবে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

১৩। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন ঃ

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে এক ধরনের সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদবাদী বিচ্ছিন্নতায় ভুগেছে মাওবাদী আন্দোলন। এটা মতাদর্শগতভাবে ডানবিচ্যুতির ক্ষেত্রে আরো শর্ত দেয়।

চিন্তার জগত এবং সৃজনশীল কর্মের এই ক্ষেত্রগুলোতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় এই ক্ষেত্রগুলো নিরংকুশভাবে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তদের দখলে। প্রগতিশীল অংশের মাঝেও ব্যাপকভাবে এই বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত চেতনার প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার উন্মোচন ছাড়াও বিশেষত জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং সংস্কারবাদের ব্যাপক প্রভাবকে সংগ্রাম করা একটি দীর্ঘস্থায়ী কাজ। অন্যদিকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করার প্রশ্নটিতেও দীর্ঘস্থায়ী কাজ প্রয়োজন। অবশ্যই আমরা বিপ্লবী শিল্প সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানী সৃষ্টির উপর জোর দেব। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে তারা থাকবেন সংখ্যালঘু। তাই, প্রগতিশীল কর্মের ও কর্মীদের সাথে ধৈর্যশীল সংগ্রাম ও দীর্ঘস্থায়ী পুনর্গঠনের উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিপ্লবী কাজের অনুমোদন এবং অন্য সবকিছুর স্থূল নিষিদ্ধকরণ দ্বারা আমরা কোনো উন্নত চিন্তাশীল সমাজ ও সৃজনশীল মানুষ গড়তে সক্ষম হবো না।

শিল্প-সংস্কৃতি বিপ্লবের জন্য একটা প্রধান হাতিয়ার– এটা মাওবাদী মাত্রই স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই জগতের বিশেষত্বকে আমলে নেয়া হয়নি। বরং শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বিপ্লবী সংস্কৃতি নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা দ্বারা মাওবাদী আন্দোলন চালিত হয়েছে।

ফলে না হয়েছে যথেষ্ট সংখ্যক উন্নত শিল্প মানের সৃষ্টি, না হয়েছে প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতির বিপ্লবী পুনর্গঠন; এবং ব্যাপক বুদ্ধিজীবীদেরকে বিপ্লবী পরিমন্ডলে টেনে আনা। একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সীমিত বিপ্লবী সংস্কৃতিকাজের জগতে মাওবাদী আন্দোলন বিচরণ করেছে। এটা আদি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সফলতাগুলোকেও হাতছাড়া করে ফেলেছে। ফলত তার বুদ্ধিজীবীত্বের বিকাশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অন্যদিকে প্রচলিত সংস্কারবাদী, মানবতাবাদী, এমনকি বিনোদনমূলক সামাজিক সংস্কৃতির বলয় থেকে এমনকি নেতৃত্ব পর্যায়ের কমরেডগণও তেমনভাবে বেরুতে পারেননি।

এরই প্রকাশ আমরা দেখি সুকান্তের মত প্রগতিশীল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়নের নামে এক ধরনের নেতিবাদী ধারণা গড়ে ওঠার মধ্যে। বিপরীতে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইনের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির প্রভাবে শরৎচন্দ্রকে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' লেখক বলে মূল্যায়ন করবার ডানবিচ্যুতির মধ্যে। এসবকিছু মাওবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কাজকে শুধু সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে দেয় তাই নয়, তার মাঝে গুরুতর ডানপন্থাও গড়ে উঠবার সুযোগ পায়।

– বিজ্ঞান ও দর্শনের আবিষ্কার ছাড়া মার্কসবাদ হতে পারতো না। তাই, বিকাশমান বিজ্ঞানকে মার্কসবাদী তত্ত্বে সংযুক্ত করার প্রশ্নটিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রশ্নে পার্টিকে সজ্জিত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে।

১৪। সংকীর্ণতাবাদী পার্টিজান মতাদর্শ ঃ

মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনাতেই বহুধাবিভক্ত হয়ে একে অন্যকে সংশোধনবাদী ও এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল অভিধায় চিহ্নিত করার ভুল মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করার পর থেকে অব্যাহতভাবে যতনা বাস্তব তথ্য থেকে, তার চেয়ে বেশি কল্পিত ধারণা থেকে অন্যদেরকে মূল্যায়ন করার প্রচণ্ড আত্মগতভাব দ্বারা চালিত হয়েছে। এটা তথ্য থেকে সত্য অনুসন্ধান না করার ভাববাদ/গোড়ামীবাদে পর্যবসিত হয়েছে। এবং এভাবে সমগ্র আন্দোলনে এক গুরুতর সংকীর্ণতাবাদী পার্টি-জান মতাদর্শ গড়ে উঠেছে।

এ শতাব্দীর সূচনায় আমাদের পার্টি এ থেকে বেরিয়ে এলেও এর সামগ্রিক পুনর্গঠন হতে আরো সময় লাগবে। পূবাকপা/লাল পতাকা'র প্রধান নেতৃত্ব *(কমরেড রাকা)* সম্প্রতি এক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন সেটাও খুবই আশাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার পার্টি সমগ্রভাবে এতে কতটা সজ্জিত হতে পারে তা এখনো দেখার বিষয়।

এই ধরনের সংকীর্ণতাবাদী পার্টি-জান মতাদর্শ পার্টির বাইরে বৃহত্তর জনগণকে দেখা দূরের কথা, বৃহত্তর মাওবাদী আন্দোলনকে এবং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক

আন্দোলনকে অনেক সময় দেখতেই পায়নি। ফলে এটা মাওবাদী ঐক্য এবং যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের পথে এক গুরুতর মতাদর্শগত বাধা হিসেবে কাজ করেছে। এটা নিজ পার্টির ভুল-ভ্রান্তির দিকে নজর দিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। এটা ব্যক্তিগত সংকীর্ণতাবাদ, বিভেদবাদ, বিনয়ের অভাব, শিক্ষাগ্রহণের অভাব, আত্মসমালোচনা বিমুখতা এবং ঔদ্ধত্যের একসারি মতাদর্শগত সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

* সুতরাং পূর্বোল্লিখিত অতীত-মূল্যায়নের লাইনগত পর্যালোচনার পাশাপাশি এইসব মতাদর্শগত সমস্যাবলির উপরও আমাদেরকে নজর দিতে হবে। কারণ, কখনো কখনো মতাদর্শগত সমস্যাবলিই লাইনগত প্রশ্নে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার পথে বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই, লাইনগত সারসংকলন ও মতাদর্শগত পুনর্গঠন একটি পাশাপাশি বিষয়। একে একত্রে চালানোর মধ্য দিয়েই আমরা আন্দোলনকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে পারি।

বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনের মাও-পরবর্তী সিকি শতাব্দী

বিপর্যয় থেকে বেরুবার প্রচেষ্টা– সফলতা ও ব্যর্থতা

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭৬-সালে মাও-এর মৃত্যুর অল্প পরেই তেং-হুয়া চক্র একটা সামরিক ক্যুদেতা ঘটায়, চ্যাং চুন চিয়াও ও চিয়াং চিংসহ প্রকৃত মাওবাদী নেতৃত্বদের গ্রেফতার করে, অসংখ্য হত্যা-গ্রেফতার ও দমনের মধ্য দিয়ে নিজ ক্ষমতাকে সুসংহত করে এবং চীনকে একটি সংশোধনবাদী ও পুঁজিবাদী দেশে পরিণত করে। ঠিক এ সময়টাতেই আলবেনিয়ার এনভার হোক্সা শঠতাপূর্ণভাবে মাওবাদের উপর এক সার্বিক আক্রমণ শুরু করে, গোড়ামীবাদী সংশোধনবাদের আশ্রয় নেয় এবং কমিউনিস্ট বিপ্লব ও ঐক্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এক সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়। ভিয়েতনামী জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে এক মহান বিজয় ঘটলেও হোচিমিন ও ভিয়েতনামি পার্টির দ্বারা ইতিপূর্বেই গৃহীত মধ্যপন্থা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল। যা এই নবতর পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে পথ হারিয়ে ফেলে পূর্বতন কিউবা-বিপ্লবের মতোই, এবং মার্কিন-মুক্ত ভিয়েতনামকে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের পথে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে পৃথিবীজুড়ে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ আর রইলো না। বরং সোভিয়েত নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের নামে একটি শক্তিশালী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের অস্তিত্ব এই বিভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে দিল।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়ে উঠেছিল, বিশ্বজুড়ে যে শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে বিপ্লবী জোয়ার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে, তা এক সার্বিক বিপর্যয়ে নিপতিত হলো। মধ্য ৫০-দশকে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের অধঃপতনের পর প্রাক্তন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নে পুঁজিবাদের আবির্ভাবকে সারসংকলন করে মাওবাদের ভিত্তিতে যে নতুন উত্থান ষাট/সত্তর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনসহ বিশ্বকে নতুন রক্তে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল, তা-ও এক সার্বিক অধঃপতনে আচ্ছন্ন হয়। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের তাৎপর্য বিশ্ব রাজনীতির বিকাশে বিপুল। যাকে উপলব্ধি না করলে আমরা তার পরবর্তীকালের উদ্যোগসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, এবং পাশাপাশি তার সমস্যাগুলোর অসীম জটিলতাকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবো না। এবং বিশ্ব পরিস্থিতির নেতিবাচক বিকাশগুলোকেও বুঝতে ব্যর্থ হবো।

বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলন ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই ঘটনা বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল, যা পরবর্তীকালের বিশ্ব ইতিহাসকেই এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। সুতরাং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতি এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলন এক্ষেত্রে কীভাবে এগিয়েছে, কী তার সফলতা ও ব্যর্থতা, তা খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে।

* মাও-মৃত্যুর পর এই সার্বিক বিপর্যয়কর মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা চীনা-তেং ও আলবেনীয়-হোক্সা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লাইনগত সংগ্রামে জাগরিত হতে শুরু করেন। যেসব দেশ ইতিমধ্যেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তারপর ইতিমধ্যে সার্বিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়েছিল, সেসব দেশে এই মতাদর্শগত-লাইনগত সংগ্রাম নিজ নিজ দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে পুনর্জাগরিত করার সাথে অনিবার্যভাবেই যুক্ত ছিল। এভাবে শুধুমাত্র লাইনগত সংগ্রামই নয়, এক নতুন বিশ্ববিপ্লবী সংগ্রাম জাগরিত করবার এক নব প্রচেষ্টা শুরু হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মাওবাদীরা পরস্পরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হন, পারস্পরিক মত বিনিময়, পর্যালোচনা, বিতর্ক ও লেনদেনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু করেন। এ প্রক্রিয়ায় যেমন প্রতিটি দেশের নিজ নিজ বিপ্লবী আন্দোলনের সারসংকলন গড়ে উঠতে থাকে– যা কিনা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে পরিস্কার হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক সাধারণ লাইনের ক্ষেত্রেও সারসংকলন ও বিকাশের এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

১৯৮৪-সালে আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের ঐক্যের কেন্দ্ররূপে "রিম" গঠন ছিল এমনই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ। আরসিপি নেতা কমরেড বব এ্যাভাকিয়ান ১৯৪৩-এর তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিলোপের দীর্ঘ ৪০ বছর পর এই প্রথম বিশ্বের প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের লক্ষ্য থেকে রিম-গঠনে ও তার লাইনগত ভিত্তি গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যদিও মাওবাদ সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধির অভাব রিম-ভুক্ত বা বহির্ভূত সকল পার্টিতেই বিভিন্ন মাত্রায় ও রূপে তখন বিরাজমান ছিল। কমরেড এ্যাভাকিয়ান কমরেড স্ট্যালিন কর্তৃক ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্তির যে সারসংকলন করেন, তার সাথে সকলে একই রকমভাবে একমত না থাকলেও রিম-গঠনে এগিয়ে আসা সকল পার্টি ও গ্রুপই এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় বিশ্বের প্রকৃত সর্বহারা বিপ্লবীদের, তথা মাওবাদীদের একটি নতুন আন্তর্জাতিক গঠনে এগিয়ে আসতে হবে এবং রিম গঠন করা হয় তারই এক প্রস্তুতি সংগঠনরূপে। রিম শুধুমাত্র তেং ও হোক্সা সংশোধনবাদের নতুন সমস্যাকে সংগ্রাম করে মাওকে তুলে ধরলো তা নয়, বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সে সারসংকলন করে, যার একটি প্রধানতম বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ৩য় আন্তর্জাতিকের দ্বারা গৃহীত ফ্যাসিবাদ-

বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ লাইন। এই সারসংকলনের সুদুরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল ও রয়েছে, যা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নটিকে একটি উচ্চতর নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছিল।

– এখানে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহলো, রিম বিশ্ব মাওবাদীদের ঐক্যের জন্য একটি ভ্রুণকেন্দ্র হিসেবে গঠিত হলেও মাওবাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর বাইরেও থেকে যায়– যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতের প্রধান মাওবাদী পার্টি পিডব্লিউ– যা পরে সিপিআই/মাওবাদী-তে রূপান্তরিত হয়; এবং ফিলিপিনের মাওবাদী পার্টি। রিম-বহির্ভূত এই পার্টিগুলো একটি নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের সাথে একমত ছিল না, যদিও তারা আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের সংযোগ-সমন্বয়-সমঝোতা-শিক্ষাগ্রহণের উপর গুরুত্ব রাখে। এটা বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলন, তথা লাইনগত বিকাশের সাথে জড়িত ছিল। তাই দেখা যাবে যে, শুধু এই প্রশ্নই নয়, একসারি মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনগত প্রশ্নে রিম-বহির্ভূত মাওবাদীদের বিভিন্ন অংশের সাথে রিম-এর মতপার্থক্য অব্যাহত থাকে।

রিম তার পরিচালনাকারী কমিটির নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত মাওবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ কাজকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়। এবং এই সংশ্লেষিত উচ্চতর অবস্থান ও লাইন/নীতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। রিম-বহির্ভূত মাওবাদীদের সাথেও রিম একদিকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায়, অন্যদিকে তাদের সাথে সুস্থ বিতর্ক গড়ে তোলে। এটা রিম-বহির্ভূত অনেক পার্টির উপরই ইতিবাচক প্রভাবে ফেলে– যদিও রিম-এ সাংগঠনিকভাবে যোগ দেবার মত স্তরে অনেকের ক্ষেত্রে তা এগোতে পারেনি। কিন্তু এটা বলা চলে যে, বিকাশের গতি ছিল ইতিবাচক এবং নিঃসন্দেহেই রিম এতে নেতৃত্বকারী ও অগ্রসর ভূমিকা পালন করে।

– এর অর্থ এটা নয় যে, রিম-এর অভ্যন্তরে তেমন কোনো মতপার্থক্য ছিল না। বরং বিপরীতটাই সত্য। রিম-অভ্যন্তরে গুরুতর বিভিন্ন মতপার্থক্যর অস্তিত্ব ছিল। রিম-অভ্যন্তরস্থ এইসব বিতর্ক, অগ্রসর অভিজ্ঞতাসমূহের সাধারণীকরণ, এবং সমগ্রভাবে সেগুলোকে রিম-এর সাধারণ লাইনে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি ফয়সালা-ই শুধু করেনি, নিজেকেও লাইনের ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে এগিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় ছিল মালেমা ও গণযুদ্ধ প্রশ্ন।

* মাওবাদ সূত্রায়ন ও গণযুদ্ধের সর্বজনীনতা, এইসাথে গণযুদ্ধের কিছু সাধারণ নীতিমালা বিকশিত করার ক্ষেত্রে পেরুর পার্টি ৮০-দশকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও এ প্রশ্নগুলোতে পিসিপি'র সামগ্রিক ধারণাগুলোকে– যার মাঝে বেশ কিছু গুরুতর দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল– রিম কখনো গ্রহণ করেনি, এবং বেশ কিছু গুরুতর মতপার্থক্য অব্যাহত ছিল, যা পরবর্তীকালে রিম-এর সংকটে অবদান রাখে।

তাসত্ত্বেও মাওবাদ-সূত্রায়ন গ্রহণ, গণযুদ্ধের সর্বজনীনতা গ্রহণ এবং গণযুদ্ধের কিছু নীতির বিকাশ সাধনে ৮০-দশকে পেরু পার্টি ও তার তৎকালীন নেতৃত্ব কমরেড গণজালোর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

– মতবাদিক ক্ষেত্রে মাওবাদ-সূত্রায়নে পেরু পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও তারা এমনভাবে একে উপস্থাপিত করে যা থেকে মনে হতে পারে যেন, ৬০/৭০-দশকে 'মাওচিন্তাধারা' আমাদের মতবাদকে তৃতীয় স্তরে বিকশিত করাকে সূত্রায়িত করেনি, এবং 'মাওবাদ'ই সর্বপ্রথম এটা করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে তারা 'মাওচিন্তাধারা' ও 'মাওবাদ'-কে মতবাদের বিকাশে দুটো ভিন্ন স্তরের মত করে তুলে ধরে, এমনকি এ দুটোকে পরস্পর বিপরীত বলে উত্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা 'চিন্তাধারা'-কে দেশীয় ক্ষেত্রে মালেমা'র প্রয়োগজাত সাধারণ শিক্ষা বলে যে ধারণা পেশ করে, এবং প্রতিটি দেশে নিজ নিজ 'চিন্তাধারা' প্রয়োজন ও তার উদ্ভব অনিবার্য বলে যে গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিসম্পন্ন বক্তব্য রাখে তা 'মাওবাদ' সম্পর্কে তাদের উপরোক্ত ভুল ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

তারা মতবাদের ক্ষেত্রে শুধু উপরোক্ত ভুলকে নিয়ে আসে তা নয়, তারা 'প্রধানত মাওবাদ' বলে একটি নতুন সূত্র মতবাদের সাথে জুড়ে দেয়। তারা বলতে থাকে যে, মতবাদ/মতাদর্শ হলো– "মালেমা, প্রধানত মাওবাদ"। এই সূত্রায়ন দ্বারা তারা 'মালেমা'-যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা, তাকে কার্যত অপলাপ করে বসে। এবং মাও-এর অবদানকে অন্য দুজন শিক্ষাগুরু যথা– মার্কস ও লেনিন– তাঁদের অবদানগুলো থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবার পথ করে দেয়। এভাবে তারা মাও-এর অবদানকে সংশ্লেষণ আকারে গ্রহণ না করে তাকে মার্কস ও লেনিনের অবদানের সাথে যোগফল আকারে উত্থাপনের পথও করে দেয়।

'মালেমা' শব্দমালা আমাদের মতবাদ বিকাশের তিনটি স্তরকে প্রকাশ করে– যাতে পরবর্তী স্তরগুলো তার পূর্ববর্তীর চেয়ে স্বভাবতই উচ্চতর। কিন্তু আমাদের মতবাদ তিনটি নয়, একটি– মালেমা। লেনিনবাদ হলো প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; এবং মাওবাদ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। আজকের যুগে মাওবাদ বলার অর্থ হলো মালেমা বলা। প্রচলিত আলোচনা ও প্রয়োজনে সাধারণত মাওবাদ বলা হলেও এটা কোনোক্রমেই তার আগের স্তরগুলো থেকে তাকে পৃথক করে দেখায় না। কিন্তু 'প্রধানত মাওবাদ' বলা হলে মাও-এর অবদানকে পূর্ববর্তী মতবাদিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ থাকে। সূত্রায়নের এই ত্রুটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি ডেকে আনতে পারে। 'শুধু মাও-কে অধ্যয়ন করা'– জাতীয় লিনপন্থী ফর্মূলার মাধ্যমে এটা মার্কস ও লেনিনের মৌলিক শিক্ষাগুলো থেকে সর্বহারা শ্রেণী ও পার্টিকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতি সাধন করতে পারে। এটা এক ধরনের লিনপন্থার প্রভাবকেই প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে পিসিপি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন গ্রুপিং থেকে আমরা যে গুরুতর ব্যক্তিতাবাদী ও একতরফাবাদী

লিনপন্থী বিচ্যুতির প্রকাশ দেখেছি তার উৎসমূলে এই সূত্রায়নের সমস্যা ছিল বলেই ধারণা করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি দেশে তারা পৃথক পৃথক 'চিন্তাধারা' গড়ে ওঠার অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতার কথা তুলে ধরেছে। এরই অনুসরণে পিসিপি 'গণজালো চিন্তাধারা'-কে তাদের মতাদর্শের সাথে যুক্ত করে। এক্ষেত্রে যা ভয়ংকর তাহলো, দেশীয় ক্ষেত্রে তারা গণজালো চিন্তাধারা-কে মতবাদের প্রধান দিক বলে উল্লেখ করে। অর্থাৎ, তারা দেশীয় ক্ষেত্রে মতবাদকে উল্লেখ করে এভাবে– 'মালেমা, গনজালো চিন্তাধারা, প্রধানতঃ গনজালো চিন্তাধারা'।

এর মধ্য দিয়ে মতবাদ-সূত্রায়নে পিসিপি আরেকটি গুরুতর গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সর্বহারা শ্রেণি একটি আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণি। তাই, তার মতাদর্শও আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন হতে বাধ্য। এটা আন্তর্জাতিকভাবে একরকম, আর দেশীয় ক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারে না।

উপরন্তু, আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির বিভিন্ন পৃথক দেশের যে বাহিনী, তাদের পৃথক পৃথক 'চিন্তাধারা' থাকার বক্তব্য গুরুতরভাবে সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তা 'শ্রমিক শ্রেণির কোনো দেশ নেই'– এই মৌলিক মার্কসবাদী সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধে যায়। শুধু পরবর্তীকালেই নয়, সূচনা থেকেই পিসিপি'র পক্ষ থেকে সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতির ক্ষেত্রে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করে বরং নিজ 'চিন্তাধারা' থেকে সবকিছু যাচাই-এর যে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি আমরা লক্ষ্য করি তা তাদের এই মতবাদিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

– গণযুদ্ধের সর্বজনীনতাকে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পিসিপি'র অগ্রণী ভূমিকা সত্ত্বেও একইরকমভাবে তাতে কিছু গুরুতর সমস্যা সূচনা থেকেই বিরাজ করছিল– তা বলাটা ভুল হবে না। এটা সত্য যে, তারা বলেছে, 'বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী' গণযুদ্ধ 'যথাসম্ভব দ্রুত' শুরু করতে হবে– যা সাধারণ বক্তব্য হিসেবে সঠিক ছিল। কিন্তু এটা একটা বিমূর্ত ও সাধারণ দিক নির্দেশনার বেশি কিছু ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত দেশ– এই দুয়ের মাঝে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিপ্লবী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা থেকে মৌলিকভাবে দুই রণনীতির মূর্তকরণ ব্যতীত সর্বহারা শ্রেণি বাস্তব বিপ্লবী কর্মকান্ডে এগোতে পারে না। 'গণযুদ্ধের সর্বজনীনতা'র সঠিক তত্ত্বের দ্বারা একে অপলাপ করা যায় না। গণযুদ্ধ পরিচালনা করাটিই পরিস্থিতি নির্বিশেষে বিপ্লবী হবার প্রধানতম মানদণ্ড নয়। একটি পার্টির মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের দ্বারা সে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র নির্ধারিত হয়– অবশ্যই যাতে গণযুদ্ধের লাইন অন্যতম নির্ধারক স্থান দখল করে রয়েছে (যাকে বাদ দিয়ে বা গুরুত্বহীন করে বিমূর্তভাবে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের কথা বলারও

কোনো অর্থ নেই)। কিন্তু যেকোনো সময়ে একটি পার্টি গণযুদ্ধ পরিচালনা করছে কিনা তা দ্বারা পার্টির বিপ্লবী চরিত্র নির্ধারণ করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে তো বটেই, ৩য় বিশ্বের বহু দেশেও ভুল মূল্যায়ন দ্বারা চালিত হতে হবে। আপনি তাহলে একটি বিপ্লবী পার্টিকেও অবিপ্লবী বলে তার প্রতি বিষোদগার করবেন। এবং একটি পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামে রয়েছে বলেই আপনি তার সামগ্রিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না করে একটি সংস্কারবাদী/অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিকেও, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের পার্টিকেও বিপ্লবী পার্টির সার্টিফিকেট দিয়ে গুরুত্বারোপ করবেন। পরবর্তীকালে পিসিপি-উদ্ভূত অনেক শক্তির থেকে এটা আমরা স্থুলভাবে দেখতে পাই– যার সূচনা অতীতেই ঘটেছে বললে ভুল হবে না। এই মতাবস্থানটি হলো অন্যতম কারণ, যার জন্য পিসিপি'র প্রবাসী সংগঠন এমপিপি খুবই স্থুলভাবে রিম-ভুক্ত অনেক পার্টির বিরুদ্ধে শত্রুর মত আচরণ করেছে এবং রিম-এর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টিতে প্রথম বড় ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

* যাহোক, উপরোক্ত বিচ্যুতি ও ভুল প্রবণতাগুলো সত্ত্বেও গোটা ৮০-দশক জুড়ে এবং ৯০-দশকের সূচনা পর্যন্ত পেরুর গণযুদ্ধ এগিয়ে চলে, বিকশিত হয় দেশজুড়ে, রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তর অতিক্রম করে এবং দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পেরুর গণযুদ্ধ রিম-গঠন ও বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। তা রিম-উত্থাপিত সাধারণ লাইনের বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। রিম-ভুক্ত ও রিম-বহির্ভূত পার্টিগুলোর লাইনগত বিকাশে এটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যার প্রধানতম প্রকাশ হলো '৯৩-সালে রিম-এর এক বর্ধিত সভায় রিম-কর্তৃক সম্মিলিতভাবে 'মাওবাদ' সূত্রায়ন গ্রহণ এবং '৯৬-সালে নেপালের গণযুদ্ধের সূচনা– যা কিনা ৯০-দশকের শেষার্ধ ও এ শতাব্দীর সূচনাকাল জুড়ে আরেকটি বিজয়ী গণযুদ্ধে নেপালকে প্লাবিত করে দেয় এবং বিশ্ব জনগণের সামনে আরেকটি নতুন আশার আলো জালিয়ে দেয়। এভাবে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। '৭০-দশকের মহাবিপর্যয় কেটে যেতে থাকে।

* নেপাল পার্টি পেরুর গণযুদ্ধ থেকে অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলো গ্রহণের পাশাপাশি তার কিছু নেতিবাচক দিককেও নিজের মাঝে টেনে নেয়– যার মাঝে প্রধানতম বিষয়টি ছিল 'চিন্তাধারা' সংক্রান্ত বিচ্যুতি। নেপাল পার্টি গণযুদ্ধের বিকাশের এক ধাপে এসে পার্টির মতবাদের সাথে 'প্রচণ্ড পথ' জুড়ে দেয়, যাকিনা সারবস্তুগতভাবে পেরু পার্টির অনুসৃত 'চিন্তাধারা'-কেই প্রকাশ করতো। এটা– আমরা যেমন আগেই বলেছি– মালেমা'র সাধারণ তত্ত্বকে মতবাদিক ক্ষেত্রে দুর্বল করে দেয়, জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে তোলে, মালেমা'র বিকাশের নামে নিজস্ব 'পথ'/'থট'-কে সামনে নিয়ে আসে– যার বিষময় ফল আমরা পরে নেপাল বিপ্লবের বিপথগামী হবার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই।

– ইতিপূর্বেই ৯০-দশকের সূচনায় পেরু-বিপ্লব সামগ্রিক বিপর্যয়ে প্রবেশ করে। '৯২-সালে পার্টি ও গণযুদ্ধের প্রধান নেতা কমরেড গণজালো শত্রুর হাতে গ্রেফতার হন– যা কিছু আংশিক লসের মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বেই সূচিত হয়েছিল, এবং গণজালো-গ্রেফতার পরবর্তীকালে তা আরো বেড়ে চলে, যা ৯০-দশক জুড়ে অব্যাহত থাকে।

শত্রুর দ্বারা আরোপিত এই ক্ষতির চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠে পার্টিতে উদ্ভূত 'রোল' (ROL -- Right Opportunist Line/ডান সুবিধাবাদী লাইন), যা কিনা গনজালো-গ্রেফতার পরবর্তীকালে গণযুদ্ধকে থামিয়ে দেবার নসিহত করে। ইতিমধ্যেই পার্টির গ্রেফতারকৃত প্রধানতম অংশের এই ডান-লাইনের সাথে সম্পর্কিত থাকার খবর প্রকাশিত হয়। এমনকি কমরেড গনজালো নিজেই এই শান্তি-চুক্তি লাইনের উদ্গাতা কিনা, বা তিনি কোনো না কোনোভাবে এ জাতীয় লাইন তুলে ধরছেন কিনা তার দাবি ও প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হয়। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি টুএলএস-এর এই জটিল পরিস্থিতিকে লাইনগত সংগ্রামের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তারা চোখ-কান বুঁজে বলতে থাকেন যে, এটা কোনো টুএলএস নয়, শত্রুর ষড়যন্ত্র মাত্র, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে কমরেড গণজালোর যুক্ত থাকার প্রশ্নই আসে না, কারণ তিনি জেফেতুরা, যার অর্থ হলো মহান নেতৃত্ব, যিনি কিনা বিপ্লবের বিজয়ের গ্যারান্টি। এভাবে তারা পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তথ্যভিত্তিক যেকোনো সঠিক উপসংহারকে পার্টির মধ্যে আলোচনা করা, এবং পার্টি ও জনগণকে দিশা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এমনকি যা আরো ভয়ংকর তাহলো, এই টুএলএস-কে গভীরতর করবার স্বার্থে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের জন্য এবং গণযুদ্ধ এগিয়ে নেবার জন্য সারসংকলনের প্রয়োজনকেও তারা কার্যত অস্বীকার করে। রিম-কমিটির হাজারো আন্তরিক ও কঠিন প্রচেষ্টা এবং প্রস্তাবকে পেরু-পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে শত্রুর ষড়যন্ত্রে পা দেয়া, অথবা এমনকি শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা হতে থাকে।

এভাবে সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ৯০-দশকের মধ্যেই বলা চলে যে, পেরু পার্টির প্রথম সারির প্রায় সকল নেতৃত্ব হয় শহীদ হন, নতুবা গ্রেফতার হয়ে যান। কিন্তু আরো বেদনাদায়ক যে ঘটনা তাহলো, গ্রেফতারকৃত সকল প্রধান নেতাই– যারা মুক্ত অবস্থায় গণযুদ্ধ চালিয়ে যাবার লাইনের অসম্ভব দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন, তারা গ্রেফতারের পর শান্তি-চুক্তি লাইনে চলে যান, এবং তারা বলতে থাকেন যে, কারাগারে কমরেড গনজালো তাদেরকে এই লাইনে আস্থা স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন। এমনকি কেউ কেউ এ অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে কমিউনিজমের ব্রতই খোলামেলাভাবে বর্জন করেন।

বাস্তবে এই পরিস্থিতি পেরুর গণযুদ্ধকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিকাশমান ও দেশপ্লাবী এক গণযুদ্ধ মার খেয়ে যায়– যেমনটি আমাদের দেশে '৭৪-

পরবর্তীকালে ঘটেছিল। পার্টি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়– জেলের ভেতরে ও বাইরে। বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র এ্যাকশন এখনও বিরাজমান বলে জানা যায়, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক লাইন পরিষ্কার নয়, এবং তার সবই একই কেন্দ্র থেকে পরিচালিত, এবং গণযুদ্ধ অব্যাহত রাখবার লাইন থেকে চালিত তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য গণযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া– এমন একটা সারবস্তুতে শান্তি-লাইনও যে সশস্ত্রভাবে এখনো সক্রিয় সেটা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে।

বিপজ্জনক বিষয় হলো এই যে, শান্তিচুক্তি লাইন ও গণযুদ্ধ লাইন– এই দুই বিপরীত পক্ষই নিজেদেরকে গনজালোর অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে একাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও '৯২-সালে গ্রেফতারের অব্যবহিত পর, এবং শান্তি-চুক্তি আসবার আগে, "খাঁচার ভাষণ" নামে বিখ্যাত ভাষণটিতে খুবই বলিষ্ঠভাবে গণযুদ্ধ অব্যাহত রাখবার আহ্বান ব্যতীত, কমরেড গনজালোর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো বিস্তৃত ভাষণ বা বিবৃতি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শান্তি চুক্তি লাইনের পক্ষে গনজালোর চিঠিপত্র বা টিভি-ছবি জাতীয় যাকিছু প্রকাশ পেয়েছে তার সবকিছুকেই অন্যপক্ষ শত্রুর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছে।

এই পরিস্থিতি একদিকে গণযুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব আন্দোলনের নতুন সূচিত উত্থানকে গুঁড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে পেরু-পরিস্থিতির একটা ঘোলাটে চিত্র উপস্থাপন, যেকোনো অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ও টুএলএস-কে আঁকড়ে ধরার প্রস্তাবকে শত্রুর ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে কার্যত রিম-পরিসরে পেরু-পরিস্থিতি নিয়ে একটি নতুন দুই লাইনের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটে। পিসিপি'র প্রতিনিধিত্বকারী দাবীদার প্রবাসের সংগঠন এমপিপি ন্যাক্কারজনকভাবে রিম, রিম-কমিটি, ও তার অন্যতম প্রধান সদস্য আরসিপি-কে এবং তার নেতৃত্ব কমরেড এ্যাভাকিয়ানকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ চালায়, একটি চরম বিভেদাত্মক ব্যক্তিতাবাদী অপপ্রচার পরিচালনা করে, রিম-শক্তির মধ্যে পেরুর পার্টি, গনজালো ও গণযুদ্ধের সম্মানকে ব্যবহার করে জঘন্য উপদলীয় অপতৎপরতা শুরু করে।

এসব সত্ত্বেও রিম-কমিটির নেতৃত্বে রিম মূলত ঐক্যবদ্ধ থেকে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলভাবে এবং বিজ্ঞচিতভাবে পেরু-পরিস্থিতি মূল্যায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। রিম রোল-লাইনকে লাইনগতভাবে খণ্ডন করে, গণযুদ্ধ চালিয়ে যাবার লাইনকে পেরু ও বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরে, গনজালোর জীবন রক্ষার জন্য ও পরবর্তীকালে প্রেসে তার নিজ বক্তব্য প্রচারের দাবি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে।

– পেরু-পার্টি ও গণযুদ্ধের এই বিয়োগান্তক পরিস্থিতির কারণ নিছক পার্টি ধ্বংস ও গনজালো হত্যার শত্রু-ষড়যন্ত্রে খুঁজলে চলবে না। শত্রু সেটা সর্বদাই করেছে, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু শুধু এটাই পরিস্থিতির এই গুরুতর নেতিবাচক বিকাশের কারণ হতে পারে না। কারণ, সব দেশের সকল বিপ্লব

শত্রুর ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করেই বিজয়ের দিকে বিকশিত হয়। পেরুর পার্টি ও বিপ্লবও ৮০-দশকে তেমনি করেই এগিয়েছিল। তাই, পেরু-অভিজ্ঞতার সারসংকলন পেরু-বিপ্লবসহ বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগতির জন্যই আজ অপরিহার্য।

এখনো পেরুতে মাওবাদী বাহিনী ও তাদের সশস্ত্র তৎপরতা রয়েছে বলে প্রকাশিত হয়, যদিও তা পূর্বতন মাত্রা থেকে অনেক নিম্নস্তরের। কিন্তু সেগুলোও একই কেন্দ্র থেকে চালিত কিনা, তাদের নেতৃত্বকারী রাজনীতি কী, কমরেড গনজালোর মতাবস্থান কী, এবং পার্টি-পরিস্থিতি কী (তার কেন্দ্র ও নেতৃত্বসহ)– এসব বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, প্রবাসে পিসিপি'র প্রতিনিধিত্বকারী দাবীদার সংগঠনটি (এমপিপি) বহু আগেই তার গোড়ামীবাদী, বিভেদাত্মক, ব্যক্তিতাবাদী তৎপরতা দ্বারা রিম-বিরোধী একটি পেটি-বুর্জোয়া শক্তিতে নিজেকে অধঃপতিত করেছে, যার থেকে বস্তুগত পরিস্থিতির কোনো সঠিক চিত্র পাওয়া দুস্কর। বস্তুত এ ধরনের তৎপরতাকে শত্রু সর্বদাই স্বাগত জানায়। অন্যদিকে, এই কাজকে এগিয়ে নেবার যে একমাত্র গতিশীল কেন্দ্র রিম-কমিটি, তার নেতৃত্বে রিম একাজে কিছুটা এগোতে সক্ষম হলেও এখন তাতে নতুন সংকট উদ্ভবের ফলে সামগ্রিকভাবে রিম এক জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। আমরা এখন সংক্ষেপে সেই আলোচনায় প্রবেশ করবো।

* ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেরু-গণযুদ্ধের ইতিবাচক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নেপাল পার্টি '৯৬-সালে সেদেশে গণযুদ্ধের সূচনা করে, যা অতিদ্রুত দেশপ্লাবী এক প্রচণ্ড শক্তি ও উত্থানে পরিণত হয়। গণযুদ্ধের লাইন আত্মস্থকরণ, তার সূচনা ও এগিয়ে নেবার প্রথম পর্যায়গুলোতে রিম-কমিটির ঘনিষ্ঠ পরামর্শ ও গাইডেন্স গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। নেপাল পার্টি এবং তার নেতৃবৃন্দ বহু জায়গাতেই তার উল্লেখ করেছেন।

– একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, রিম গঠিত না হলে এই গণযুদ্ধটি এইভাবে সৃষ্ট হতো না। বিশ্ববিপ্লবের একটি সাধারণ লাইন গড়ে তোলা এবং তার আলোকে বিভিন্ন দেশের পার্টি ও সংগ্রামকে পরিপুস্ট করা; আবার বিপরীতভাবে, দেশগুলোতে অর্জিত পার্টি ও সংগ্রামের অগ্রসর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলো দ্বারা বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর উপলব্ধি ও সংগ্রামকে উচ্চতর লেবেলে উন্নীত করা– এরই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো রিম ও নেপাল গণযুদ্ধের সম্পর্ক। বিশেষত নেপাল গণযুদ্ধ এমন এক সময়ে সূচিত হয় যে সময়ে বিপ্লবী যুদ্ধের নতুন এই উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ৯০-দশকের শুরুতে প্রাক্তন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েতের পতন হয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব কর্তৃক বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে এক মতাদর্শগত অভিযান শুরু হয় এই দশকের শুরুতে। একইসাথে 'বিশ্বায়ন' কর্মসূচি/পলিসির নামে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নতুনতর

অনুপ্রবেশ, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই সময়কালেই নেপাল গণযুদ্ধ বিশ্বজনগণের মাঝে এক ভিন্ন পৃথিবীর বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, কমিউনিজমের আদর্শের এক নতুন জয়গান নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলে।

– আবার ঠিক এ সময়টাতেই পেরুর গণযুদ্ধ সার্বিক বিপর্যয়ে প্রবেশ করেছিল। যা বিশ্ব মাওবাদী আন্দোলনে একটি বড় ধাক্কা সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নেপাল গণযুদ্ধ রিম, মাওবাদী আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান রেখেছিল। বিগত শতক পার হয়ে নতুন একবিংশ শতাব্দীতে মাওবাদী আন্দোলন প্রবেশ করেছিল সত্যিকার এক বিপ্লবী ঢেউ-এর বাস্তব সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু পূর্বেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, এ শতাব্দীর শুরু থেকেই নেপাল পার্টি একটা একটা করে গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে থাকে, যাকিনা মালেমা থেকে বিচ্যুতিপূর্ণ। এর যাত্রা শুরু হয় পেরু পার্টি ও গণজালো চিন্তাধারার অনুসরণে ভুলভাবে পার্টির মতাদর্শে মালেমা'র সাথে 'প্রচণ্ড পথ' যুক্ত করার মধ্য দিয়ে। এটা সত্য যে, কমরেড প্রচণ্ড নেপাল পার্টির বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণে, গণযুদ্ধের সূচনায় ও তাকে গতিশীল নেতৃত্বদানে বিরাট ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এজন্য তিনি নেপালের বিশেষ অবস্থায় মালেমা'র সৃজনশীল প্রয়োগ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লবী সংগ্রাম ও গণযুদ্ধ, বিশেষত পেরুর গণযুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হন এবং নেপাল-বিপ্লবের বহু গুরুত্বপূর্ণ লাইন/নীতি নির্মাণে নেতৃত্ব দান করেন। এই অবদানসমূহকে কোনো বিশেষ নামে চিহ্নিত করা ও তাকে নেপালের পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় করার প্রয়োজন থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণির একটি পার্টির মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মালেমা'র সর্বজনীন সত্যগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেবার যে ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে পার্টিটি পড়ে যায় তা পেরুর মতই নেপালে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এরপর থেকে নেপাল পার্টি মালেমা'র বিকাশের নাম করে একের পর এক নতুন নীতি/লাইন পেশ করা ও তাকে সাধারণীকৃত আকারে তুলে ধরা শুরু করে যা কিনা নেপালে-তো বটেই, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন সংকটের সূচনা ঘটায়।

নেপাল পার্টি দ্বারা আনীত নতুন সাধারণীকৃত অভিমতগুলোর মাঝে সবচাইতে মৌলিক, আর সবচাইতে বিপজ্জনক হিসেবে সামনে উত্থাপিত হয় '২১-শতকের গণতন্ত্র' নামক এক নতুন তত্ত্ব– যাকিনা তারা ২০০৩-সাল থেকে পার্টিতে গ্রহণ করেন। এই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রথমদিকে মৌখিক ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যতীত বিস্তারিত, গভীর ও লিখিত কিছু জানা যায়নি। ২০০৪ ও '০৫-সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক কিছু সম্মেলন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কিছু কাগজপত্রে (বিশেষত নেপাল পার্টির ইংরেজী মুখপত্র ওয়ার্কার-এর ৯নং সংখ্যায় কমরেড বাবুরাম ভট্টারাই-এর নামে প্রকাশিত "নতুন রাষ্ট্র" নামীয় নিবন্ধে) তাদের যে অভিমতগুলো উঠে আসতে থাকে তা-যে

মার্কসীয় 'সর্বহারা একনায়কত্ব'র মূলসূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক, সেটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমদিকে মৌখিক আলোচনায়, পরবর্তীকালে কিছু কিছু লেখায় একে ঘিরে টুএলএস গড়ে ওঠে। রিম-বহির্ভূত পার্টি, বিশেষত সিপিআই/মাওবাদীও এই প্রশ্নে তাদের ভিন্নমতের ও সমালোচনার প্রকাশ করতে থাকে। আমাদের পার্টিও একে বিরোধিতা করতে থাকে। বিশেষত আরসিপি *(আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মাওবাদী পার্টি)* তাদের লিখিত দলিলাদির উপর টুএলএস-মূলক দলিল তৈরি করে। রিম-কমিটি রিম-এর অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মুখপত্র 'স্ট্রাগল'-এর মাধ্যমে পেরু-পরিস্থিতিকে প্রথমে আলোচনায় হাইলাইট শুরু করলেও দ্রুতই নেপাল-লাইনকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

– এই যখন অবস্থা, রিম-অভ্যন্তরস্থ এক নতুন টুএলএস জাগরিত হয়ে উঠছিল, সে সময় নেপাল-পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ঘটতে থাকে। '০৫-সালের নভেম্বরে নেপাল পার্টি ৭টি সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টির সাথে ১২-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং রাজতন্ত্রবিরোধী এক যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে। তার প্রক্রিয়ায় '০৬-সালের এপ্রিলে রাজতন্ত্র পিছু হটে, প্রধান সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, মাওবাদীরা গণযুদ্ধ স্থগিত করে, উক্ত সরকারে যোগ দেয়, নিজ বাহিনীকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্র করে, সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশ নেয়, নির্বাচনে জয়লাভ করে নতুন যুক্ত সরকার গঠনে নেতৃত্ব দেয়। তারপর এক বছরের কম সময়ে সে সরকারেরও পতন হয়। সরকার পতনের পর বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির গ্রুপিং-লবিং চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে প্রাক্তন বিপ্লবী বাহিনীর একীকরণ, এবং নতুন সংবিধান রচনা। নেপাল পার্টিতে প্রাধান্যকারী লাইনটি বুর্জোয়া সংসদীয় পথকে বর্জন করেছে বা করবে বলে কোনো আশাবাদ দেখা যাচ্ছে না। তবে পার্টি-অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের সংঘাত বড় হয়ে উঠেছে। এই লাইন-সংগ্রামে কোনো বিপ্লবী লাইন বেরিয়ে আসে কিনা, মাওবাদী বাহিনীর তথাকথিত একীকরণ প্রক্রিয়ার শেষটা কী দাড়ায়, এসবের প্রক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলরা মাওবাদী, তথা পার্টির বিপ্লবী অংশের দমনে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেসবের জন্য আমাদের আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে প্রাধান্যকারী ডান লাইনটি ইতিমধ্যেই পার্টি ও বিপ্লবের যে গুরুতর ক্ষতি করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এভাবে কমরেড প্রচণ্ডের নেতৃত্বে নেপাল পার্টি এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরে একটি ধারাবাহিক ডান লাইন অনুসরণ করে চলেছে, যা কিছু কিছু সংস্কারের বিনিময়ে বিপ্লবকে কার্যত বর্জন করেছে। বিপ্লবী ক্ষমতার প্রধান স্তম্ভ বিপ্লবী বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে মিশিয়ে দিলে, বা তাকে অন্য কোনো উপায়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করলে বিপ্লব অন্তত এ পর্যায়ের জন্য সমাধিগ্রস্থ হতে পারে। যদিও পাঁড় প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষীণতম সংস্কারকেও সহজে মেনে নিতে পারছে না। উপরন্তু

মাওবাদীরা পুনরায় বিপ্লবে ফিরে যাবে না, অন্তত তার কোনো অংশ, তাতে তারা আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। ব্যবস্থার সাথে পার্টির মানিয়ে নেয়া সম্পন্ন করার পরিপূর্ণ বুর্জোয়া অধঃপতন ছাড়াও, পার্টির মধ্যে বিপ্লবী ভাঙন, প্রতিক্রিয়াশীলদের এই বা ওই অংশের দ্বারা পার্টি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক হামলা, ফলশ্রুতিতে মাওবাদীদের পুনরায় যুদ্ধে ফিরে যেতে অথবা সবল অভ্যুত্থানে যেতে বাধ্য হওয়া– ইত্যাদি, এবং এসবকিছুরই মিশ্রণ– এর কোনোটাকেই বাতিল করা যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের বিকাশ যেদিকেই হোক না কেন, এটা স্পষ্টভাবেই বলা উচিত যে, বর্তমানের নেতৃত্বকারী লাইনটি হলো একটি বুর্জোয়া লাইন, এটা কোনো সর্বহারা লাইন নয়, এটা কোনো বিপ্লবী লাইন নয়। এই বুর্জোয়া লাইনের বর্জন ব্যতীত সর্বহারা বিপ্লব নেপালে আর এগিয়ে যেতে পারে না। *

নেপাল পার্টির প্রাধান্যকারী লাইনের এই অধঃপতন ও মালেমা থেকে সরে পড়া শুরু হয়েছিল সুস্পষ্টভাবে '২১-শতকের গণতন্ত্র' গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। সেটা হলো বাস্তবে সর্বহারা একনায়কত্বের বিপ্লবী মার্কসবাদী তত্ত্বের বিপরীতে বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব। তৃতীয় বিশ্বের দেশে এটা 'প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থা'র নামে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সংসদীয়বাদের লেজুরবৃত্তি করে, উন্নত বুর্জোয়া দেশগুলোতে এটা হলো সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে এটা পুঁজিবাদের পথগামী লাইনকে প্রকাশ করে। অবশ্যই আজকের যুগে এই ধরনের অভিধা নগ্নভাবে সে ধারণ করে না। সেকারণে '২১-শতকের একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র'– এই শিরোনামে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

– নেপাল পার্টির বর্তমান প্রাধান্যকারী লাইনের এই অধঃপতন স্বভাবতই রিম-এর এক প্রকৃত ও গুরুতর সংকট ডেকে এনেছে। পেরু-পার্টি রিম-এর প্রতিষ্ঠা থেকেই কখনো রিম-এর সাথে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ কোনো পার্টি ছিল না। কিন্তু বিপরীতে নেপাল পার্টি রিম-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য সদস্য ছিল। বিগত দশকের শেষ থেকেই রিম-কমিটিতে তার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল।

** থিসিস রচনার পর আরো দুই বছর পার হয়েছে। এ সময়ে নেপাল পরিস্থিতিতে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। বিগত এ সময়ে উপরোক্ত আলোচনা ও মূল্যায়ন আরো বেশি করে সঠিক বলে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। এর মাঝে নেপাল-পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের সংগ্রাম এই পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে যে পার্টি প্রায় ভাঙনের মুখে। পার্টির অভ্যন্তরস্থ আন্তরিক বিপ্লবীরা একটি সার্বিক বিপ্লবী লাইন বিনির্মাণ ও বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার প্রাণপন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে মনে হয়। এর পরিণতিতে নেপালে পুনরায় বিপ্লবী শিখা প্রজ্জ্বলিত হবার একটা আশাবাদ দেখা যায়। যদিও পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না– সিসি/অক্টোবর,'১১।*

'কমপোসা' *(দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটি)*-তেও তার নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। এ অবস্থায় নেপাল পার্টির বর্তমান নেতৃত্বকারী লাইনের এই অধঃপতন সমগ্র মাওবাদী আন্দোলন, রিম এবং বিশেষভাবে আমাদের দক্ষিণ এশীয় এই অঞ্চলের বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের পথে এক নির্ধারক আঘাত হেনেছে।

* প্রথমে ৯০-দশকে পেরুর বিপর্যয় ও পিসিপি দাবীদার এমপিপি'র ক্রমান্বয়িক রিম-বিরোধী ধ্বংসাত্মক ভূমিকা, এবং তারপর নেপালের প্রধান লাইনের অধঃপতন– আন্তর্জাতিক মাওবাদী অগ্রসর কেন্দ্র হিসেবে রিম-এর ভূমিকাকে আগের পর্যায়ে আর অব্যাহত রাখতে সক্ষম নয়। রিম-এর দুই দশক-ব্যাপী কাজের সামগ্রিক সারসংকলনের ভিত্তিতে নতুন ও উচ্চতর স্তরে রিম-কে পুনর্গঠিত করা ব্যতীত বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্বদান ও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না– এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু মৌলিক প্রশ্নকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে, তাকে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। প্রথমত, রিম গঠনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরতে হবে; দ্বিতীয়ত, দুই দশক-ব্যাপী রিম-কমিটির নেতৃত্বে প্রধানত/মূলত ইতিবাচক অগ্রগতি ও ভূমিকাকে তুলে ধরতে হবে; তৃতীয়ত, পেরু পরিস্থিতি ও পেরু-পার্টির টুএলএস-এ রিম-কমিটির প্রধানত/মূলত বিপ্লবী অবস্থানকে কার্যকর রাখতে হবে; চতুর্থত, নেপাল পার্টির চলমান লাইন দ্বারা 'সর্বহারা একনায়কত্ব' কার্যত বর্জন ও তার অধঃপতনকে চিহ্নিত করতে হবে; পঞ্চমত দুই দশকব্যাপী রিম-এর দুর্বলতাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করতে হবে এবং কাটিয়ে তুলতে হবে; এবং ষষ্ঠত, পেরু ও নেপাল পার্টির উপরোক্ত নেতিবাচক বিকাশের কারণ অনুসন্ধান এবং সে প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিগত শতকের মালেমা আন্দোলনের সারসংকলন কাজকে এগিয়ে নিয়ে মতাদর্শের বিকাশের প্রশ্নটিকে হাতে তুলে নিতে হবে।

* ইতিমধ্যে আরসিপি'র পক্ষ থেকে বিগত কমিউনিস্ট আন্দোলনের বেশ কিছু তাত্ত্বিক ও লাইনগত সারসংকলন উত্থাপন করা হয়েছে যাকে তারা 'এ্যাভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণ' (Avakian's New Synthesis) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা বিগত শতকের মালেমা-বাদী আন্দোলনের সাথে এক ধরনের রাপচার ঘোষণা করেছে। সুতরাং তারা একে মালেমা'র বিকাশ বলেও উল্লেখ করছেন।

– মালেমা'র বিকাশের প্রশ্নটি আজ উঠছে কেন তার উপর কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। কয়েকটি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ যার পুনঃপর্যালোচনার যুক্তি রয়েছে। বিগত শতকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পুঁজিবাদে অধঃপতিত হলো তখন মাওসেতুঙ শুধু এই সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করলেন তা নয়,

তিনি এই অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি স্ট্যালিনের সারসংকলন করলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে বিকশিত করলেন– যাকে মাওবাদ বলে আমরা অভিহিত করি। তিনি জিপিসিআর পরিচালনা করলেন চীনে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করবার জন্য। কিন্তু মাও-এর মৃত্যুর পর পরই চীনও পুঁজিবাদে অধঃপতিত হয়। এটাকি অনিবার্য ছিল, নাকি আমাদের কোনো ভুল বা অসম্পূর্ণতা সেখানে কাজ করেছে? সুতরাং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও নীতি/পদ্ধতির পুনঃপর্যালোচনা এবং তার বিকাশের প্রশ্ন এখান থেকে চলে এসেছে, যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, এসেছে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের বিকাশের প্রশ্নটি। লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। এবং সে তত্ত্ব অনুসারে স্বভাবত প্রতীয়মান হয় যে, অচিরেই আরো বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তও হতে বাধ্য। যা তার মৃত্যুকে কাছিয়ে আনবে। অথবা বিপ্লবের অগ্রগতি সেরকম বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে দেবে। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ৬০ বছর পার হলেও আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ আর হয়নি। ৭০-দশকে মাওবাদীদের দ্বারা বিশ্ব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যুদ্ধ বা বিপ্লবকে যেভাবে আসন্ন বলে মনে করা হয়েছিল সেভাবে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যায়নি। বিশ্বযুদ্ধ বা বিপ্লব ছাড়াই অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েতের পতন হয়েছে, যদিও তার পিছনে প্রক্সিযুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধ-উপাদানই কাজ করেছে।

এছাড়া পেরুর বিপর্যয় ও নেপালের প্রধান লাইনের পথচ্যুত হবার পেছনে খোদ মতাদর্শের কোনো দুর্বলতা রয়েছে কিনা যার সংশোধন বা বিকাশ প্রয়োজন সে প্রশ্নও উঠে এসেছে।

এই প্রশ্নগুলোকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু এসবের সুগভীর ও বিচক্ষণ পর্যালোচনা প্রয়োজন। যেকোনো তড়িঘড়ি ও ভাসাভাসা মূল্যায়ন বেশি খারাপের দিকে চালিত করতে পারে এবং বৃহত্তর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। তবে একই সাথে ধাপে ধাপে কিছু নতুন ধারণাকে অবশ্যই বিকশিত করতে হবে, যা না করলে আমরা বিকাশমান পরিস্থিতি ও প্রয়োজনকে মোকাবেলা করতে পারবো না।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে কমরেড এ্যাভাকিয়ানের "নয়া সংশ্লেষণ" উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এর উপর খুবই গুরুত্ব সহকারে ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী অধ্যয়ন-গবেষণা-পর্যালোচনা-বিতর্ক প্রয়োজন। বিশেষত আমাদের দেশে বিগত শতকের আন্দোলনে টুএলএস পরিচালনার ক্ষেত্রে যে গুরুতর সংকীর্ণতাবাদ, একতরফাবাদ ও বিভেদবাদ দেখা গিয়েছিল, যা কিনা এদেশে একটি সামগ্রিক সঠিক বিপ্লবী লাইন গড়ে তুলতে না পারা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় বিরাট ভূমিকা রেখেছিল, সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু আমাদের আন্দোলন তার প্রথম যুগের উত্থানের মৌলিক সমস্যাগুলো থেকে এখনো বেরুতে ব্যর্থ হয়েছে, সেগুলো এখনো আন্দোলনে বিরাজ করছে পুরনোদের

মাঝে এবং নতুনদের মাঝেও, যেহেতু বিশেষত পেরুর এ জাতীয় ভ্রান্তিগুলোর এক ব্যাপক প্রভাব এদেশে এখনো রয়ে গেছে, এবং যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে রিম এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তার পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়নি বা তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপও পার হতে পারেনি, এবং আন্তর্জাতিকভাবে বহুবিধ ভুল লাইনগুলো বিবিধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে রয়েছে, তাই, এই সমস্যা সম্পর্কে অতিশয় সতর্কতা প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহেই রিম-কে নতুন ও উচ্চতর লেবেলে পুনর্গঠিত করতে হবে। এর অর্থ হলো, রিম তার প্রথম ঐতিহাসিক স্তর পার হয়ে এসেছে। উচ্চতর স্তরে রিম-কে পুনর্গঠন করার জন্য প্রতিটি দেশের প্রকৃত মাওবাদী বিপ্লবীর পাশাপাশি আমাদের দেশের মাওবাদীদেরকেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

* বিশ্ব আন্দোলনের এই বিকাশের সাথে আমাদের দেশের আন্দোলনের পরিস্থিতি অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। এটা সম্ভবত অনিবার্য্য ছিল না, কিন্তু এটা বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয়ও নয়। আমাদের আন্দোলনের বিগত শতকের স্তর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন ইতিপূর্বেই পেশ করা হয়েছে তার মাঝে বিশ্বব্যাপী মাওবাদী আন্দোলনের সাধারণ কিছু সমস্যার আলোচনাও রয়েছে, যদিও তা দেশীয় প্রেক্ষিতে করা। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা এদেশের মাওবাদী আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করতে চাই, যা অবশ্যই আন্তর্জাতিক পুনর্গঠনেরও অংশ হবে। তাই, সংক্ষিপ্তসারে আমাদের এখনকার লাইনগুলোর কিছু মৌলিক রূপরেখা আমাদেরকে এখন তুলে ধরতে হবে।

– লাইনগত আলোচনা, সারসংকলন ও মূল্যায়নের উপরোক্ত উপস্থাপন থেকেই আমাদের আজকের লাইনগত পথনির্দেশ বেরিয়ে আসে। তথাপি তাকে সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উত্থাপন করা হলো– তার নির্যাসটিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

মৌলিক লাইনগত অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

মতাদর্শ/মতবাদ

সর্বহারা শ্রেণি নিজ শ্রেণি ও অন্য সকল নিপীড়িত শ্রেণি-জাতি-সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর মুক্তি, তথা সমগ্র মানবজাতিকে শ্রেণি-বিভক্তি ও মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য মার্কস-পূর্ব যুগেই শ্রেণিহীন ও শোষণহীন একটি সাম্যের সমাজের কল্পনা ও ধারণা গড়ে তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসের সহযোগিতায় তৎকালীন পুঁজিবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এই সাম্যের, অর্থাৎ, কমিউনিজমের আদর্শকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। এভাবে কমিউনিজমের আদর্শ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায় এবং তার প্রধান স্থপতি মার্কসের নামানুসারে মার্কসবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে লেনিন মার্কসবাদকে যুগোপযোগীভাবে বিকাশের দায়িত্ব পালন করেন, সর্বহারা বিপ্লবের স্বপ্নকে রাশিয়ায় বাস্তবে রূপ দেন, একটি বিজ্ঞানমুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দেন এবং এভাবে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর মতবাদ মার্কসবাদকে নতুন স্তরে বিকশিত করেন, যা পরিচিতি পায় লেনিনবাদ নামে। লেনিন-পরবর্তীকালে মহান স্ট্যালিন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্রতকে রাশিয়ায় ও বিশ্বে নেতৃত্ব দেন এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝিতে বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক এক বিশ্বকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেন।

কিন্তু স্ট্যলিনের মৃত্যুর পর রাশিয়া পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এ অবস্থায় মাও চীনের সমাজতন্ত্রকে নতুন এক পথে এগিয়ে নেবার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রং বদলাবার এই নতুন সমস্যার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত সমাধান করেন। তদুপরি ইতিপূর্বেই মাও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত কৃষি-প্রধান পশ্চাদপদ দেশে সর্বহারা বিপ্লবের এক সারি সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এভাবে মাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরেক ধাপ বিকশিত করেন এবং তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ, তথা মাওবাদে উন্নীত করেন।

তাই, বর্তমান সময়ে কমিউনিজমের মতাদর্শ মালেমা-র মধ্য দিয়ে, বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলি ও প্রয়োগের একসারি বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নিজেকে প্রকাশ করে। আজকে যিনি মাওবাদ গ্রহণে নারাজ তিনি কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেননি। হয় তিনি এ সম্পর্কে অজ্ঞ। নতুবা কোনো না কোনোভাবে এর বিরোধী। মাওবাদকে সামগ্রিক বিরোধিতা করলে বিপ্লবী থাকা যায় না, মাওবাদকে সচেতনভাবে গ্রহণ না করলে বিপ্লবী মতাদর্শে সজ্জিত হওয়া যায় না এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্লবকে ধারণ করা যায় না।

– এদেশের প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিংশ শতকে ৬০-দশকের শেষার্ধে মাওবাদকে গ্রহণের মাধ্যমে এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের সে সময় পর্যন্ত সর্বশেষ বিকাশকে গ্রহণ করে নেন, যা যুগান্তকারী তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল। যদিও তখন একে 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' বলা হতো, কিন্তু তা ছিল মতবাদের তৃতীয় স্তরে বিকাশেরই স্বীকৃতি। এভাবেই এদেশে মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যা হলো মালেমা-আন্দোলন, তথা বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন। যা প্রকৃত ও বিপ্লবী কমিউনিজমের আদর্শের ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

* বিগত শতকের ৬০/৭০-দশকে মালেমা আয়ত্ত করা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সে সময় থেকেই এদেশের মাওবাদী আন্দোলন মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনে যে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন শিক্ষাগুলোকে এদেশে নিয়ে এসেছিল তাকে সংক্ষিপ্তভাবে নীচের মত করে উল্লেখ করা যায়–

i) মাওবাদকে (সেসময়ে মাওবাদকে 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা' বলা হতো) মতবাদ বিকাশে তৃতীয় স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা, যার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব (জিপিসিআর)।

ii) সর্বহারা শ্রেণির স্বতন্ত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করার মাধ্যমে বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তির অতীত ইতিহাসের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা।

iii) সংসদীয়বাদ ও ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং তার সাথে বিপ্লবী বিচ্ছেদ ঘটানো।

iv) বিপ্লবের স্তরকে নয়াগণতান্ত্রিক বলে সূত্রায়িত করা।

v) গ্রামাঞ্চল ও কৃষককে কাজের প্রধান ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা ও তার প্রয়োগে নিয়োজিত হওয়া।

vi) দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে, যার নির্ধারক দিক হলো আগে গ্রামে ঘাঁটি গড়ে তোলা, অর্থাৎ, গ্রাম মুক্ত করা, মুক্ত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করা, এবং পরিশেষে শহর দখল করা– একে বিপ্লবের পথ বলে নির্ধারণ করা।

vii) গোপন বিপ্লবী পার্টি গঠনকে আঁকড়ে ধরা।

viii) পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্ট– বিপ্লবের এই তিন যাদুকরী হাতিয়ারকে তুলে ধরা।

ix) গেরিলা যুদ্ধের রণনৈতিক তাৎপর্যকে গ্রহণ করা ও প্রয়োগে নিয়ে যাওয়া।

– ইত্যাদি।

– উপরোক্ত মতাদর্শগত-রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক বিষয়গুলো ছিল ঐতিহাসিক তৎপর্যসম্পন্ন, যা মাওবাদ গ্রহণ করা ব্যতীত এদেশে আসতে পারতো না। এসবকে এদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য মাওবাদী আন্দোলনের এই প্রথম পর্বের মাওবাদী নেতৃত্বগণ তাত্ত্বিক ও বাস্তব সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, যাকে কখনো বর্জন করা যাবে না, এবং এখনো সেগুলোকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এসবই ছিল এদেশে বাস্তবে মাওবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

– পরবর্তীকালে মাওচিন্তাধারার বদলে মাওবাদ সূত্রায়নটি এদেশের প্রকৃত মাওবাদীরা সকলে গ্রহণ করার পর মতবাদকে আমরা মাওবাদ বলে উল্লেখ করে থাকি।

এটা শুধু সূত্রায়নের বদল ছিল না, এটা মতবাদের এই তৃতীয় স্তর সম্পর্কে উচ্চতর উপলব্ধিকেও প্রকাশ করে। যাকিনা স্ট্যালিন সম্পর্কে মাও-এর সারসংকলনকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এবং জিপিসিআর-কালে মাও-এর সকল লড়াইগুলো, যথা লিউ-লিন-তেং বিরোধী লড়াই, বিশেষত মাও-এর শেষ লড়াই, অর্থাৎ, তেংবিরোধী লড়াই-এর শিক্ষাকেও সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এছাড়া মাও-মৃত্যুপরবর্তীকালে গণযুদ্ধ সম্পর্কে মাওবাদীদের উপলব্ধিও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, যাকিনা মতবাদেরই অংশ। গণযুদ্ধের বিশ্বজনীনতা মাওবাদেরই অংশ– এটা না বুঝলে ও গ্রহণ না করলে মাওবাদ সম্পর্কে উপলব্ধির ঘাটতি থেকে যাবে।

– মালেমা হলো একটি অখন্ড সমগ্রতা। আজকে যখন আমরা আমাদের মতবাদকে মালেমা বলে তুলে ধরি, তখন তাকে মার্কস, লেনিন ও মাও-এর অবদান রূপে পৃথকরূপে প্রকাশ করা যায় না, কারণ, মালেমা হলো সংশ্লেষিত সমগ্র। তাই, মতবাদের শেষ বিকাশটিকে পৃথক করে তার সাথে 'প্রধানতঃ' বা 'বিশেষতঃ' যুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ, মতবাদকে "প্রধানত/বিশেষত মাওবাদ" বলে উল্লেখ করা যায় না। আমাদের মতবাদ একটি, তিনটি মতবাদের যোগফল নয়।

মার্কসবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ– এই তিনটি শব্দমালা আমাদের মতবাদ বিকাশের তিনটি স্তরকে প্রকাশ করে, যার মাঝে অবশ্যই পরেরগুলো আগেরগুলোর চেয়ে উচ্চতর। আমরা যখন মাওবাদ বলি, তখন মালেমা-কেই বুঝিয়ে থাকি, নিছক মাও-এর অবদানগুলোকে বুঝাই না। আজকের সর্বহারা মতবাদ মালেমা-কে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওবাদ– এভাবে তিনটি মতবাদে বিশ্লেষণ করা যায় না। যদিও সর্বহারা শ্রেণীর এই তিন শিক্ষাগুরুর তিনটি সময়ের অবদানকে পৃথক পৃথক আলোচনা করা যেতে পারে। মালেমা-কেও নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন, তার তিনটি অঙ্গ, যথা, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ও দর্শন– এই তিনটি অংশে।

– প্রতিটি দেশেই মালেমা'র সৃজনশীল প্রয়োগ করতে হয়। তার যান্ত্রিক প্রয়োগ হয় না এ কারণে যে, প্রতিটি দেশের বিপ্লবের সময়কাল ও সে দেশের বাস্তব অবস্থার

বিশেষত্ব রয়েছে। সেই বিশেষ অবস্থায় মালেমা'র প্রয়োগ থেকে নির্দিষ্ট দেশের উপযোগী কিছু শিক্ষা ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেশেও বিগত শতকে মাওবাদী আন্দোলনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা মূল্যবান, তার শিক্ষামালাকে ছেঁকে তুলে আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা আমরা ইতিমধ্যে অনেকটাই করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে প্রতিনিয়তই মালেমা'র তত্ত্ব ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়। কারণ, মালেমা আমাদের মতবাদ। এ সমস্ত আংশিক/খণ্ডিত/দেশজ শিক্ষা আমাদের মতবাদ নয়। যদিও এ সকল শিক্ষা আমাদের মতবাদ প্রয়োগেরই ফসল, এবং নির্দিষ্ট পরিসরে তার মূল্য দিতে হবে।

কিন্তু বিগত মাওবাদী আন্দোলনে দেশে, এবং বিদেশে 'জাতীয়' অভিজ্ঞতাগুলোকে, বা তার ইতিবাচক শিক্ষাগুলোকে মতবাদের সাথে একাকার করে উত্থাপন করার গুরুতর ভুল দেখা গেছে। এটা "সিএম-শিক্ষা"-র ক্ষেত্রে আগে পরে যেমন হয়েছে, তেমনি পেরু-গণযুদ্ধের পর থেকে 'গনজালো চিন্তাধারা', বা আরো পরে 'প্রচণ্ড পথ' আকারে এসেছে। এসবের অনুসরণে আমাদের দেশে 'এসএস-চিন্তাধারা/শিক্ষা' রূপেও এইসব শিক্ষাকে মতবাদের সাথে যুক্ত করে দেখানোর ভুল চেষ্টা দেখা যায়।

এটা আমাদের মতবাদিক মৌলিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় 'চিন্তাধারা' বা 'পথ' বা 'শিক্ষা'-র আগে "প্রধানতঃ" যুক্ত করে বা না করে কার্যত একেই মতবাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এটা কার্যত মালেমা-কে সরিয়ে দেয়, যার বিষময় ফল আমরা পেরু ও নেপালে দেখেছি। আমাদের দেশেও পূবাকপা'র সুদীর্ঘদিনের লাইনগত অচলাবস্থার ক্ষেত্রে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

– তথাকথিত "মহান নেতৃত্ব" তত্ত্ব আমাদের মতবাদের থেকে একটি বিচ্যুতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই, যাকিনা লিনপন্থার মধ্য দিয়ে মাওবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করেছিল।

এটা সত্য যে, বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণী বা জনগণ নির্ধারক ভূমিকা রাখলেও সেখানে অগ্রগামী শক্তি হিসেবে পার্টির প্রয়োজন হয়। পার্টিতে একসারি নেতৃত্ব থাকেন, যার মাঝে আবার একজন প্রধান ভূমিকা রাখেন। এটা হলো একটা বস্তুগত নিয়ম, যাকে মার্কসবাদীরা অস্বীকার-তো করেই না, বরং তার বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। আর এটাও সত্য যে কোনো কোনো নেতৃত্ব বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণ ও বিপ্লব পরিচালনায় অসাধারণ অবদান রাখার মধ্য দিয়ে মহান নেতৃত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। এই ধরনের নেতৃত্বকে রক্ষা করা ও ঊর্ধ্বে তুলে ধরা বিপ্লবের স্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কিন্তু তথাকথিত "মহান নেতৃত্ব তত্ত্ব"-টি লাইন, পার্টি ও জনগণের ঊর্ধ্বে নেতৃত্বকে স্থাপন করে। তারা নেতৃত্বকে পীরের আসনে স্থাপন করে এবং তাকে কার্যত ভুলের ঊর্ধ্বে বলে যুক্তি হাজির করে। এটা কার্যত আমাদের মতবাদের মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও ধর্মবাদী ব্যক্তিপুজাকে সামনে

নিয়ে আসে, যা আমাদের বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে পেরু পার্টির প্রতিনিধিত্বের দাবীদার কিছু শক্তি মতবাদের নামে এই ধরনের "মহান নেতৃত্ব তত্ত্ব" আমদানির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি করেছে।

– আর সবকিছুর মত মালেমা-ও বিকাশশীল। কমিউনিজমের এ আদর্শ মার্কসবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদে পরিণত হয়েছে এই বিকাশের পথ ধরেই।

সর্বহারা শ্রেণীর মতবাদ হলো আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাই, এর বিকাশ হতে পারে তার আন্তর্জাতিক সারবস্তুকে গুণগতভাবে বিকশিত করার মাধ্যমেই।

এটা স্বাভাবিক যে, এ মতাদর্শ, আর সব বিষয়ের মত হঠাৎ করে নতুন স্তরে বিকশিত হতে পারে না। ছোট ছোট উলম্ফন দ্বারা এর উচ্চতর স্তরে বিকাশ চিহ্নিত। যেমন, মাও বহুপূর্বেই নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করেছিল বিশ্বজনীন অবদান দ্বারা। নয়া গণতন্ত্র নিছক চীনের জন্য প্রযোজ্য কোনো তত্ত্ব ছিল না। এটা বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর অস্ত্রভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল নতুন সমরাস্ত্র দ্বারা। তাই, এটা গুণগত তাৎপর্যসম্পন্ন অবদান ছিল। এবং ৪০/৫০-দশকেই এই অবদান বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বারা স্বীকৃত হবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও মাও তখনো পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তার তিনটি অঙ্গেই সামগ্রিকভাবে নতুন গুণগত নতুন স্তরে বিকশিত করেছিলেন তা বলা যাবে না। যা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন ৬০/৭০-দশকে জিপিসিআর কালে। মাত্র তখনই আমরা মালেমা-কে পাই, তার আগে নয়।

বিশ্ববিপ্লবের অংশ হিসেবে চালিত ও সর্বহারা বিপ্লবী লাইনে সজ্জিত যে বিপ্লবগুলো বিভিন্ন দেশে তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা অর্জন করে, সেগুলো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দ্বারা সর্বহারা শ্রেণির বিশ্ব সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করে। তার মতাদর্শের বিকাশে অবদানও রাখে। সেইসব শিক্ষা থেকে বিশ্বের সকল প্রান্তের সর্বহারা শ্রেণিকেই শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে এ সমস্ত শিক্ষাই মতবাদ হয়ে যায় না।

– সুতরাং আজ যখন সারা বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি সার্বিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, এবং স্বভাবতই বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদ, সংসদীয়বাদ ও সংস্কারবাদকে তুলে ধরা হচ্ছে জোরালোভাবে, এবং জাতীয়তাবাদকে মদদ দেয়া হচ্ছে, তখন মালেমা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পুনরায় জোরালোভাবে পরিচালনা করতে হবে।

* কিন্তু ইতিমধ্যেই মালেমা'র বিকাশের প্রশ্নও এসেছে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, আলোচনায় পরেও আরো উঠে আসবে যে, মাও-পরবর্তীকালে মালেমা'র বিকাশই তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়েছে। রিম-প্রতিষ্ঠা, পেরুর গণযুদ্ধ, নেপালের গণযুদ্ধ ও বিপ্লবের বিপুল অগ্রগতি– এসবই নতুন

নতুন শিক্ষা ও উচ্চতর উপলব্ধিকে মালেমা'র সাথে যুক্ত করেছে। মাওবাদ সূত্রায়ন নিজেই তার একটি প্রকাশ। তাই, মালেমা'র ৬০/৭০-দশকের উপলব্ধিতে আটকে থাকলে আমরা ভুল করবো।

– কিন্তু ইতিমধ্যেই আরো গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তাহলো, বিগত শতকের বিপ্লবের পরাজয়ের সারসংকলনের প্রশ্ন, যার কেন্দ্রে রয়েছে সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের প্রশ্নটি। সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার সারসংকলনের নামে ইতিহাসে বারংবার বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আমদানি করা হয়েছে সর্বহারা একনায়কত্বকে বাতিল করার মাধ্যমে। ইতিমধ্যে নেপালে এটা ঘটে চলেছে। তাই, এ সম্পর্কে সতর্ক না থেকে, এই বুর্জোয়া ডান লাইনকে কাঠখোট্টা সংগ্রাম না করে এই প্রশ্নটিতে আদৌ বিপ্লবী প্রবেশই সম্ভব নয়।

কিন্তু পাশাপাশি অন্য বিচ্যুতি– যা কিনা কার্যত মালেমা-কে বিকাশশীল বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করা থেকে দূরে সরে থাকে, এবং বিগত শতকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্বিক পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে বিরোধিতা করে, তা থেকে শিখতে চায় না, এমন বিশুদ্ধতাবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি থেকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

– সমাজতন্ত্র কেন পরাজিত হলো– এটা আজকে পর্যালোচনার একটা মৌলিক প্রশ্ন হতে পারে। রাশিয়ায় পরাজয়ের সারসংকলন করে মাও জিপিসিআর লাইনকে এনেছিলেন। যা স্ট্যালিনের মৌলিক ভুলকে উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল। কিন্তু জিপিসিআর চলাকালে মাও-এর মৃত্যু, এবং পরপরই চীনের অধঃপতন জিপিসিআর-এর শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নেবার দাবি করতে পারে। মাওবাদী শিবিরে ইতিমধ্যেই এর সারসংকলনমূলক কিছু মতামত উত্থাপিত হয়েছে যা আমরা পর্যালোচনা করতে বাধ্য।

– সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বেরও বিকাশ প্রয়োজন কিনা– সেটি আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন আকারে আসতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক নিয়ম এখনো কার্যকর। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সুদীর্ঘ ৬০ বছর কোনো বিশ্বযুদ্ধ হয়নি যা কিনা ৬০/৭০-দশকে আসন্ন বলে মনে করা হচ্ছিল। বিপ্লবও যুদ্ধকে ঠেকায়নি। কিন্তু অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পতন হয়েছে। এটা ঠিক যে, আফগান যুদ্ধ ব্যতীত সোভিয়েতের পতন ঠিক এভাবে হতো তা বলা যায় না। কিন্তু এটাও সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এড়াতে সক্ষম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের নয়াউপনিবেশিক পলিসি'র সাথে এর কী সম্পর্ক রয়েছে, তা-ও দেখা প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদের সংকট ও তার মীমাংসার মৌলিক নিয়মে নতুন কী উপাদান সংযুক্ত হয়েছে– সেটা ভালভাবে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ৩য় বিশ্বের দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কী ধরনের মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়েছে বা ঘটায়নি, এবং সেগুলো এ ধরনের দেশে বিপ্লবের রণনীতি-রণকৌশলকে কতটা কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার উপর সুগভীর আলোচনা প্রয়োজন হতে পারে।

– এমনকি দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্নে মালেমা'র মৌলিক বিকাশের প্রসঙ্গ উঠেছে।

এইসব মৌলিক প্রশ্নাবলিকে আমাদের দেশেও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। এসব শুধু বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়ই নয়। বস্তুত এ জাতীয় বিষয়াদির মীমাংসার উপর বর্তমানকার বিপ্লবের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎও ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে।

সুতরাং মালেমা'র বিকাশের প্রশ্নটিকে আমাদের মতবাদিক আলোচনায় অবশ্যই আনতে হবে। এমনকি এর উপর যা নির্ভর করে সেই মালেমা-কে ছাড়িয়ে যাবার প্রশ্নটিও।

– কিন্তু মালেমা'র বিকাশের এই প্রশ্নটিকে একাডেমিক বা নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় করলে তাহবে মহাবিপর্যয়কর, যার শক্তিশালী প্রবণতা বিপ্লবের এই বিপর্যয়কালে থাকতে বাধ্য। সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লব, তথা বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামকে ভিত্তি না করে বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মালেমা'র বিকাশের আলোচনা হবে মূলত মধ্যবিত্ত/আলোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী আলোচনা। কিন্তু প্রগতিশীল বা মাওবাদী বুদ্ধিজীবী, আর বিপ্লবী কমিউনিস্ট এক কথা নয়। মালেমা সর্বহারা বিপ্লবের বিজ্ঞান, সর্বহারা শ্রেণির মতবাদ, এবং শুধু সেটাই সে হতে পারে।

– একইসাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, মালেমা-বিকাশের এই প্রশ্নটা নিছক বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার চলতি অভিজ্ঞতার সারসংকলনের বিষয় নয়। এটা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের বিকাশের বিষয়ও বটে; এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তার জগতের কাজও বটে– যার পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সাধারণ বাস্তব বিপ্লবী অনুশীলনের থেকে। সেক্ষেত্রে বিপ্লবী কমিউনিস্ট ছাড়াও মাওবাদী বা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকবৃন্দের অভিমত ও গবেষণার সাথে মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বকে বাতিল করা যাবে না। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে, যদি তারা বিপ্লবের পক্ষে থাকেন তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাও সম্ভব।

– সুতরাং আজকের বিশ্ব ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে মালেমা'র পুনঃঅধ্যয়ন ও পুনঃআলোচনাকে বাদ করে দেয়া যাবে না, যদিও মালেমা-কে ভিত্তি করেই এটা সম্ভব, তার মূল নীতিকে রক্ষার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ সাধন সম্ভব। আমাদের দেশের এই নতুন স্তরের মাওবাদী আন্দোলনকে, বিশ্ব আন্দোলনের সাথে সংযুক্তভাবে, নীতিকে বর্জন করার সংশোধনবাদকে সংগ্রাম করার পাশাপাশি তাকে বিকশিত করার দীর্ঘস্থায়ী কর্মযজ্ঞেও অবশ্যই সামিল হতে হবে।

গণযুদ্ধ

মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকে বিপ্লবের পথ, তথা রণনীতি হিসেবে আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং কিছু আগে বা পরে সবগুলো প্রধান মাওবাদী ধারাই সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছিল।

বিগত শতকে আমাদের দেশে মাওবাদী নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্বে যে বীরোচিত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, তার অভিজ্ঞতা অতিশয় মূল্যবান। এতে যেমন

রয়েছে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা, তেমনি রয়েছে বহু নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের নতুন ও পরিবর্তিত বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতিতে নতুন এক স্তরে মাওবাদীদের সৃজনশীলভাবে গণযুদ্ধের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে হবে।

এ সময়কালে বিশ্বের আরো অন্যান্য প্রান্তেও মাওবাদী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গণযুদ্ধ গড়ে উঠেছিল– কোনোটা এগিয়ে গেছে সফলতার সঙ্গে, কোনোটা অঙ্কুরেই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মাঝে ভারত, ফিলিপিন, পেরু ও নেপাল গণযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে মাওবাদের উচ্চতর অবস্থান ও উপলব্ধির ভিত্তিতে পরিচালিত প্রথমে পেরু ও পরে নেপালের অভিজ্ঞতা মাওবাদী গণযুদ্ধের ভান্ডারে নতুন ও উচ্চতর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছে। তাই, আজকে আমাদের দেশে নতুন পর্যায়ের গণযুদ্ধে এইসব অগ্রসর অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। আমরা এখন গণযুদ্ধের যে সামগ্রিক লাইন ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি তা দেশীয় ও বৈদেশিক এ সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্যাসকে যতটা সম্ভব ধারণ করার প্রচেষ্টা দ্বারাই রচিত।

* তবে বিগত শতকে এবং এ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিগত অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে গিয়ে আন্তরিক বিপ্লবীদের মাঝে যেসব বিচ্যুতিপূর্ণ সূত্রায়ন গড়ে ওঠে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। কারণ, এইসব সূত্রায়ন গণযুদ্ধকে গ্রহণ করে নিলেও বাস্তবে গণযুদ্ধের তত্ত্বের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও রণনীতি থেকে বিচ্যুতি গড়ে তোলে, যে সম্পর্কে ভাল সচেতনতা প্রয়োজন।

– "যুদ্ধ-পূর্ব সস-পর্যায়" সূত্রায়নের ভুল সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি, যা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ৯০-দশকে উত্থাপিত হয়েছিল। এ লাইন যুদ্ধ ও তার প্রস্তুতির বিষয়টিকে সমন্বয়বাদী ধরনে গুলিয়ে ফেলে গণযুদ্ধ প্রশ্নে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছিল।

– ভারতের বিপ্লবীরা ৮০-দশক থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে, অথবা তার যথেষ্ট বিকাশের পরও "সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী সংগ্রাম" নামে একটি সূত্রায়ন ব্যবহার করতে থাকেন। এর প্রভাবে আমাদের দেশে পূবাকপা'ও এই সূত্রায়নকে কিছুকাল ধরে ব্যবহার করছে। বিশেষত ৯০-দশকে পেরু-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রিম-কমিটি সামরিক লাইনে এই সূত্রায়নের সমস্যার উপর সংগ্রাম পরিচালনা করে, যাকে আমরা সঠিক মনে করি। "সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী সংগ্রাম"-এর সূত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সংগ্রামের রূপকে যতটা প্রকাশ করে, ততটা তা ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী রাজনীতি ও বিপ্লবী সামরিক লাইনকে প্রকাশ করে না। যা কিনা গণযুদ্ধের বিকাশে দুর্বলতা আরোপ করে।

– একইভাবে "গেরিলা অঞ্চল পরিপ্রেক্ষিত" (Guerrilla Zone Perspective) নামে আরেকটি সূত্র গড়ে ওঠে যা "ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু"– এই তত্ত্ব থেকে

কার্যত বিচ্যুত হয়। যদিও একথা খুবই গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সাধারণভাবে গেরিলা অঞ্চলের মধ্য দিয়েই আমরা ঘাঁটিতে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবো, এবং সেভাবেই পরিকল্পনা করতে হবে ও যুদ্ধকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হবে, যেক্ষেত্রে একতরফাবাদী বিচ্যুতি হতে পারে, বিশেষত আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে, এবং বিস্তীর্ণ গেরিলা অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ও রণনৈতিকভাবে "ঘাঁটি পরিপ্রেক্ষিত"-কেই তুলে ধরতে হবে। নতুবা তা মতাদর্শগতভাবে ক্রমান্বয়বাদ ও রাজনৈতিকভাবে সংস্কারবাদী ধরনের বিচ্যুতি গড়ে তুলবে যা সামরিকভাবেও যুদ্ধকে দুর্বল করে দেবে।

"সমান্তরাল ক্ষমতা" বা "দ্বৈত ক্ষমতা"-র সূত্রটি এভাবেই প্রয়োগবাদকে প্রকাশ করে এবং বিপ্লবী রাজনীতিকে দুর্বল করে। এক্ষেত্রে পেরু-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রিম-কমিটি উত্থাপিত "পুনর্দখল-পাল্টা পুনর্দখল" সূত্রটিই সঠিকভাবে আমাদের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

– আমাদের দেশে কিছু মাওবাদী ধারা কিছুকাল আগে থেকে "গ্রামে-শহরে যুগপৎ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল"-এর রণনীতির কথা বলে চলেছে। এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার সময় তারা দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ-র রণনীতির কথাও বলছে। এভাবে রণনীতির প্রশ্নে এটি একটি সমন্বয়বাদকে প্রকাশ করে যা দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের তত্ত্বকে দুর্বল করে দেয়। নেপাল পার্টি যে ফিউশন-তত্ত্বের কথা বলেছে তার সাথে এই সূত্রায়নের একটা বাহ্যিক মিল দেখা গেলেও বাস্তবে নেপাল-পার্টির তত্ত্বটিই এখনো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি।

– সশস্ত্র সংগ্রামের বর্তমান প্রাথমিক অবস্থায় "গেরিলা যুদ্ধকে গণযুদ্ধে পরিণত করুন"- এ জাতীয় একটি স্লোগান অন্য কিছু মাওবাদী ধারা (পূবাকপা-ধারার বিভিন্ন গ্রুপ) উত্থাপন করে থাকে। এটিও গণযুদ্ধ সম্পর্কে অস্পষ্টতাকে প্রকাশ করে। এই স্লোগান প্রকাশ করে যে, বর্তমান অবস্থায় গেরিলা যুদ্ধটি গণযুদ্ধ নয়। এটি একটি ভুল তাত্ত্বিক সূত্রায়ন, যা সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা থেকেই গণযুদ্ধের নিয়মকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোতে তাত্ত্বিকভাবে সচেতন হওয়া ও গণযুদ্ধের তত্ত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ও সমস্যাগুলোকে মূর্তভাবে উপলব্ধির উপর গণযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

এখন আমরা প্রয়োগগত ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় গণযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-পদ্ধতিগুলোর উপর আলোচনা করবো।

* পূর্বের অধ্যায়েই আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'গণযুদ্ধের বিশ্বজনীনতা' সম্পর্কে উপলব্ধির বিকাশকে আমাদের মতবাদের বিকাশ ও তার উপলব্ধির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আমরা গণ্য করি। সুতরাং, গণযুদ্ধ'র বিশ্বজনীন নিয়মগুলো

আমাদের দেশেও প্রযোজ্য– যদিও বিভিন্ন ধরনের দেশে এই নিয়মগুলো কার্যকর হবে সৃজনশীল প্রয়োগের দ্বারা, যান্ত্রিকভাবে নয়।

– আমাদের মত সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত, কৃষি ও কৃষক প্রধান, পশ্চাদপদ দেশে গণযুদ্ধের সাধারণ লাইন 'দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ'র বিশেষ লাইনে রূপ লাভ করে। যা চীন বিপ্লবে মাও সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তার মূল্যবান নীতি-কৌশলগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। বিশেষত পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধে অন্তত একটা পর্যায় পর্যন্ত এই সাধারণ নীতি/কৌশলগুলোর সফল প্রয়োগ হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের দ্বারা তা স্বীকৃত। এইসব নীতিমালার মৌলিক দিকগুলো আমাদের দেশেও প্রযোজ্য। যদিও তাকে এদেশের বিশেষ অবস্থাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য করে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

– তৃতীয় বিশ্বের দেশে গেরিলা যুদ্ধ রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন। তাই, আমাদের দেশেও গণযুদ্ধ প্রথমাবস্থায় গেরিলা যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করবে। এবং গণযুদ্ধের সমগ্র পর্যায়কালগুলো জুড়ে তার একটি মৌলিক গুরুত্ব থাকবে। তাই, গেরিলা যুদ্ধের সাধারণ নীতি/কৌশলগুলোও আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে হবে। যদিও সেটাও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যান্ত্রিকভাবে নয়।

সুতরাং গণযুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে তার নীতি/কৌশলগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আগে এখানে তুলে ধরবো। যা আমাদের গণযুদ্ধের সাধারণ নীতি/কৌশল হিসেবে আমাদেরকে সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে এবং প্রয়োগে যত্নবান হতে হবে।

** গণযুদ্ধের কিছু সাধারণ নীতি হলো–*

- কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে এবং তার বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতেই সত্যিকার গণযুদ্ধ গড়ে উঠতে পারে।
- রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, তথা শাসক শত্রুশ্রেণি ও তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাই হলো গণযুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য।
- উপরোক্ত বিপ্লবী রাজনীতিতে সচেতন জনগণ হলেন গণযুদ্ধের মূল শক্তি।
- ঘাঁটি হলো গণযুদ্ধের সারবস্তু। তাই, ঘাঁটি প্রতিষ্ঠাই হলো গণযুদ্ধের আশু লক্ষ্য। যাকে ভিত্তি করে দেশব্যাপী ক্ষমতা দখল করা যায়।
- মিলিশিয়া ও সশস্ত্র জনগণ হলো বাহিনীর ভিত্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে নিয়মিত/প্রধান বাহিনী।
- অস্ত্র নয়, মানুষই হলো গণযুদ্ধে নির্ধারক বিষয়।

- গণযুদ্ধে শত্রুর উন্নত অস্ত্রধারী, দক্ষ, কিন্তু ভাড়াটিয়া সেনাদলকে পরাজিত করে কম উন্নত অস্ত্রধারী, কিন্তু আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ ও বিপ্লবী রাজনীতিতে সচেতন জনগণের বিপ্লবী বাহিনী।
- শত্রুর অস্ত্রই আমাদের অস্ত্র– এটা হলো গনবাহিনী গড়া ও গণযুদ্ধ পরিচালনার মৌলিক নীতি ও প্রধান দিক।
- যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ শেখা– এটা হলো প্রধান পদ্ধতি।
- শত্রুকে জান, নিজেকে জান– তাহলে হাজারটা যুদ্ধ জয় করা যায়।

– ইত্যাদি।

** দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিম্নরূপ–*

- যুদ্ধের সমগ্র প্রক্রিয়াটি তিনটি রণনৈতিক স্তরে বিভক্ত, যথা– রণনৈতিক আত্মরক্ষা, রণনৈতিক ভারসাম্য ও রণনৈতিক আক্রমণাত্মক স্তর।
- গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক ও জনগণকে জাগরিত করা যায় ও সংগঠিত করা যায়।
- গেরিলা যুদ্ধ সমগ্র যুদ্ধ প্রক্রিয়াটিতে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, তা রণনৈতিক তাৎপর্য ধারণ করে।
- গেরিলা যুদ্ধ বিকাশের মধ্য দিয়ে চলমান যুদ্ধে পরিণত হয়, যা শেষ পর্যন্ত অবস্থান যুদ্ধে রূপ লাভ করে।
- শূন্য থেকে বাহিনী গড়ে তুলতে হয়। তাই, সুদীর্ঘদিন ধরে গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধের প্রধানতম রূপ।
- শত্রুর দুর্বল স্থান গ্রামাঞ্চলে অনুকূল জায়গায় আগে ঘাঁটি তৈরি করা এবং তারপর মুক্ত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করে পরিশেষে সমগ্র দেশের ক্ষমতা দখল করা হলো সাধারণ নীতি।

** গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশলের কিছু বিষয় নিম্নরূপ–*

- তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়ো, আমরা লড়ি আমাদের কায়দায়। জিততে পারলে লড়ি, নতুবা সরে পড়ি।
- শত্রু আগায় আমরা পিছাই, শত্রু শিবির ফেলে আমরা হয়রান করি, শত্রু ক্লান্ত হয় আমরা আক্রমণ করি, শত্রু পালায় আমরা পিছু ধাওয়া করি।
- অন্তর্লাইনের যুদ্ধে বহির্লাইনে লড়াই করা।
- দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুতনিস্পত্তির লড়াই করা।
- আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা।

- রণনীতি হলো একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও, আর রণকৌশল হলো দশজনকে একজনের বিরুদ্ধে লড়াও।
- উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা।
- সক্রিয় আত্মরক্ষা।
- আকস্মিক আক্রমণ।
- সতর্কতা ও চলমানতা।

– ইত্যাদি।

মাওবাদ থেকে আমরা উপরের যে সাধারণ নীতি/কৌশল/পদ্ধতিগুলো পাই সেসবের প্রয়োগে আমাদের দেশের বিশেষ নীতি/পদ্ধতিগুলো গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলনে যে বিপুল ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা শিখতে পারি এবং তত্ত্বগত উপলব্ধির বিকাশের মধ্য দিয়ে সেগুলোকে আমরা মূর্ত-নির্দিষ্ট কিছু নীতি/পদ্ধতিতে বিকশিত করতে পারি। বিশেষত অতীতের এই আন্দোলনে গণযুদ্ধ পরিচালনায় যে রাজনৈতিক ও সামরিক ভুলগুলো হয়েছে, যা আগে আলোচনা করা হয়েছে, সেসবকে বিবেচনায় রেখে আমাদেরকে এসবের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

১। ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরা ঃ

আমরা দেখেছি যে, বিগত আন্দোলনে এ প্রশ্নে আমাদের বিভিন্নমুখী গুরুতর সব ত্রুটি হয়েছে যা কিনা শুধু বাহিনী ও যুদ্ধ বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা নয়, রাজনৈতিকভাবে তা সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদের ভিত্তি সৃষ্টি ও বিকশিত করেছে। এজন্য বাস্তব অনুশীলনে প্রথম প্রয়োজন হলো ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরা।

– ঘাঁটিকে আঁকড়ে ধরার প্রশ্নটি বিগত সংগ্রামে যতটা আলোচিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল এই এই অবস্থায় 'ঘাটি সম্ভব নয়' বিষয়ের আলোচনাটি। এটা সংশোধনবাদীদের তরফ থেকে সুস্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণভাবে বর্জিত-তো হয়েছিলই। কিন্তু সাধারণ তাত্ত্বিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলনের মধ্যেও ঘাঁটি 'সম্ভব নয়', 'চীনের মত' 'সম্ভব নয়' এ জাতীয় আলোচনা বেশি হয়েছে।

ঘাঁটি 'সম্ভব নয়' বলার অর্থ হলো 'বিপ্লব সম্ভব নয়' বলা। কারণ বিপ্লব কোনো দেশেই সর্বত্র একবারে হয়নি। এবং সর্বত্রই কোনো না কোনো জায়গাকে আগে ঘাঁটিতে পরিণত করতে হয়েছে, যাকে ভিত্তি করে বিপ্লব দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি একটি বিপ্লবী রাষ্ট্রও বিশ্ববিপ্লবের প্রেক্ষিতে ঘাঁটি মাত্র।

সুতরাং রাজনৈতিক ও লাইনগতভাবে এ সম্পর্কে উপলব্ধির পরিচ্ছন্নতার পরই আমরা যেতে পারি সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে, যার প্রাথমিক কাজ হলো ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরা। যাকিনা গণযুদ্ধের সূচনা থেকে-তো বটেই, এমনকি তার প্রস্তুতি পর্যায় থেকেও আমাদের সমগ্র সামরিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, শক্তির মোতায়েন, কাজের প্রধান/গৌণ দিক নির্দিষ্ট করা– ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়কে নির্ধারণ করবে।

– অবশ্যই ঘাঁটির লক্ষ্যে রণনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সুবিধা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ঘাঁটির জন্য শুধু সেটাই বিবেচ্য নয়। এজন্য জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্য ও প্রভাব, পার্টির সাংগঠনিক শক্তি, আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের পরিস্থিতি, সীমান্ত এলাকার বিশেষত্ব ইত্যাদির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

আমাদের দেশ ছোট, মূলত সমতলভূমি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অঞ্চলটি বাদে পাহাড়-জঙ্গল নেই বললে চলে, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং সাম্প্রতিককালে ফোন-মোবাইল-কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের কারণে ভৌগোলিক আনুকূল্যের জন্য আমাদেরকে দেশের বিশেষত্ব'র উপর মনোযোগ দিতে হবে এবং আপেক্ষিকভাবে অনুকূল এলাকাকে বেছে নিতে হবে। কারণ, গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভৌগোলিকভাবে নিরঙ্কুশ অনুকূল অঞ্চল আমাদের দেশে নেই (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)।

সুন্দরবন জঙ্গল এলাকা হলেও মূলত প্রায় জনবসতিবিহীন এবং সংরক্ষিত অঞ্চল। সুতরাং তার সুযোগ অন্যান্যভাবে নেয়া গেলেও, যা নিতেও হবে, একে ভিত্তি করে ঘাঁটির লক্ষ্য নেয়া যায় না। তেমনি সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকাগুলোও মূলত বৃহৎ ও শত্রু রাষ্ট্রের সীমান্ত ঘেঁষে ফালির মত বিস্তৃত। তাই, এরও ভিন্ন গুরুত্ব থাকলেও একে ভিত্তি করা সম্ভব নয়। উপরে উল্লেখিত আইটি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের কারণে ঘাঁটির লক্ষ্যে এলাকাকে খুব সংকীর্ণ ছোট গণ্ডিতে দেখা কোনো ক্রমেই ঠিক হবে না। তাকে হতে হবে ব্যাপক বিস্তৃত, বৃহৎ এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত অনুকূল জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম এলাকা। যা বাস্তবে দেশের জাতীয় রাজনীতিতে নির্ধারক প্রভাবকারী হয়ে উঠতে পারে, এবং সেটা তার অস্তিত্বের জন্যও প্রয়োজনীয় হবে।

সুতরাং জঙ্গল-পাহাড়ি এলাকার মধ্যে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, যদিও সেখানে এখন জাতিগত আন্দোলন ও রাষ্ট্রের দমন গুরুতর রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিকূলতাও সৃষ্টি করে রেখেছে।

নদীমাতৃক এই দেশের নদনদী-খালবিল-হাওরবাওড়– ইত্যাদির সুবিধাকে ঘাঁটির ও যুদ্ধের স্বার্থে ব্যবহার করাটা এদেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় পরিবেশ ধ্বংসের ছোবলে নদ-নদী অনেকটা শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষা-বন্যা-পানি এদেশের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যই বটে। সুতরাং মাও-যে বলেছিলেন

পাহাড়-জঙ্গলের পর চরাঞ্চল, বিলাঞ্চল, নদীমোহনা– ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিতে, সেটা আমাদেরকে সৃজনশীলভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

– একটি ছোট দেশে কেন্দ্রীয় শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি গড়ে ওঠায় এবং যোগাযোগ ও যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থার কারণে দেশব্যাপী অসংখ্য ছোট ছোট সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি এখানে হতে পারে না। তাই, দেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অসংখ্য সশস্ত্র সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির যে ধারা আমরা বিগত সময়ে দেখেছি তা ঘাঁটি-লাইনকে ধারণ করে না। বরং প্রয়োজন হলো এক বিস্তৃত এলাকাজুড়ে একই রাজনৈতিক ও সামরিক কমান্ডে রণনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা, যাতে পার্টি তার ব্যাপক সামর্থ্য ১/২/৩টি– এমন করে অল্প কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে পারে এবং ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক কর্তব্যগুলোকে এগিয়ে নিতে পারে।

– প্রথমেই সবচেয়ে অনুকূল জায়গায় গণযুদ্ধ সূচিত নাও হতে পারে। এমনকি কিছুটা প্রতিকূল জায়গাতেও তা শুরু হতে পারে। ব্যাপক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে যে তা শুরু হতে পারে না সেটাও পরিষ্কার। কিন্তু রণনৈতিক অঞ্চলের একটা রূপরেখা যদি সূচনা থেকেই আমাদের থাকে তাহলেই আমরা সূচিত গনযুদ্ধকে সঠিক অভিমুখে চালিত করতে পারবো। এবং ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির সংগ্রামকে একটা বৃহৎ ও সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে বিকশিত করতে পারবো। সুতরাং রণনৈতিক এই দিশা খুবই নির্ধারক, যা ছাড়া গণযুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততায় ভেসে যাবে, যাকিনা মাওবাদী আন্দোলনে অতীতে ঘটেছে।

আঁকড়ে ধরা অঞ্চলের সমর্থনে বিস্তৃত সশস্ত্র তৎপরতা– তা বিভিন্ন মাত্রায় ও শক্তির হতে পারে– প্রয়োজন হবে। কিন্তু সহায়ক কাজকে মূল কাজ করে ফেলার ভুল অতীতের মত করা থেকে বিরত হতে হবে– রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়ে।

২। গণযুদ্ধের প্রস্তুতি ঃ

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, বিগত ইতিহাসে 'শূন্য থেকে বাহিনী ও যুদ্ধ' গড়ে তোলা, 'যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সব কিছু গড়া' ও 'গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণকে জাগরিত করা'– প্রভৃতি রণনৈতিক সঠিক দিশাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কীভাবে আমাদের মধ্যে যান্ত্রিক একতরফাবাদ গড়ে উঠেছিল এবং তা গণযুদ্ধের বিপ্লবী প্রস্তুতিকে বুঝতে ব্যর্থতা সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য এর বিপরীতে "প্রস্তুতি"-র নামে যে অর্থনীতিবাদী 'শীর্ষ তত্ত্ব' এসেছিল তা কার্যত গণযুদ্ধের রাজনীতিকেই বর্জন করে বসেছিল, তার নেতিবাচক দৃষ্টান্তকেও ভুলে গেলে চলবে না।

গণযুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে পার্টির নেতৃত্বে। তাই, নিম্নতম শক্তিতে হলেও পার্টি গঠন হতে হবে যুদ্ধ শুরুর আগেই। গণযুদ্ধ জনসাধারণের যুদ্ধ। জনগণের উপর নির্ভর করেই শুধু গণযুদ্ধ চলতে পারে। তাই, জনগণের মাঝে প্রাথমিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভিত্তিও অবশ্যই প্রয়োজন। এসবই 'প্রস্তুতি'র মধ্যে পড়ে।

এমনকি কেন্দ্রীয় স্তরে যদি পার্টি না থাকে, বা তার লাইন-বিনির্মাণে মৌলিক ঘাটতি থাকে, তাহলে তার প্রাথমিক নির্মাণ– সেটাও প্রস্তুতিরই অংশ।

যদিও এসব কিছুই করতে হবে 'যথাসম্ভব দ্রুত গণযুদ্ধ শুরু করা'-র নীতির প্রতি আক্ষরিকভাবে অনুগত থেকে।

প্রশ্নটা হলো এই প্রস্তুতিকে আমরা কতটা প্রসারিত করবো এবং কতটা সময় পর্যন্ত গণযুদ্ধ শুরু করার আগে দেরি করবো। এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট মীমাংসা কঠিন। তাতে বেশি বা কম হতে পারে। কিন্তু কিছু সামরিক-সাংগঠনিক বিবেচনাকে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

– তার আগে যে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন তাহলো– আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, মাওবাদীরা ৭০-দশকের সূচনাতেই গণযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, যা কখনো পুরোপুরি বর্জিত হয়নি, বা নিঃশেষ হয়নি, বরং আগু বাড়া পিছু হটা, সঠিকতা ও ভুলভ্রান্তি, অথবা জোয়ার ও বিপর্যয়ের অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা এখনো বহমান। আবার পাশাপাশি বহু জায়গায়/অঞ্চলে গণযুদ্ধ মূলত উচ্ছেদ হয়ে গেছে– কোনোটা সুদীর্ঘদিন ধরে, কোনোটা সম্প্রতি বা অল্প সময় ধরে। তাই, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রস্তুতির প্রশ্নটা আনকোরা নয়। বরং বহু অঞ্চলে প্রশ্নটি হলো চলমান গণযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার সমস্যা। আবার অনেক অঞ্চলে তার প্রস্তুতির প্রশ্নটিও রয়েছে, কিন্তু সেটি একটি নতুন গণযুদ্ধ সূচনা নয়, বরং বহুবিধ কারণে থেমে পড়া বা পর্যুদস্ত হওয়া গণযুদ্ধকে পুনর্জীবিত করবার সমস্যা। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে একেবারেই নতুন করে গণযুদ্ধ সূচনার প্রশ্নটিও অবশ্যই রয়েছে। তাই, সূচনার বিষয়টিকে এখানে সৃজনশীলভাবে পরিস্থিতি উপযোগীভাবে মীমাংসা করতে হবে। না হলে আমরা অতীতের অগ্রগতিগুলো থেকে শুধু পিছিয়ে পড়বো তা নয়, তার বর্জনেও চলে যাবো।

– একারণেই পুরনো সশস্ত্র অঞ্চলগুলো, সেটা মাওবাদী আন্দোলনের যে ধারার সৃষ্টিই হোক না কেন, সেগুলোকে আমাদের ঐতিহ্যিক সশস্ত্র অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এগুলো হলো বাস্তবত এক ধরনের সুপ্ত গেরিলা অঞ্চল, যেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই সশস্ত্র উপায়ে ব্যতীত প্রস্তুতির কাজকে এগিয়ে নেয়া যাবে না। তবে আগের মত একেই আমরা যুদ্ধ-পূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের কোনো পর্যায় বলবো না। এটা প্রস্তুতিই বটে, তবে বিশেষত্ব মণ্ডিত। একে বলা যেতে পারে অস্ত্র হাতে গণযুদ্ধের প্রস্তুতি, যা কিনা অতিদ্রুতই গণযুদ্ধ পুনর্জাগরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। এই প্রস্তুতিকালে কিছু অপরিহার্য সশস্ত্র এ্যাকশন হতে পারে, কিন্তু সেটা আমাদের কাজের কেন্দ্র নয়, প্রধান বিষয় নয়, বরং প্রধান বিষয় হলো রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ, এবং গণযুদ্ধের পুনঃসূচনার জন্য নিম্নতম সামরিক প্রস্তুতি অর্জন করা।

– এছাড়াও যেসব অঞ্চলে আমরা গণযুদ্ধের একেবারে নতুন প্রস্তুতিমূলক কাজ করবো, সেখানেও মনে রাখতে হবে যে, দেশব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে

এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে এই প্রস্তুতি চলছে। তাই, এটা কতটুকু বা কতদিন নিরস্ত্র বা শান্তিপূর্ণভাবে চালানো যাবে এটা বহু কিছুর উপর নির্ভর করবে। কোথাও আমরা শত্রুদমনের মোকাবেলায় পরিকল্পনার চেয়ে দ্রুত গণযুদ্ধে প্রবেশ করতে পারি, কোনো জায়গায় গণযুদ্ধে এখনি না এগিয়ে সামগ্রিক স্বার্থের বিবেচনায় আমরা প্রধান শক্তি প্রত্যাহার করে নিতেও বাধ্য হতে পারি। এসবই বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ এবং আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আত্মগত পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে।

তাসত্ত্বেও একটি রণনৈতিক অঞ্চলে গণযুদ্ধের প্রস্তুতির কতকগুলো রূপরেখা আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি।

প্রথমত, কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত একটি পার্টি অবশ্যই থাকতে হবে, তা যত ছোটই হোক না কেন। কমরেড এসএস পার্টির প্রস্তুতি সংগঠনকালেই গণযুদ্ধ সূচনা করেছিলেন। তবে সেটা কার্যত একটি পার্টির মতই ছিল।

এ ধরনের পার্টির একটি সাধারণ মৌলিক লাইন, অর্থাৎ, মতাদর্শগত লাইন, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সামরিক লাইনের রূপরেখা, একটি সংবিধান বা সাংগঠনিক নীতিমালা এবং রণনৈতিক পরিকল্পনার একটি রূপরেখা থাকতে হবে। তার একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সংস্থা থাকতে হবে। গণযুদ্ধের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলটি/অঞ্চলগুলো বাদেও তার সাংগঠনিক এলাকা দেশের আরো কিছু জায়গায়, বিশেষত প্রধান শহরাঞ্চলে থাকতে হবে। তার গোপন কর্মপদ্ধতি ও পরিচালনা পদ্ধতি থাকতে হবে, যাতে শত্রুদমনে সে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। বেশ কিছু পেশাদার বিপ্লবী থাকতে হবে। – ইত্যাদি।

কিন্তু এগুলোকে খুব যান্ত্রিকভাবে দেখা যাবে না। বহুবিধ বাস্তব পরিস্থিতির উপর এর অনেক হেরফের হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঘাঁটির লক্ষ্যে একটি/একাধিক রণনৈতিক অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সেজন্য রণনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কে একটি সাধারণ পরিকল্পনা তাকে নিতে হবে, যদিও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে পরিকল্পনাকে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের নমনীয়তা থাকা উচিত।

তৃতীয়ত, গণযুদ্ধ সূচনাকারী সামরিক এ্যাকশন করতে পারার সামর্থ্য অর্জিত হতে হবে। অর্থাৎ, সেজন্য স্কোয়াড গঠন, তার মতাদর্শগত ও বাস্তব ভিত্তি, এবং প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থত, এ্যাকশন পরবর্তী সম্ভাব্য শত্রুদমনকে বিবেচনা করে তাতে টিকতে পারার মত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ভিত্তি থাকতে হবে।

পঞ্চমত, এ্যাকশন পরবর্তী রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজ এবং বৃহত্তর ও উচ্চতর সামরিক কাজ এগিয়ে নেবার প্রস্তুতি থাকতে হবে। – ইত্যাদি।

পার্টি-গঠনকে এই লক্ষ্যেই যদি করা হয়, তাহলে উপরোক্ত পরবর্তী প্রস্তুতিগুলো খুব কঠিন ও ব্যাপক বিষয় নয়। যাকে কিনা বহু সংগঠন ঠেকিয়ে রাখে "প্রস্তুতি হয়নি" বক্তব্যের ডান লাইন দ্বারা। বাস্তবে সঠিক লাইনগত চেতনায় পার্টি গঠনের প্রক্রিয়াটিই এইসব প্রস্তুতিকে গড়ে তোলে।

– তবে এটা খেয়াল করার বিষয় যে, ৬০/৭০-দশকের বস্তুগত পরিস্থিতি এবং সমগ্র বিপ্লবী শক্তির আত্মগত পরিস্থিতির থেকে বর্তমানকার পরিস্থিতির পার্থক্যকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা আমাদের সামরিক কার্যক্রমের পথকে অনেক প্রভাবিত করতে বাধ্য। তদুপরি রণনীতি ও সামরিক লাইনের বিকাশের ভিত্তিতেও গণযুদ্ধের প্রস্তুতিকে দেখতে হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে, এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এবং সামরিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, যা কিনা রণনীতি ও সামরিক লাইনের নবতর উন্নয়ন দাবি করছে। একইসাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিগত সুদীর্ঘকালের সশস্ত্র সংগ্রাম ও তাতে সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আমরা যেমন শিক্ষা নিয়েছি, তেমনি শত্রুও নিয়েছে। তারা পার্টির নেতৃত্বসারিকে হত্যা করে সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন করতে শিখেছে। তারা আমাদের দেশের সশস্ত্র সংগ্রামের নিয়মবিধিকে এবং আমাদের পরিস্থিতিকে অনেক বেশি বুঝতে শিখেছে। ইতিমধ্যে মাওবাদী রাজনীতির স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় শত্রু প্রায় সব জায়গাতেই আমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয়। আমাদের দিক থেকেও যেকোনো ধরনের এ্যাকশন করে সশস্ত্র সংস্কারবাদী বা অর্থনীতিবাদী রাজনীতির পাঁকে পড়লে চলবে না। এবং যুদ্ধকে একবার সূচনার পর নির্দিষ্ট রণনৈতিক অঞ্চলকে ভিত্তি করে তাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতেও হবে, যার কেন্দ্রীয় বিষয় হবে রাষ্ট্রীয় দমনে টিকে থাকা এবং শত্রুর উপর পাল্টা-আক্রমণ ও পুনঃআক্রমণের ধারাকে বিকশিত করা।

এসব কারণে গণযুদ্ধ সূচনা করাকে নিছক বিচ্ছিন্ন কোনো সামরিক এ্যাকশন করতে পারার মধ্যে দেখলে চলবে না। বরং বিগতকালের প্রচুর অভিজ্ঞতা, বৈদেশিক অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্বগত সমৃদ্ধতার আলোকে একটি সামগ্রিক সামরিক লাইন ও রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে তার সূচনা হিসেবে দেখতে হবে।

সুতরাং এইসব বিবেচনায় আজকের পর্যায়ে 'প্রস্তুতি'র গুরুত্ব অনেক বেশি। একে পরিস্থিতি ও গণযুদ্ধের লাইনের বিকাশের জায়গা থেকে বুঝতে হবে। একইসাথে এসবের অজুহাতে যুদ্ধ সূচনাকে বিলম্বিত করার প্রয়াসকেও বিরোধিতা করতে হবে।

৩। গণযুদ্ধের সূচনা ঃ

বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলন বিগত শতকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে 'খতম দিয়ে সূচনা'র সাধারণ লাইনকে গ্রহণ করেছিল, যার একতরফাবাদ ও দুর্বলতা/বিচ্যুতির উপর আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

– সূচনা থেকেই আমাদেরকে এ্যাকশনের সবগুলো রূপকেই হাতে রাখতে হবে। আমাদের সামর্থ্য ও বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী আমরা তা প্রয়োগ করবো। খতম ছাড়াও সেটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানের উপর বোমা হামলা হতে পারে, হতে পারে শ্রেণি শত্রুর গণআদালত অথবা তার ফসল বা জমি দখল, হতে পারে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর যেকোনো ধরনের আক্রমণ, এমনকি তা মূলত সশস্ত্র প্রচার এ্যাকশনের অভিযানও হতে পারে। এসব বিভিন্ন ধরনের এ্যাকশনের একটি সমন্বিত কর্মসূচি আকারে একটি রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে তাকে পরিচালনা করতে হবে। নিশ্চয়ই সূচনাতে প্রাথমিক ও সরল ধরনের রূপগুলোই আমরা ব্যবহার করবো, এবং জটিল রূপগুলোকে পরবর্তীকালে সামর্থ্য ও দক্ষতা বিকাশের প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করতে থাকবো। সেটা হলো আমাদের পরিকল্পনার বিষয়। কিন্তু নীতিগতভাবে সূচনা থেকেই এ্যাকশনের সম্ভাব্য সকল রূপকেই আমাদের বিবেচনায় রেখে এগোতে হবে।

সূচনা যে এ্যাকশন দ্বারাই হোক না কেন, তাকে যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে করা প্রয়োজন। যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রীয়-বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করার কর্মযজ্ঞে। কারণ, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় বাহিনীই হলো শত্রু-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদান। তাই, একেবারে শুরু থেকে এই পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্রে রেখে সমস্ত কাজ করতে হবে। এটা হারিয়ে ফেললে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে তা দুর্বল করে ফেলবে এবং সশস্ত্র সংস্কারবাদ গড়ে তুলবে।

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে 'খতম' দ্বারা যেকোনো অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা কৃষকের বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা হিসেবে বিগত সমগ্র সময়কালে বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। একইসাথে 'খতম' যদি বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে না রাখে তাহলে তা সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদের ভিত্তিকেও ধারণ করে। এটাও ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে বিগত সময়ে হয়েছে। এ ধরনে এগোলে 'খতম' বরং সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদকেই বিকশিত করে। সুতরাং এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে হবে। এর উপর পার্টিকে ও জনগণকে গভীরভাবে ও অব্যাহতভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ এখন বেশি বেশি করে জাতীয় জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে, এবং গ্রামাঞ্চলে পূর্বতন ক্ষমতাসীন বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকদের রূপান্তর ঘটেছে। অন্যদিকে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ব্যাপকভাবে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে একে অন্যকে হত্যার কার্যক্রম বিকশিত করেছে, যার শিকার হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রতিক্রিয়াশীল মাস্তান গ্যাং-এর সদস্য বাদেও

সাধারণ জনগণও। এ অবস্থায় 'খতম'-কে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে পড়ার বিপদ থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টির উপরও অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। এ্যাকশনের রূপ ঃ

এ্যাকশনের রূপ জনগণ বিপ্লবী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় নবনব রূপে আবিষ্কার করেন। তাই, একে কোনো ছকের মধ্যে ফেলা সঠিক হবে না।

সামরিক এ্যাকশনের উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে দুর্বল করা– তার সামগ্রিক ধ্বংসের লক্ষ্যে। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের শক্তিকে বলিয়ান করা– বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে।

তবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত এ্যাকশনরূপগুলোকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।

1) **সশস্ত্র প্রচার এ্যাকশন;**
2) **বাছাইকৃত খতম;**
3) **স্থানীয় অস্ত্র দখল;**
4) **সশস্ত্র গণআদালত;**
5) **ধ্বংসাত্মক হামলা (শত্রুর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক স্থাপনায়)**
6) **শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ– যা কমান্ডো, রেইড, এ্যামবুশ ও মাইন– এই বিভিন্নরূপে হতে পারে। যা শত্রুকে পরাজিত ও ধ্বংস করা, সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্ত্র দখল, তাকে বিরক্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত করা– ইত্যাকার একক বা একাধিক উদ্দেশ্যে হতে পারে।**
7) **সশস্ত্র হরতাল।**

এইসব এ্যাকশন কোথায় কোনটা কখন আমরা করবো তা বাস্তব ও আত্মগত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

৫। দেশব্যাপী ও শহর-গ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম ঃ

রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি দেশব্যাপী সশস্ত্র এ্যাকশন ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশটি ছোট; রাষ্ট্রশক্তি কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী; এবং এটি ঘনবসতির একটি দেশ, যেখানে সর্বত্রই জনগণ। অন্যদিকে রণনৈতিক অঞ্চলগুলোও ভৌগোলিকভাবে তেমন একটা দুর্গম নয়।

তাই, এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমাদের জন্য অনুকূল ও শত্রুর জন্য প্রতিকূলে পরিণত করার সঠিক নীতি/কৌশল আমাদের থাকতে হবে।

দেশব্যাপী যুদ্ধ না ছড়ালে তা শত্রুকে আমাদের রণনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে ধরে সহজে তাকে ধ্বংস করার সুযোগ করে দেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেশব্যাপী এবং গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরেও দ্রুত সশস্ত্র এ্যাকশন ছড়িয়ে দেবার সুযোগ সৃষ্টিও করে।

* দেশব্যাপী ছড়ানোর দুটো দিক রয়েছে– রণনৈতিক অঞ্চলগুলোর বিস্তৃতি; এবং দেশব্যাপী বিস্তৃতি। আমাদের দুটোকেই গুরুত্ব দিতে হবে, যদিও সাধারণভাবে রণনৈতিক অঞ্চলের বিস্তৃতি হলো প্রধান।

বিগত সময়ে রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে না ধরার কারণে নির্দিষ্ট সশস্ত্র অঞ্চল বড় একটা বিকশিত হতে পারেনি। আমাদের প্রায় সকল নেতৃত্ব ও কেডার ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদন থেকে আসবার কারণে ক্ষুদে এলাকাবাদী হয়ে পড়বার বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে প্রবল। সুতরাং অঞ্চলের নিজস্ব অব্যাহত বিস্তৃতির উপর খুবই জোরালো শিক্ষা প্রয়োজন।

অঞ্চলের বিস্তৃতি ছাড়া শত্রুর আক্রমণে যেমন আমরা টিকতে পারবো না, তেমনি শত্রুর উপর বৃহত্তর আক্রমণে যেতেও সক্ষম হবো না। শেষ পর্যন্ত এটা ক্ষুদে এলাকাবাদ বিকাশের মধ্য দিয়ে সংস্কারবাদে অধঃপতিত হতে বাধ্য হবে।

– দেশব্যাপী বিস্তৃতিরও দুটো দিক রয়েছে– দেশব্যাপী ছড়িয়ে বেশ কয়েকটি রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরা; এবং রণনৈতিক অঞ্চল-বহির্ভূত বিস্তৃতি। এদুয়ের মাঝে সাধারণভাবে প্রথমটি হলো প্রধান।

– রণনৈতিক অঞ্চলের একটা নির্দিষ্ট সীমা একটা নির্দিষ্ট সময়ে থাকলেও তা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল, বিশেষত আমাদের বিকাশের সাথে তা বর্ধনশীল। সুতরাং আজ যা রণনৈতিক অঞ্চল-বহির্ভূত তৎপরতা, কাল তা তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।

* যতই যুদ্ধ পরিস্থিতি বিকশিত হয়ে উঠবে, ততই দেশব্যাপী বিপ্লবী প্রভাব ও জোয়ারকে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য গেরিলা ইউনিট দেশব্যাপী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ছোট দেশ, মূলত এক ভাষাভাষী, অত্যন্ত ঘন বসতি, যোগাযোগ ও যাতায়াতের উন্নয়ন, নগরায়নের বিরাট বিকাশের মধ্য দিয়ে সারা দেশে সকল স্তরের জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভিন্নতার বিকাশ– প্রভৃতি কারণে এটা দ্রুতই বিকশিত হয়ে উঠা সম্ভব। এর শক্তির সাহায্যে বিবিধ ধরনের এ্যাকশন দ্বারা, বিশেষত প্রচারমূলক ও ধ্বংসাত্মক এ্যাকশন দ্বারা, এবং গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা ও গণযুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় অথবা গণযুদ্ধ দমনে নিয়োজিত রাষ্ট্রক্ষমতার নির্ধারক ধরনের শত্রুকে শহরে প্রতিকী খতম দ্বারা, শত্রু বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিটের উপর, বা এমনকি তার ছোট ও অপ্রস্তুত ক্যাম্পগুলোর উপর আংশিক অস্ত্রদখলের বা ব্যতিব্যস্তমূলক এ্যাকশনের

দ্বারা শত্রুকে দেশব্যাপী, শহর গ্রামে সড়কপথে, অফিসে ব্যবসায়ে, বাড়িতে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র চরমভাবে উত্যক্ত, ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করা সম্ভব। এটা একদিকে রণনৈতিক অঞ্চলে শত্রুর দমনকে কমিয়ে রাখবে, অন্যদিকে দেশজুড়ে গণযুদ্ধের জোয়ার সৃষ্টি করবে। এর সাথে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং রাজধানী কেন্দ্রীক যুক্তফ্রন্ট কার্যক্রম ও গণআন্দোলনকে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় গণঅভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

– রণনৈতিক অঞ্চলের সন্নিহিত/অন্তর্ভুক্ত কিছু শহরে রণনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পনার অধীনেই কাজ করতে হবে, যেখানে সশস্ত্র এ্যাকশন চালাতে হবে। রণনৈতিক অঞ্চলের বিস্তৃতির পাশাপাশি এ ধরনের সশস্ত্র এ্যাকশনের শহরের সংখ্যাও বাড়বে, যা ক্রমান্বয়ে জাতীয় রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে থাকবে।

তবে গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি না করে শহরকে এ্যাকশনের কেন্দ্রে পরিণত করা বিপজ্জনক। আরো বিপজ্জনক হলো দেশব্যাপী বিস্তারকে গুরুত্ব না দিয়ে নির্দিষ্ট অল্প কিছু শহরে এ্যাকশনকে অতি উচ্চমাত্রায় উন্নীত করা। শহরকে কখন সশস্ত্র এ্যাকশনের আওতাভুক্ত করা হবে তা বাস্তব ও আত্মগত অবস্থার অনেককিছুর উপর নির্ভর করে, যার সুবিবেচিত সমাধান আবশ্যক।

– রাজধানী বা শিল্পাঞ্চলের বড় শহরগুলোতে বিভিন্ন কারণে সুদীর্ঘদিন গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব থাকবে। এসব জায়গা শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক ও ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের গণআন্দোলন ও বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং বিপ্লবী রাজনীতির সংহতিমূলক তৎপরতার জন্য সুদীর্ঘদিন ধরে ভূমিকা রাখতে পারবে। এসব কাজ গণযুদ্ধের পশ্চাদভূমি, রিজার্ভ ও সমর্থক হিসেবেও খুবই গুরুত্ব ধরবে। একইসাথে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং গণঅভ্যুত্থানের জন্যও এ সকল জায়গায় দীর্ঘ প্রস্তুতিমূলক কাজের গুরুত্ব থাকবে।

তদুপরি আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে পার্টি-হেডকোয়ার্টারের কিছু কাজ এবং দেশব্যাপী সমন্বয়ের জন্যও এসব শহর দীর্ঘদিন নির্ধারক ভূমিকা রাখতে পারবে।

সুতরাং এসবকিছুকে বিবেচনায় রেখে এ ধরনের শহরে সশস্ত্র এ্যাকশনের ক্ষেত্রে বিবেচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬। রণনৈতিক পরিকল্পনাধীনে যুদ্ধকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়া ঃ

যুদ্ধে ক্রমান্বয়িক বিকাশের পথ রাজনৈতিকভাবে সংস্কারবাদ গড়ে তোলে এবং নতুন ও উচ্চতর স্তরে তাকে উন্নীত করতে বাধার সৃষ্টি করে।

এজন্য গণযুদ্ধের সূচনা থেকে শুরু করে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। এই রণনৈতিক পরিকল্পনা পুরনো পর্যায় থেকে নতুন ও উন্নত পর্যায়ে যুদ্ধকে উন্নীত করে এবং উলম্ফনকে আঁকড়ে ধরে।

প্রতিটি রণনৈতিক পরিকল্পনাকে নির্দিষ্ট স্লোগানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে যাতে শুধু পার্টির কেডার ও কর্মীরাই নন, জনগণকেও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে তা শিক্ষিত করে তুলতে পারে। যা উপরোক্ত রণনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম শর্ত। রণনৈতিক পরিকল্পনাগুলো নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক হতে হবে। নতুবা তাকে স্বতঃস্ফূর্ততার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। যদিও পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ের সাথে সময়ের ক্ষেত্রেও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তার প্রয়োজনীয় সংস্কার করার নমনীয়তা থাকতে হবে। কিন্তু সময় ধরে পরিকল্পনা না করলে আঁকড়ে ধরা দুর্বল হবে, এবং খোদ পরিকল্পনার একটা ত্রুটি হিসেবেই সেটা গণ্য হবে।

৭। অভিযান আকারে যুদ্ধ-সংগ্রাম পরিচালনা করা ঃ

প্রতিটি রণনৈতিক পরিকল্পনা বেশকিছু অভিযান দ্বারা সজ্জিত হতে হবে। যে অভিযানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের এ্যাকশন-এর কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। একে বলা যেতে পারে সমন্বিত তৎপরতা।

দেশব্যাপী গণযুদ্ধের এবং বিপ্লবী সংগ্রামের যে সামগ্রিক তৎপরতা তাকে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করলে অল্প সামর্থ্যের ভিত্তিতেও দেশব্যাপী বা একটি বড় অঞ্চলব্যাপী আলোড়ন তোলা সম্ভব। জনগণকে অনেক বেশি জাগরিত করা সম্ভব। যা স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৎপরতা দ্বারা সম্ভব হয়না।

প্রতিটি অভিযানের আগে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা এবং তার সমাপ্তির পর সারসংকলন করা প্রয়োজন।

সুতরাং আমাদের যুদ্ধ তৎপরতা হতে হবে ঢেউ-এর মতো, সরলরৈখিক বিকাশের গতিতে নয়। প্রতিটি অভিযানের মধ্যবর্তী বিরতিগুলো সারসংকলন, সুসংবদ্ধকরণ, সাংগঠনিক কাজ, মানোন্নয়ন, পার্টি গঠন, যুক্তফ্রন্টের বিকাশ– ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে।

অভিযানগুলোতে ক্রমবর্ধিতভাবে চেষ্টা রাখতে হবে জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সমন্বিত করে সেগুলো পরিচালনা করতে। এভাবে জাতীয় রাজনীতিতে গণযুদ্ধের হস্তক্ষেপ বেড়ে উঠবে এবং গণযুদ্ধ ও পার্টি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারবে। অন্যদিকে দেশব্যাপী জনগণ পার্টি ও গণযুদ্ধকে নিজেদের চেতনার মানের সাথে মিলিয়ে জানতে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং ক্রমবর্ধিতভাবে বিপ্লবী রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরার দিকে এগিয়ে আসবেন।

৮। প্রতিরোধাত্মক নয়, আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্য ঃ

রণনৈতিক অঞ্চলে স্বভাবতই শত্রু দমন সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়। শত্রুর এই দমনে আমাদেরকে সক্রিয় আত্মরক্ষা করতে হবে, এবং একইসাথে আক্রমণাভিযানও পরিচালনা করতে হবে।

সক্রিয় আত্মরক্ষা হলো সরে পড়া এবং পাল্টা-আক্রমণ করা।

কিন্তু আমরা যদি শুধু সক্রিয় আত্মরক্ষাই করি তাহলে যুদ্ধ একটি প্রতিরোধ যুদ্ধের রূপ ধারণ করবে। শত্রু আমাদের এলাকায় যুদ্ধকে ঠেলে দেবে, এবং নিজের এলাকায় স্বস্তিতে থাকবে। এটা যদিও শত্রুকে অভ্যন্তরে টেনে এনে পরাজিত করবার একটা মাওবাদী কৌশল, কিন্তু লড়াইকে এতেই সীমাবদ্ধ রাখলে আমরা শত্রুর একমুখী আক্রমণে শুধু আত্মরক্ষাত্মক সংগ্রামে আটকে পড়বো, এবং যুদ্ধকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে ব্যর্থ হবো, যা যুদ্ধে পরাজয় ডেকে আনবে।

বাস্তবে শত্রু শুধু রণনৈতিক অঞ্চলেই দমন চালায় তা নয়। রণনৈতিক অঞ্চলে দমন কেন্দ্রীভূত করলেও, এবং সেই দমনকে ব্যর্থ করার জন্য সক্রিয় আত্মরক্ষার নীতিকে কার্যকর করা অপরিহার্য হলেও, একবার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলে পরে শত্রু দেশব্যাপী পার্টি ও বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা 'নিম্ন মাত্রার যুদ্ধ' নামে যে কৌশল তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছ থেকে শিখেছে তার অংশ হিসেবে তারা পার্টি-নেতৃত্বকে হত্যার মাধ্যমে বিপ্লবের মাথা কেটে ফেলার কাজেও ইতিমধ্যে অনেক অগ্রসর হয়েছে। তাই, এটা ভাবলে ভুল হবে যে, আমরা রণনৈতিক অঞ্চলে বা তার সীমিত এলাকায় যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখলে শত্রুও সেটাই করবে। বরং, আমাদেরকেও শত্রু এলাকার মধ্যে গিয়ে অথবা এগিয়ে গিয়ে তার ঘাঁটির উপর আক্রমণ পরিচালনার উপর পৃথক গুরুত্ব দিতে হবে। এটা প্রথমাবস্থায় এ্যামবুশ বা মাইন যুদ্ধের বদলে কমান্ডো বা রেইড এ্যাকশনের রূপই বেশি পরিগ্রহ করতে পারে। এছাড়া এ্যাকশনের অন্যান্য রূপগুলোও, যেমন, ধ্বংসাত্মক হামলা, খতম, প্রচার এ্যাকশন ইত্যাদি– এক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সামনে আসতে পারে। যা যুদ্ধাভিযান আকারে পরিচালনা করলে শত্রু বিপ্লবের এক সামগ্রিক আক্রমণের মুখে পড়বে। যা একদিকে বিস্তৃত এলাকার তথা ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী জনগণকে জাগরিত করতে পারে, অন্যদিকে রণনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে দমনরত ও চলমান শত্রুর উপর পাল্টা-আক্রমণে আমাদের সফলতাকে বিকশিত করতে পারবে।

৯। সরে পড়া ও পাল্টা-আক্রমণের মধ্য দিয়ে সক্রিয় আত্মরক্ষার নীতি প্রথম থেকেই প্রয়োগ করা ঃ

উদ্যোগ হাতে রাখা যুদ্ধ-জয়ের জন্য একটি মৌলিক বিষয়।

গেরিলা যুদ্ধে, বিশেষত রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরে, আমরা মাও-এর নীতি অনুসারে 'জিততে পারলে লড়ি, নতুবা সরে পড়ি'। এমনকি ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠার পরও একথা প্রযোজ্য। সুতরাং সরে পড়া গেরিলা যুদ্ধে সর্বদাই প্রযোজ্য। একে যুদ্ধের এই স্তরে শুধু প্রাথমিক বা নিম্নপর্যায়ের জন্য নির্ধারণ করা সঠিক নয়। এটা যুদ্ধে সরে পড়ার কৌশল সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে তুলবে।

তেমনি প্রযোজ্য পাল্টা-আক্রমণ করা। যুদ্ধের শুরু থেকেই শত্রু দমনে নামবে, এবং আমাদেরকেও তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। শত্রু-দমনে সরে পড়ার উদ্দেশ্য হলো নিজ শক্তিকে রক্ষা করা, এবং উপযুক্ত অবস্থায় শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার উপর পাল্টা-আক্রমণ করা, যা যুদ্ধের সকল স্তরেই প্রযোজ্য। পাল্টা-আক্রমণ এ্যাকশন রূপের বিভিন্ন ধরনেই হতে পারে। কিন্তু পাল্টা-আক্রমণ ব্যতীত যুদ্ধে আমরা উদ্যোগ হারিয়ে ফেলবো। পাল্টা-আক্রমণকে নীতির দিক থেকে পরবর্তী কোনো স্তরের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। সুযোগ হলেই আমরা সেটা করবো, তা যে এ্যাকশনের রূপেই হোক না কেন।

পাল্টা-আক্রমণ বিভিন্ন রূপ ও মাত্রার হতে পারে। এ্যাকশনের যেকোনো রূপ এতে ব্যবহৃত হতে পারে। সেটা কী হবে তা নির্ভর করবে যুদ্ধের বিকাশের মাত্রার উপর, আমাদের শক্তি সামর্থের উপর। কিন্তু পাল্টা-আক্রমণকে একটা পর্যায়ের জন্য পিছিয়ে দিয়ে শুধু সরে পড়াকে একটি পর্যায়ের জন্য উদ্যোগ হাতে রাখার উপায় করলে ভুল হবে, কিছুটা পরেই আমরা উদ্যোগ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবো। যা '৭৪-সালে আমাদের ঘটেছিল।

১০। রণনৈতিক অঞ্চলকে বিভিন্ন ফ্রন্টে বিভক্তকরণ ঃ

রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরার লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে ও দেশব্যাপী গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় সেখানে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা।

বিষয়টা এরকম নয় যে, গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়াতে আপনাআপনি কিছু অনুকূল এলাকায় ঘাঁটি গড়ে উঠবে। বিষয়টা এরকমও নয় যে, রণনৈতিক অঞ্চলের পুরোটাই একবারে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়ে যাবে।

ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা একটি সচেতন পরিকল্পনার কাজ। শুরু থেকেই তাকে সেভাবে এগোতে হবে।

গণযুদ্ধের সূচনাকালে রণনৈতিক অঞ্চল হিসেবে আঁকড়ে ধরলেও অঞ্চলটি শত্রু-অধিকৃত এলাকা হিসেবেই থাকে। কিন্তু সূচনাকালেও আমাদের পরিকল্পনা থাকতে হয় যে, কোন এলাকাটি এ্যাকশন এলাকা হবে, আর কোনগুলো পশ্চাদএলাকা হিসেবে কাজ করবে। এটা ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাধীনে ধীরে ধীরে বিস্তৃত এলাকায় ও উচ্চতর মাত্রায় বিকাশ লাভ করে। সমগ্র রণনৈতিক অঞ্চলটিতে একই মাত্রায় ও তীব্রতায় সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা যায় না। বরং

তাকে সচেতন পরিকল্পনাধীনে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এজন্য শুরু থেকে রণনৈতিক অঞ্চলকে প্রধান ফ্রন্ট, ২য় ফ্রন্ট ও প্রাথমিক ফ্রন্ট– এভাবে বিভক্ত করা উচিত, যার মাঝে কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে জোরালো রাজনৈতিক-সামরিক-সাংগঠনিক জোনটি প্রধান ফ্রন্ট বলে বিবেচিত হবে। প্রধান ফ্রন্টের সমর্থনে চতুর্দিকে একাধিক এলাকা থাকবে যেখানে পরবর্তী নিম্নমাত্রায় সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে। সমগ্র রণনৈতিক অঞ্চলের পরিধি ঘিরে থাকবে তার প্রাথমিক ফ্রন্ট।

এভাবে বিভক্তির মাধ্যমে আমরা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, গভীরকরণ ও বিস্তৃতকরণ, কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ– ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসা করতে পারি।

রণনৈতিক অঞ্চলের পরিধি সম্প্রসারণশীল, যেমন কিনা প্রতিটি ফ্রন্টেরও। এভাবে আমাদের আঁকড়ে ধরা কাজের অঞ্চল ক্রমান্বয়ে ঘাঁটির লক্ষ্যে নির্ধারিত সাধারণ রণনৈতিক অঞ্চলের লক্ষ্যে বিস্তৃত হতে থাকবে।

– একইভাবে প্রধান ফ্রন্ট, ২য় ফ্রন্ট ও প্রাথমিক ফ্রন্টের এলাকা নির্ধারণ যান্ত্রিক ও স্থির নয়, এটাও পরিবর্তনশীল। তবে এটা যেকোনো ঘটনার দ্বারা বা চলতি বিকাশের দ্বারা নিয়তই পরিবর্তনশীল নয়। বরং অঞ্চলের রণনৈতিক পরিকল্পনা ও আশু পরিকল্পনার মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার দ্বারা মোটামুটিভাবে একটি তুলনামূলক দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিরীকৃত।

এভাবে কয়েকটি ফ্রন্টে বিভক্তিই পরবর্তীতে রণনৈতিক অঞ্চলকে তার কেন্দ্রে ঘাঁটি, তাকে ঘিরে গেরিলা অঞ্চল, এবং পরিধিকে ঘিরে বিস্তৃত এ্যাকশন এলাকায় পরিণত হবে– যা নেপাল বিপ্লবে 'পিঁয়াজ তত্ত্ব' বলে পরিচিতি পেয়েছিল।

১১। গণযুদ্ধের অক্ষ ঃ

গণযুদ্ধের অক্ষ হলো যে অঞ্চলকে ঘিরে গণযুদ্ধ আবর্তিত হয় সেটা।

অক্ষকে ঘিরে গণযুদ্ধ টিকে থাকবে– এটা গণযুদ্ধের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। শুধু তা-ই নয়, অক্ষ হলো দেশব্যাপী গণযুদ্ধের শিরা-ধমনী।

মহাসড়কগুলো যেমনি রাষ্ট্রশক্তির শিরা-ধমনীরূপে কাজ করে এবং সমস্ত দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক নিয়ন্ত্রণে তার কেন্দ্রকে সক্ষম করে তোলে, দেশব্যাপী ব্যবস্থার মেরুদণ্ডের মত কাজ করে, গণযুদ্ধের অক্ষও তেমনি বিপ্লবের মেরুদণ্ড ও শিরা-ধমনীরূপে কাজ করে।

এটা রণনৈতিক অঞ্চলগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যাতে রণনৈতিক অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকে দেশব্যাপী গণযুদ্ধের একটা অখণ্ড ও বৃহৎ ক্ষেত্র উপস্থাপন করে।

এটা আমাদের এই ছোট দেশের চতুর্দিকে ছড়ানো অল্প কিছু রণনৈতিক অঞ্চল– ঘাঁটি/গেরিলা অঞ্চলকে দেশব্যাপী একটি অখণ্ড পরিকল্পনাধীনে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সমন্বিত তৎপরতা চালাতে সক্ষম করে তুলবে।

দেশব্যাপী বিস্তৃত যুদ্ধ-অঞ্চল বারংবার প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে। কিন্তু অক্ষকে ঘিরে তা টিকে থাকবে, অক্ষকে ধরে ঘাঁটি প্রবহমান থাকবে, এবং বিস্তৃত হবে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে, যেখানে পাহাড়-জঙ্গল এলাকা দেশব্যাপী নেই বললে চলে, যেখানে চরাঞ্চল-বিলাঞ্চলকে ভিত্তি করে ঘাঁটি সৃষ্টির উপর জোর দিতে হবে, যেখানে বর্ষা-বন্যা-পানিকে ব্যবহার করতে হবে দুর্গমতা ও যুদ্ধবিকাশের অনুকূল উপাদান হিসেবে, সেখানে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মত প্রধান নদীগুলোকে ধরে হতে পারে সেই অক্ষ, যাকিনা প্রায় সারা দেশকে কভার করতে পারবে এবং যা পূর্বে আলোচিত রণনৈতিক অঞ্চল নির্ধারণের ভৌগলিক বিশেষত্বকেও নিজের মধ্যে ধারণ করবে।

১২। বাহিনী গঠন– প্রথম থেকেই নিয়মিত গেরিলা দল (নিগেদ) গঠনকে আঁকড়ে ধরা এবং দু'পায়ে চলা ঃ

গণযুদ্ধের সূচনায় বাহিনী অনিয়মিত গেরিলাদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারে, যদিও প্রথমেই নিয়মিত গেরিলা দলও গঠিত হতে পারে, যাকিনা পরিস্থিতি ও আত্মগত সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু অনিয়মিত গেরিলাদের সংগঠনকে নিয়ে গণযুদ্ধকে উচ্চতর মাত্রায় বিকশিত করা যায় না। এমনকি নিম্নমাত্রার বিপ্লবী যুদ্ধও দীর্ঘদিন ধরে চালানো যায় না। কারণ, এটা শত্রু দমনে আত্মরক্ষা ও পাল্টা-আক্রমণ উভয়টাতেই দীর্ঘদিন কার্যকর থাকে না। গণযুদ্ধ ব্যাপক জনসাধারণের কাজ, তাই, কঠোর গোপনীয়তা তার এই গণচরিত্র ও গণলাইনকে লংঘন করে– যা শুধুমাত্র প্রাথমিক অবস্থাতেই কিছু সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

তাই, যতদ্রুত সম্ভব রণনৈতিক অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত গেরিলা দল (নিগেদ) গঠনকে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। যা আমাদের সামর্থ্যের (কেডার, গেরিলা, অস্ত্র, দক্ষতা প্রভৃতির) শ্রেষ্ঠ অংশটির আপেক্ষিক কেন্দ্রীকরণ করে। যা ব্যাপক চলমানতা দ্বারা ও প্রাথমিক সামরিক সতর্কতা দ্বারা তাকে রক্ষা করতে পারে, দুর্বল শত্রুর দমনে টিকে থাকতে পারে, এমনকি পাল্টা-আক্রমণেও যেতে পারে। তাই, নিগেদ-ই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান বাহিনী।

কিন্তু নিগেদ-কে প্রধান বাহিনী হিসেবে গড়ে তুললেও তার ভিত্তি হলো স্থানীয় গেরিলা-স্কোয়াডগুলো– যাকিনা গণভিত্তি অর্জনের প্রক্রিয়ায় একটি অংশ গণমিলিশিয়ার রূপ নেবে, আর অন্য অংশটি স্থানীয় বাহিনী রূপে মৌসুমী সার্বক্ষণিক বা আধাসার্বক্ষণিক রূপে কাজ করবে। অন্যদিকে প্রধান বাহিনীটি বিকশিত হয়ে সেকশন থেকে প্লাটুন, কোম্পানী------এভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী রূপে গড়ে উঠবে।

বাহিনীর এই গঠন প্রক্রিয়াকে অনিয়মিত গেরিলাদের সংগঠন, আর নিয়মিত গেরিলা বাহিনী– এভাবে যান্ত্রিকভাবে বিকাশের দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা উচিত নয়। যদিও বাস্তব কাজে বহু সময়েই অনিয়মিত থেকে নিয়মিতকরণ– এভাবে তার বিকাশ

ঘটতে পারে। কারণ, উপরোক্ত ধরনে পর্যায়-বিভক্তি আমাদের বাহিনী গঠনে এই কেন্দ্রীকরণকে পিছিয়ে দিতে পারে। এটা বাহিনী গঠনকেই শুধু দুর্বল করে দেবে তা নয়, যুদ্ধকেও দুর্বল করে দেবে। এমনকি এর ফলে আমাদের সমূহ বিপর্যয় ঘটতে পারে।

– তবে প্রধান বাহিনী গঠন, তথা কেন্দ্রীকরণে একতরফা জোর দিয়ে ভিত্তি-বাহিনীকে দুর্বল করলে বা তাকে অবহেলা করলে শেষ পর্যন্ত প্রধান বাহিনী একা হয়ে পড়বে। এটা বিপরীতভাবে বাহিনী ও যুদ্ধকে দুর্বল করে ফেলবে।

তাই, বাহিনী গঠনে প্রথম থেকেই দু'পায়ে চলার নীতি যথার্থভাবে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং তার সঠিক বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৩। বাহিনী-গঠনে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা ঃ

বাহিনী গঠনে উপরোক্ত দু'পায়ে চলার নীতির সাথে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের যথার্থ সমন্বয়ের বিষয়টি জড়িত। কিন্তু শুধু নিয়মিত আর অনিয়মিত'র সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই নয়, যখন নিয়মিত গেরিলা বাহিনী বেশ পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠবে, তখন তার মধ্যে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সমন্বয়ের বিষয়টি একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অনিয়মিত গেরিলা সংস্থান থেকে নিগেদ-গঠন আমাদের শক্তির কেন্দ্রীকরণেরই একটা বিষয়। দমনে বাড়ি-ছাড়া বা অগ্রসর গেরিলা ছাড়াও পার্টি তার সামগ্রিক পরিকল্পনাধীনে তার সার্বক্ষণিক কেডার শক্তিকেও এই কেন্দ্রীকরণের কাজে লাগাবে।

বাহিনী ও যুদ্ধ বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াতেই এই কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সম্পর্কের সমস্যা আসে, এবং তার সঠিক মীমাংসার প্রয়োজন হয়।

বেশ কিছু নিগেদ গড়ে উঠলে একটি প্রধান নিগেদ (প্রধান বাহিনী) গড়তে হবে, যাতে কেন্দ্রীকরণ বেশি হবে। প্রধান বাহিনীকে ধাপে ধাপে উচ্চতর লোকবল ও অস্ত্রাদিতে বিকশিত করতে হবে। এভাবে সেটা প্লাটুনে পরিণত হবে। যখন অনেকগুলো সেকশনের পাশাপাশি বেশ কিছু প্লাটুন গড়ে উঠবে, এবং একটি প্রধান প্লাটুন সৃষ্টি হবে অধিকতর সামর্থ্যের ভিত্তিতে, তখন তাকে কোম্পানিতে উন্নীত করতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর লেবেলে বাহিনী বিকশিত হতে থাকবে, যা যুদ্ধ এবং গণক্ষমতাকেও উচ্চতর লেবেলে ধাপে ধাপে উন্নীত করবে।

ঘাঁটি এলাকার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী প্রধান বাহিনী, ও তার পাশে যথেষ্ট সংখ্যক সহযোগী বাহিনী প্রয়োজন। প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় বাহিনী, মিলিশিয়া। ভাল/অগ্রসর গেরিলা অঞ্চলের জন্যও তা প্রয়োজন হবে, যদিও কিছুটা নিম্নমাত্রায়। অবশ্য সে ধরনের নিয়মিত গেরিলা বাহিনীর চলমানতা ও সংরক্ষণের জন্য দৃঢ় শ্রেণিভিত্তি ও গণভিত্তি, ব্যাপক বিস্তৃতি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন– এ সবও প্রয়োজন যা গণযুদ্ধের বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৪। যুদ্ধের বিকাশে গণলাইন-গণভিত্তি– বিপ্লবী গণসংগঠন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন ঃ

সূচনায় অনিয়মিত গেরিলা সংস্থানের স্থানীয় স্কোয়াড গোপন থাকলেও পার্টি ও বাহিনীকে নীতিগতভাবে গণলাইন প্রয়োগ ও গণভিত্তি স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পরিকল্পিত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে গণলাইনকে দক্ষতার সাথে, শত্রুর চোখ এড়িয়ে কার্যকর করতে হবে, যাতে নিরঙ্কুশ জনগণকে পার্টি-বিপ্লবের সমর্থকে পরিণত করা যায়, অতি অল্পসংখ্যক শত্রু-স্থানীয়দেরকে যতটা সম্ভব নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায়। এটাই নিগেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রকৃত গ্যারান্টি। পাহাড়-জঙ্গলের অভাবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সমর্থক জনগণই হলেন আমাদের অরণ্য, যে জনারণ্যের মাঝে আমাদের পার্টি ও বাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারবে। অবশ্য বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত সর্বস্তরে ও সমস্ত এলাকায় পার্টি-সংগঠনের এবং সামরিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা ও সতর্কতা পার্টি ও বাহিনীকে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। বিশেষত শত্রু এলাকায় এর গুরুত্ব খুবই বেশি থাকতে হবে। নতুবা শত্রুর দমনে পার্টি ও বাহিনীকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

গণলাইনের প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সমর্থক জনগণকে শুধুমাত্র সহানুভূতিশীলের পর্যায়ে রেখে পার্টি ও বাহিনীর কর্মকান্ডের সমর্থক করে রাখলে ব্যাপক জনগণকে গণযুদ্ধ তথা বিপ্লবের কাজে সক্রিয় করা যাবে না। এখানেই উদ্ভূত হয় পার্টি ও বাহিনীর সাথে একত্রে, পাশাপাশি, শুরু থেকেই যুক্তফ্রন্ট গঠনের সমস্যা। পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়, যাতে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার জনগণ নিজ নিজ আওতায় বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে, তার বাস্তবায়নের জন্য ও তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হন। জনগণের এইসব গনসংগঠনের যুক্ত কার্যক্রম বা যুক্তমোর্চা ভ্রূণাকারে বিপ্লবী ক্ষমতার সংস্থা হিসেবেও আবির্ভূত হয়– যা কিছু পরে একত্রে "বিপ্লবী কমিটি" হিসেবে আবির্ভূত হবে। এটাই একেবারে নিচুতলায় নতুন রাষ্ট্র ও নতুন সরকার।

এটা না করলে গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় যে ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেখানে পার্টি ও বাহিনীর ক্ষমতা সৃষ্টি করবে। এটা এক বিপজ্জনক বিচ্যুতি, যা বিগত শতকে মাওবাদী সমগ্র আন্দোলনকে নৈতিকভাবে অধঃপতনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং এই রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। যাকিনা বিপ্লবী গণসংগঠন ও বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠনের আলোচ্য সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

এই রাজনৈতিক সাংগঠনিক তথা যুক্তফ্রন্টের কার্যক্রম ব্যতীত গণযুদ্ধ সঠিকভাবে ও সফলভাবে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হবে।

– এইসব গণসংগঠন জাতীয়-পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে, বা স্থানীয় সমস্যার ভিত্তিতে প্রকাশ্য/আধা-প্রকাশ্য ধরনের ও আংশিক গণসংগ্রাম গড়ে তুলতেও ব্যবহৃত হতে পারে। স্বনামে, বেনামে বা অন্য নামে। এগুলোও গণযুদ্ধকে রক্ষা ও বিকশিত

করবার সহায়ক, একইসাথে জাতীয়ভিত্তিক গণসংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানমূলক কাজেও এটা ভূমিকা রাখবে।

১৫। গণযুদ্ধ এবং বিপ্লবী কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও ক্ষমতাদখল ঃ

উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহিনী ও যুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় গণলাইন কার্যকর হতে হবে, বিপ্লবী গণসংগঠন সমূহ গড়ে উঠবে, বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট ভ্রূণাকারে গড়ে উঠবে, যা কিনা কর্মসূচি বাস্তবায়নকে হাতে নেবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হলো কর্মসূচির কেন্দ্রীয় বিষয়। আর এটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যতীত হতে পারে না। এ দুটো একে অন্যকে দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত করে, যদিও ক্ষমতার প্রশ্নটি হলো প্রধান। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক কর্মসূচির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে একতরফাবাদী ভুল হবে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নই হলো সেই চাবিকাঠি যাকিনা গণভিত্তি অর্জনকে সম্ভব করে তোলে। এর মধ্য দিয়ে নিপীড়িত জনগণ ভবিষ্যত রাষ্ট্রের একটা আভাস পান, যা তাদেরকে সেই লক্ষ্যের প্রতি অনুগত করে তোলে, সেজন্য পার্টি ও গণবাহিনীকে রক্ষায় সক্রিয় করে তোলে, গণযুদ্ধে আরো বেশি বেশি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

সশস্ত্র সংগ্রামের অঞ্চলগুলো এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার গুণগত উলম্ফন ঘটিয়ে এ অঞ্চলগুলোকে ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি, যার কেন্দ্রে থাকবে জনগণের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া, গণযুদ্ধ বিকাশের জন্য একটি নির্ধারক বিষয়। যা ছাড়া গণভিত্তি অর্জন ও তাকে গভীর করা যায় না, বাহিনীকে বিকশিত করা যায় না, এবং যুদ্ধকে বিকশিত করা যায় না।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের কিছু কাজ পার্টি ও বাহিনী নিজেরা কার্যকর করতে পারে ও করতে হবে। কিন্তু জনগণের গণসংগঠনের প্রক্রিয়াকে বিকশিত না করলে এটা পার্টি-বাহিনীর ক্ষমতা সৃষ্টির বিপদ সৃষ্টি করবে, যা শেষ পর্যন্ত নৈতিক অধঃপতনেও আন্দোলনকে নিয়ে যেতে পারে, যার বহু দৃষ্টান্ত বিগত ইতিহাসে রয়েছে।

১৬। দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের ও রূপের গণসংগ্রাম ঃ

রণনৈতিক অঞ্চলগুলোকে ভিত্তি করে ও দেশব্যাপী ক্রমবিস্তৃত গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় শহরাঞ্চলের ও দেশব্যাপী জনগণের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করা যাবে না কোনোক্রমেই। ছোট ও প্রধানত একভাষাভাষী ঘনবসতির দেশ হওয়াতে, এবং যোগাযোগ ও যাতায়াতের বিপুল বিকাশ ও বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশের কারণে গণযুদ্ধ কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠলেই তা দেশব্যাপী জনগণকে আলোড়িত/প্রভাবিত করতে থাকবে। সাধারণভাবে দেশে যে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করে, শাসকশ্রেণি নিজেদের মাঝে চরম কোন্দলে লিপ্ত, বুর্জোয়া রাজনীতি গণবিচ্ছিন্ন, জনগণ বিকল্প পথের সন্ধানে; অন্যদিকে জনজীবনে ক্রমবর্ধিত অনিশ্চয়তা, চরম

শোষণ, দারিদ্র, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ লুণ্ঠন অনুপ্রবেশ আগ্রাসন, এবং এসবের সাথে সাথে স্বৈরাচারী শাসন ও ব্যবস্থা– সবমিলিয়ে একদিকে দেশব্যাপী সর্বত্র গেরিলা স্কোয়াড গঠন করা ও সশস্ত্র এ্যাকশনকে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি অন্যদিকে বিভিন্নরূপী ও বিভিন্নধরনের গণসংগ্রাম গড়ে তোলার ও গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই বিভিন্ন চরিত্রের ও রূপের গণসংগ্রাম শাসকশ্রেণির সাথে শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী, দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের দ্বন্দ্বকে তীব্র করবে, শাসকশ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে তীব্র করবে, তাদের সংকটকে বর্ধিত মাত্রা দেবে, বেশি বেশি জনগণকে গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী রাজনীতির বলয়ে টেনে আনবে, এবং গণযুদ্ধ ও বিপ্লবের পক্ষে এক বিপুল জনসমর্থনের ছাতা ও ঢাল সৃষ্টি করবে। যা গণযুদ্ধের বিকাশের জন্য খুবই নির্ধারক।

এ ধরনের গণসংগ্রাম সব-ই যে আমাদের নেতৃত্বে ঘটবে তা নয়, বরং তার বিপুল অধিকাংশই আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবে ও তার বাইরে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সংগঠিত অসংগঠিত শক্তির মাধ্যমে সুচিত ও পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এসবের প্রতি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে, পার্টি ও গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় সচেতন নেতৃত্ব দিয়ে এ ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

সুতরাং গণযুদ্ধকালে তো বটেই, এ প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে গণযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল থেকেই।

১৭। রাজনৈতিক সংগ্রাম, সংলাপ, কৌশলগত তত্ত্ব এবং সামরিক আক্রমণাভিযানের পাশাপাশি রাজনৈতিক আক্রমণাভিযান পরিচালনা ঃ

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা শাসিত ঘনবসতিপূর্ণ প্রায় এক ভাষাভাষীর একটি ছোট দেশ হিসেবে আমাদের দেশে জাতীয় রাজনীতি দেশের প্রত্যন্ত এলাকাকে পর্যন্ত সহসাই প্রভাবিত ও আলোড়িত করে। এর সাথে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে সারা দেশ থেকে উঠে আসা মানুষদের দিয়ে শহর-নগরগুলো পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া, বিশেষত রাজধানী নগরের অস্বাভাবিক বিকাশ, তথা নগরায়ন, কৃষিরও জাতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ততার বিকাশ, যাতায়াত ব্যবস্থার বিপুল উন্নয়ন, ফোন-মোবাইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের অভূতপূর্ব বিকাশ, এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির বদৌলতে বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক বিকাশ– এসবকিছুর ফলশ্রুতি হিসেবে দেশব্যাপী জাতীয় রাজনীতির প্রভাব বিরাটভাবে বিকশিত হয়েছে। তাই, গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে গণযুদ্ধের বিকাশ এবং অনুকূল প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার তৎপরতায় আমাদের সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হলেও নগর/রাজধানীকেন্দ্রীক জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে পরিচালনা করতে

হবে। এ কারণে গণযুদ্ধের বিকাশে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম খুবই গুরুত্ব ধরে।

– রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো রাষ্ট্রশক্তির সাথে গণযুদ্ধের, তথা পুরনো রাষ্ট্রের সাথে নতুন বিপ্লবী রাষ্ট্রের সংলাপের বিষয়। গণযুদ্ধের বিকাশের বিভিন্ন মোড়ে, রাষ্ট্রশক্তি গণশক্তির সাথে সংলাপের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। এটা তারা করে থাকে স্বইচ্ছায় স্বপরিকল্পনায়, অথবা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েও। প্রতিক্রিয়াশীলদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কোনো পক্ষ একে ব্যবহার করতে চাইতে পারে বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে। অথবা গণযুদ্ধ'র বিকাশকে প্রতিহত করার কৌশল হিসেবেও তারা এটা আনতে বাধ্য হতে পারে। যেভাবেই ঘটুক না কেন, রাষ্ট্রশক্তি নিঃসন্দেহে জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থসিদ্ধির কোনো সৎ উদ্দেশ্যে এটা করে না। তারা এটা করে থাকে বিপ্লবকে ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট করার প্রতিবিপ্লবী উদ্দেশ্য থেকেই। কিন্তু এটা গণযুদ্ধের বিকাশের প্রেক্ষিতে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রকে তুলে ধরে, যাকে সরলরৈখিকভাবে সর্বদা প্রত্যাখ্যান করা চলে না। এটা গণযুদ্ধের বিকাশের সাথে জড়িত একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়। বরং নেপালের প্রাক্তন বিপ্লবীদের মত বলা যায় যে, সংলাপের কৌশলে শত্রু খেলে, আমাদেরও খেলা উচিত; একে লড়াই-এর একটি নতুন ফ্রন্ট হিসেবে দেখা উচিত, যে ক্ষেত্রেও আমরা জয়লাভ করতে পারি।

অনেক সময় আলোচনা-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যানই শত্রুর উন্মোচনের উপায় হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় তার এই খেলায় অংশ নেবার মধ্য দিয়েও তাকে উন্মোচন করা, তার নতুন চক্রান্তকে পরাজিত করা, জনগণকে আরো সচেতন করা ও বিপ্লবী রাজনীতিতে সজ্জিতকরণ, পার্টির সুসংবদ্ধকরণ এবং যতটা সম্ভব বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামরিক ফসল তুলে নেয়া যায়। পরবর্তী সামরিক অভিযানের জন্য আমাদের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নেবার জন্য এর ব্যবহার ফলপ্রসূ হতে পারে। এমনকি আমাদের দুর্বল পরিস্থিতিতে গুছিয়ে নেবার সময় নেয়া, শত্রুর বৃহত্তর আক্রমণকে আটকে দেয়া বা পিছিয়ে দেয়া– এসব উদ্দেশ্যেও আমরা একে কাজে লাগাতে পারি। এক্ষেত্রে অতীতে লেনিন ও মাও কর্তৃক সংলাপের দৃষ্টান্ত ছাড়াও সাম্প্রতিককালে নেপাল-গণযুদ্ধকালে সংলাপের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। একইসাথে পেরু ও নেপালের পরবর্তী ইতিহাসে সংলাপ-সূত্র ধরে ডান লাইন আসবার নেতিবাচক দৃষ্টান্ত থেকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

– রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে কৌশলগত তত্ত্বের গুরুত্ব বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। নেপাল বিপ্লবের অগ্রগতিতে এই কৌশলগত তত্ত্বের ভিত্তিতে সংলাপ ছাড়াও কৌশলগত কর্মসূচি উত্থাপন আমাদের নজরে রাখা উচিত– যদিও কৌশলের দ্বারা নীতিকে খেয়ে ফেলার নেপালি ট্র্যাজেডি থেকেও আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

– গণযুদ্ধের বিকাশে সামরিক আক্রমণাভিযান, এবং রাজনৈতিক আক্রমণাভিযান-কে পরাপর পরিচালনার নেপাল-অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীলভাবে আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের দেশে সামরিক বা বেসামরিক প্রকাশ্য স্বৈরাচার ও তার বিরুদ্ধে সকল জনগণ, এমনকি শাসকশ্রেণির বিভিন্ন অংশের সংগ্রামের বিরাট উপর্যুপরি ইতিহাস রয়েছে (আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-সালের মার্চ-অভ্যুত্থান, বাকশাল ও এরশাদবিরোধী আন্দোলন, এমনকি সাম্প্রতিক দুই-বছরের সেনা-সুশীল স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন– ইত্যাদি)। এছাড়াও বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রকালেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বৈরাচার এতটাই বেড়ে ওঠে যে, মাঝে মাঝে প্রায় এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাগুলোতে জাতীয় আন্দোলনমুখর এবং মাঝে মাঝে অভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গণযুদ্ধকে এই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি মুখ সরিয়ে রাখলে তো চলবেই না, বরং সচেতনভাবে এমন পরিস্থিতির জন্য কাজ করতে হবে, সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কৌশলগত কর্মসূচি, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং গণযুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থানের সমন্বিত তৎপরতায় দক্ষ হতে হবে। এসবই কৌশলগত তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে যা গণযুদ্ধ টিকে থাকা ও বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমদিকে শহরকেন্দ্রীক গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমে এটা পরিচালনা করলেও সমগ্র পার্টিব্যাপী এতে সজ্জিত হতে হবে এবং শক্তির বিকাশের প্রক্রিয়ায় খোদ পার্টি-নামেই এতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৮। বিশেষ ও সাধারণ এ্যাকশনের সমন্বয়

সাধারণ এ্যাকশন নির্দিষ্ট স্তরের এলাকার/বাহিনী দ্বারা চালিত প্রচলিত ধরনের এ্যাকশন– যা ঐ নির্দিষ্ট এলাকা, ফ্রন্ট, উপঅঞ্চল বা অঞ্চলের বাহিনী-শক্তি নিজ নিজ সামর্থ্যে পরিচালনা করতে পারে। বিশেষ এ্যাকশন হলো উচ্চতর ধরনের কেন্দ্রীভূত এ্যাকশন, যাকে এভাবে শুধু নির্দিষ্ট শাখার শক্তিতে সম্পন্ন করা যায় না। এজন্য বিভিন্ন শাখার শক্তির কেন্দ্রীকরণ, বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রয়োজন হয়।

সাধারণ এ্যাকশন সংগ্রামকে বিস্তৃত করে, বিশেষ এ্যাকশন তাকে উচ্চতর স্তরে উলম্ফন ঘটায়। তার গুণগত বিকাশ ঘটায়।

প্রতিটি রণনৈতিক পরিকল্পনা বা যুদ্ধাভিযানে আমাদের এ দুই ধরনের এ্যাকশনের সমন্বয় দরকার। সাধারণ এ্যাকশনে সীমাবদ্ধ থাকলে যুদ্ধ উচ্চতর স্তরে, গুণগত বিকাশে যাবে না। একই বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকবে। ফলে একদিকে শত্রুর উচ্চতর আক্রমণে আমরা পরাজিত হবো, অন্যদিকে এটা যুদ্ধে ক্রমান্বয়বাদ ডেকে আনবে, যা রাজনৈতিকভাবে অর্থনীতিবাদের ভিত্তি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে শুধুই বিশেষের জন্য অপেক্ষা করলে সংগ্রাম বিস্তৃত হবে না। আমাদের আত্মগত শক্তি বাড়বে না। শত্রু সংহত হয়ে যাবে। এবং বিশেষ এ্যাকশনও কার্যকর করা যাবে না। এটা শেষ পর্যন্ত স্থানীয় উদ্যোগে স্থবিরতা নিয়ে আসবে।

কোনটা সাধারণ এ্যাকশন, আর কোনটা বিশেষ, সেটা কোনো স্থির বিষয় নয়। আমাদের আত্মগত অবস্থার উপর এটা নির্ভরশীল। এক সময়ে যা বিশেষ, অন্য সময়ে সেটা সাধারণ, যখন নতুন উচ্চতর 'বিশেষ' আবির্ভূত হয়।

সামরিক তৎপরতাকে সর্বদাই এ দু'ধরনের এ্যাকশনের সমন্বয় সাধন করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

১৯। সাধারণ পরিকল্পনা ও বিশেষ পরিকল্পনা

প্রতিটি স্তরের সাধারণ পরিকল্পনাকে তার নিম্নতর স্তরে বিশেষ পরিকল্পনায় রূপ দেয়ার প্রয়োজন হয়। নতুবা উচ্চতর স্তরের সাধারণ পরিকল্পনা বিমূর্ত ও অনির্দিষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

সাধারণ পরিকল্পনা ও বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে দ্বন্দ্বও হয়, যাকে সঠিকভাবে মীমাংসা করতে হয়।

সুতরাং প্রতিটি স্তরকে তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা রচনা ও তার প্রয়োগের উপর জোর দিতে হবে।

নতুবা সাধারণ পরিকল্পনা একটি সাধারণ আহবান হিসেবেই বজায় থাকবে।

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ

এদেশের মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনা থেকেই দেশটিকে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজ বলে মূল্যায়ন করে এসেছে। আমাদের পার্টি ৯০-দশকের সূচনায় একে 'সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর বিকৃত পুঁজিবাদী' বলে চিহ্নিত করার আগ পর্যন্ত মাওবাদী মহলে আধা-সামন্তবাদ প্রশ্নে তেমন কোনো মতপার্থক্য ছিল না। আমরা বিকৃত পুঁজিবাদী মূল্যায়ন গ্রহণ করার সাথে সাথে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সাথে শ্রমিক-কৃষকসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বকে এই প্রথম বারের মত একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব বলে নির্ধারণ করি, এবং একে প্রধান দ্বন্দ্ব বলেও চিহ্নিত করি।

এই নতুন মতাবস্থান এদেশের মাওবাদী আন্দোলনে একটা বড় বিতর্কের সৃষ্টি করে যার মীমাংসা এখনো হয়নি। এ প্রশ্নে একটি মোটা দরের হলেও ঐকমত্য ব্যতীত মাওবাদী আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত ঐক্য সম্ভব নয়।

– ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করায় বিপ্লবের স্তরকে নয়া গণতান্ত্রিক নির্ধারণে কোনো মতপার্থক্য মাওবাদী মহলে না থাকলেও আধা-উপনিবেশ, না নয়াউপনিবেশ, না উপনিবেশ– এই প্রশ্নে সূচনা থেকেই গুরুতর মতপার্থক্য ছিল। যা কিনা প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণে গুরুতর মতপার্থক্য আকারে বজায় ছিল। বিশেষত আমাদের পার্টি যে থিসিসের ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল *(১৯৬৮ সালে কমরেড এসএস কর্তৃক লিখিত "পূর্ব বাংলা শ্রমিক*

আন্দোলনের থিসিস"), সেটা তৎকালীন পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ বলে চিহ্নিত করেছিল, এবং পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাকে আশু কর্মসূচি হিসেবে উত্থাপন করেছিল। এই থিসিসও মাওবাদী আন্দোলনে গুরুতর বিতর্কের উদ্ভব ঘটায়। আমাদের পার্টি কর্তৃক পরবর্তীকালে এই থিসিসের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির সংশোধন ও আত্মসমালোচনার কারণে এই মতপার্থক্যের মীমাংসা অনেকটা সহজ হয়ে এলেও তার সম্পূর্ণ মীমাংসা এখনো হয়নি। বিশেষত আমাদের পার্টি-লাইনের অতীত ভুল ঐতিহ্যকে ধারণকারী বিভিন্ন শক্তি এখনো মাওবাদী আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছে।

এসব সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্তমানকার প্রধানতম মতপার্থক্য আধা-সামন্তবাদকে ঘিরেই। তাই, এই মতভেদের কারণগুলো কী তা আমাদের গভীরভাবে পুনরালোচনা করতে হবে এবং এ প্রশ্নের মীমাংসার একটা সঠিক উপায় বের করতে হবে। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে আমাদের মতাবস্থানের প্রশ্নে এটাই হওয়া উচিত প্রধানতম বিষয়।

প্রথমত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাওবাদী আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে বাস্তব পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ থেকে কাজ না করে প্রধানত তত্ত্বগত যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আন্দোলন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মূল্যায়ন ও আলোচনার ভিত্তিতে না এগিয়ে মূলত এগিয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে। অথচ সঠিক লাইন নির্ধারণে প্রয়োজন হলো এ দুয়ের স্বার্থক সমন্বয়।

চীন ছিল একটি আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ; আর যেহেতু আমাদের দেশটিও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত, কৃষক ও কৃষি প্রধান একটি দেশ– তাই এটাও চীনের মত একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ– এটা ছিল যুক্তির একটি প্রধানতম দিক। যুক্তির আরেকটি প্রধান দিক ছিল সাম্রাজ্যবাদ নিজ পুঁজির স্বার্থে এ জাতীয় দেশের পুঁজিবাদ বিকাশকে আটকে দেয়– তাই, এখানে পুঁজিবাদ প্রাধান্যে আসতে পারে না। আরেকটি যুক্তি ছিল এই যে, যেকোনো ধরনের পুঁজিবাদীই হোক না কেন, যদি অর্থনীতি পুঁজিবাদীই হয় তাহলে বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক, নয়া গণতান্ত্রিক নয়। আরেকটি যুক্তি হলো, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ হলো সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের বিকাশের পথ করে দেয়া; তাই, নয়া গণতান্ত্রিক স্তর বললে আধা-সামন্ততন্ত্রকেও মানতে হবে।

– চীন-বিপ্লব পর্যন্ত ৩য় বিশ্বের সমাজের বিকাশের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত যুক্তিগুলোর মাঝে ব্যাপক যৌক্তিকতা ও সঠিকতা ছিল ও রয়েছে। এটা সত্য যে, ৬০/৭০-দশকে তো বটেই, এখনো পর্যন্ত সমাজের উপরিকাঠামোর সকল ক্ষেত্র, যেমন, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতিসহ কৃষি ও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও প্রচুর

ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। একইসাথে অন্যান্য ক্ষেত্রসহ কৃষিতেও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ এখানকার জাতীয় পুঁজি/শিল্প বিকাশের সব পথ বন্ধ করার সব ধরনের চক্রান্তই চালাচ্ছে। এ অবস্থায় মাওবাদী আন্দোলন তার সূচনায় সমাজ বিকাশের মৌলিক শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিল। এবং সমাজকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলায় তৎকালীন তত্ত্বগত স্তরে বড় কোনো ভুল করেছিল তা বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে বড় কোনো সমস্যা ছিল না সেটাও বলা যাবে না।

– প্রথমত, ১৯৫০/৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদের পর জোতদারী ব্যবস্থা থাকলেও ভূমি-মালিকানার চরিত্র আর পূর্বের মত রইলো না। এটা ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল না। কিন্তু এই সংস্কারের সুদূর প্রসারী তাৎপর্য ছিল। এই সংস্কারের ফলশ্রুতিতে ভূমি-মালিকানার চরিত্র কীভাবে পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে তার ভাল কোনো আলোচনা মাওবাদী আন্দোলন করতে পারেনি। বরং গোড়ামীবাদীভাবে চীনের মত করেই ভূমি সমস্যাকে উত্থাপন করা হয়েছে, যাকিনা উপরোক্ত সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে সঠিক ছিল। এর ফলে তখনো ভূমি-মালিকানার একটা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হতে পারেনি, আর এখনতো নয়ই, কারণ, বিগত ৪০ বছরে এদেশের কৃষিতে ভূমি-মালিকানার ক্ষেত্রে আরো যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ না করলে বিপ্লবী ভূমি সংস্কারের কোনো সার্বিক সঠিক কর্মসূচি হাজির করা যাবে না।

– দ্বিতীয়ত, এইসাথে আদি মহাজনী শোষণের রূপেও বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে জমিদারী প্রথার পাশাপাশি যে আদি মহাজনী শোষণটা ছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে। সুদী কারবার এখনো সমাজে প্রকটভাবে বিরাজ করছে, কিন্তু সেটা পূর্বের মত করে কৃষকদের বিপরীতে একটি গ্রাম্য মহাজন শ্রেণি কর্তৃক কমই পরিচালিত হচ্ছে। এর শুরু আগে থেকেই ঘটেছে। কিন্তু মাওবাদী আন্দোলন একে ভাল কোনো আলোচনা করেনি।

– তৃতীয়ত, কিন্তু আরেকটি বড় সমস্যা যা হয়েছে তাহলো, মাওবাদ অনুসরণে এদেশে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণিকে বিপ্লবের একটি প্রধানতম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এই নবীন শ্রেণিটির ভাল কোনো আলোচনা মাওবাদী আন্দোলন কখনই করেনি। বিপ্লবকে 'সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী' বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির বিকাশ ও অস্তিত্বকে, বিশেষত তার ক্রমবর্ধিত প্রাধান্যকে আমল দেয়া হয়নি। মাওবাদী আন্দোলনের কোনো ধারাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বগুলো নির্ধারণে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকে কোনো স্থান দেয়নি।

অথচ ক্রমবর্ধিতভাবে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণির হাতে। বৃহৎ ভূমি-মালিকানাভিত্তিক সনাতন সামন্তশ্রেণি (জমিদার-তো নয়ই, জোতদার অর্থেও) ক্রমক্ষয়িষ্ণু, বহু এলাকায় অস্তিত্বহীন; এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় তারা দ্রুতগতিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া নেতৃত্বে নগরায়ণের বিপুল বিকাশ, যা জাতীয় শিল্পের বিপরীতে হলেও বেশ পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর শিল্প ও বিপুল বাণিজ্য বিকাশের সৃষ্টি করেছে– ফলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার কর্তৃত্ব দেখা যাচ্ছে। আর এরই সূত্র ধরে তার ইচ্ছামুক্তভাবে বহুবিধ ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক কৃষি গড়ে উঠেছে, যাকে জাতীয় শিল্প/পুঁজি বলা চলে– যার বিপুল দমন ও ধ্বংসসাধন সত্ত্বেও যা পুঁজিবাদ বিকাশের আবহে নিজেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

– এই ধরনের এক অবস্থায় ৯০-দশকের শুরুতে আমাদের পার্টি আমলা-মুৎসুদ্দি বূর্জোয়ার সাথে দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করে এবং সমাজকে "নয়া উপনিবেশিক বিকৃত পুঁজিবাদী" বলে চিহ্নিত করে।

আমরা তিনটি বিষয়কে তখন গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করি। যথা– এক, গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ ভূমি-মালিকানাভিত্তিক আদি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির রূপান্তর ঘটেছে; দুই, সেকারণে কৃষকের সাথে সামন্তশ্রেণিটির যে দ্বন্দ্বকে আগে সঠিকভাবেই দেশের অভ্যন্তরীণ প্রধান দ্বন্দ্ব, ও সামন্তশ্রেণিটিকে অভ্যন্তরীণ প্রধান শ্রেণিশত্রু বলা হতো তার পরিবর্তন ঘটেছে; এবং তিন, এ কারণে আগে যেভাবে সামন্তশ্রেণির জমি কৃষকের মাঝে বন্টনের কর্মসূচিকে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরা হতো তারও পরিবর্তন হয়েছে, যদিও বিপ্লবী ভূমি-সংস্কার এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হয়েই রয়ে গেছে।

বলাই বাহুল্য যে, একই সময়ে সূচিত সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্বায়ন' পলিসির মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রায় দেড়/দুই দশক জুড়ে পৃথিবীর অন্য আরো বহু দেশসহ আমাদের দেশেও এই প্রক্রিয়া আরো অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বৃহৎ ভূমি-মালিকানাভিত্তিক আদি সামন্তশ্রেণি আরো ক্ষয় হয়েছে, এবং রূপান্তরিত হয়ে নতুন শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। তাদের একটি অংশ ধনী কৃষকে নেমে গেছে বা গ্রামীণ/নাগরিক ক্ষুদে বুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে। অন্য অংশ গ্রামীণ কৃষি বুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে, বা কেউ কেউ আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিতে তার উত্তরণ ঘটিয়েছে। বাস্তবে বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি বহু আগেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করেছে, এবং তার থেকে রূপান্তরিত আমলা-মুৎসুদ্দি অংশটি বাদে বাকিরা ধনী কৃষক, নাগরিক বা গ্রামীণ ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বিভিন্ন স্তর অথবা কৃষি বুর্জোয়ার বিভিন্ন মাত্রার মিশ্রণ হিসেবে বেড়ে উঠেছে। আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি আরো বিপুল মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আরো বিরাট অংশ নিঃস্ব হয়ে শহরে পাড়ি দিয়েছে। কৃষি থেকে উচ্ছেদকৃত বা আংশিকভাবে উচ্ছেদকৃত একাংশ গ্রামাঞ্চলেই বিভিন্ন ধরনের মজুরি, ক্ষুদে উৎপাদন,

ক্ষুদে ব্যবসা, বা সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করে কোনো রকমে বেঁচে রয়েছেন। বেকার সমস্যা বিরাটাকারে বেড়ে গেছে, যা বিদেশে শ্রমশক্তি রফতানির নতুন বাণিজ্য দ্বারা শাসকশ্রেণি কোনো রকমে মোকাবেলা করে চলেছে। এটা আবার শ্রেণিসজ্জায় নতুনতর বৈচিত্র ও বিকৃতি বিকশিত করেছে। নগরায়ণের বিপুল বিকাশ ঘটেছে, সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর শিল্প-বাণিজ্য আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কৃষিতেও মুনাফাভিত্তিক চাষ আরো বেড়ে উঠেছে। তাই, আমাদের পার্টি যে পরিবর্তন ও নতুন উপাদানগুলোর প্রতি তখন গুরুত্ব দিয়েছিল, তা বস্তুনিষ্ঠ সমাজ বিশ্লেষণের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।

– কিন্তু আমাদের উক্ত মতাবস্থান গ্রহণে কতকগুলো গুরুতর সমস্যা ও ত্রুটি ছিল।

প্রথমত, আমরা সমাজ ও কৃষির এই পরিবর্তন ও নতুন উপাদান/দিকগুলোকে সুস্পষ্ট তথ্য-উপাত্ত দ্বারা উপস্থাপন করতে পারিনি।

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বগতভাবেও আমরা একে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।

উপরোক্ত দুটো মৌলিক কাজকে এগিয়ে না নিয়ে আমাদের এই মতাবস্থান গ্রহণটা ছিল উপরিউপরি, যাকিনা 'আধা-সামন্ততন্ত্র' ক্ষেত্রে আদি মাওবাদী আন্দোলনে একইভাবে বিরাজমান ছিল। আমরা একই ধারাতে পরিচালিত হয়েছি, যদিও আগের মত গোড়ামীবাদী ধরনে না চলে সমাজের নতুন রূপান্তর ও চলমান পরিবর্তনগুলোকে এ্যাড্রেস করবার একটা প্রচেষ্টা আমাদের মাঝে ছিল। কিন্তু সেটা হয়ে পড়ে প্রয়োগবাদী ধরনের।

আমরা দ্রুত সাধারণীকরণের ত্রুটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, যা মার্কসবাদী মৌলিক নীতি থেকে সরে যাবার ঝুঁকি সৃষ্টি করে, এবং যা কিনা মাওবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে একটা নতুন বিভক্তিকে শর্ত দেয়।

– তত্ত্বগতভাবে আধা-সামন্তবাদকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের গুরুতর দুর্বলতা ছিল। সামন্তবাদকে নিছক বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানার মধ্যেই আমরা দেখতে চেয়েছি। ফলে তার অনুপস্থিতিতে/দুর্বল হতে থাকার অবস্থায় আমরা সামন্তবাদের বদলে পুঁজিবাদ সূত্রায়নকে গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ প্রাধান্যে থাকার অর্থ আমরা করেছি বাধ্যতামূলকভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্ক থাকা। কিন্তু আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামন্ত বৈশিষ্ট্যকে আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। পাশাপাশি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককেও ভালভাবে উপলব্ধি করতে আমরা পারিনি। এসবই সূচনা থেকেই মাওবাদী আন্দোলনে মজ্জাগত ছিল। যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি, এবং উপলব্ধিকে গভীরতর জায়গায় বিকশিত করতে পারিনি।

সুতরাং আমাদের ৯০-দশকের এই মতাবস্থানসহ সমগ্র বিষয়টিকেই আমাদের পুনরালোচনা করতে হবে।

– তাসত্ত্বেও আমাদের এটা তুলে ধরতে হবে যে, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে মাওবাদী আন্দোলনের আদি ও ধারাবাহিক দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে আমাদের উপরোক্ত দুর্বলতা/ত্রুটি বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু, আমাদের এই বিবেচনা সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের দুর্বলতাকে প্রকাশ করার একটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সিরিয়াস বিপ্লবীদের প্রত্যেকেই আজ স্বীকার করেন যে, সামন্ততন্ত্র আগের রূপে নেই, বা ৪০ বা ৬০-দশকের মত করে, অথবা বিপ্লব-পূর্ব চীনের মত করে কৃষিকে দেখলে চলবে না। সুতরাং সামন্ততন্ত্র কী রূপে বিরাজ করছে, এবং সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণে কী কী নতুন দিককে আমাদের তুলে ধরতে হবে সেটা খুবই গুরুত্ব ধরে। এক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা ও পর্যালোচনার নতুন বিষয়গুলোকে অবশ্যই বাতিল করলে চলবে না। কারণ, সেগুলো অনেকগুলোই সঠিক, যা তথ্য-উপাত্ত সহকারে আরো শক্তভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

– এক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী কাজগুলোকে, এমনকি বুর্জোয়া কাজগুলোকেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও আমরা নিজেদের অনুসন্ধানও কিছু চালাতে পারি সেগুলোর একটা নিজস্ব যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য।

* এ অবস্থায় আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে আমরা কীভাবে সূত্রায়িত করবো, উপস্থাপন করবো, এবং মূল্যায়ন করবো?

– যা সত্য তা হলো এই যে, মাওবাদী আন্দোলন তার এই দুর্বলতা এখনই বা দ্রুতই কাটিয়ে তুলতে সক্ষম নয়। এ সমস্যা কাটিয়ে তুলবার জন্য সময় প্রয়োজন। এটি একটি অন্তর্বর্তীকাল এবং সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনে বিরাজমান দুর্বলতা হিসেবে একে গ্রহণ করে তা কাটিয়ে তোলার জন্য একটি মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন কাজ হিসেবে একে গ্রহণ করতে হবে।

– এটি একটি গবেষণাধর্মী ও তত্ত্বগত কাজ। তাই, এক্ষেত্রে পার্টি ও আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ও তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছে পার্টিকে যেতে হবে, এবং তাদেরকে একাজে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

– এটি শুধু আমাদের দেশের একক সমস্যা নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে একটি সাধারণ সমস্যা, যাকিনা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিকাশ ও নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝে ওঠার সাথে যুক্ত একটি জটিল সমস্যা। কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ৩য় বিশ্বে অনুপ্রবেশ করছে, এবং কীভাবে তা ৩য় বিশ্বের অর্থনীতিতে ও শ্রেণি-সজ্জায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, তার আলোচনা অবধারিতভাবে খোদ সাম্রাজ্যবাদের কার্যক্রম/ফাংশনিং বোঝার সাথে যুক্ত সমস্যা। 'বিশ্বায়ন' পলিসি গ্রহণের পরবর্তীকালে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। তাই, একে খুব তাড়াহুড়া করে নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ীভাবে আলোচনা করতে হবে।

– সুতরাং উপরোক্ত মূল্যায়ন ও করণীয়গুলোর আলোকে আমাদেরকে বর্তমানে সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানগুলোকে তুলে ধরতে হবে। প্রথমত,

আমরা সর্বাপেক্ষা সঠিক মনে হওয়া অবস্থানগুলোকে তুলে ধরবো, তাকে অনুশীলনে নিয়ে যাবো, তার ভিত্তিতে অন্য মতগুলোকে সংগ্রাম করবো। দ্বিতীয়ত, আমরা এসব অবস্থানের বিষয়ে যথেষ্ট নমনীয় থাকবো, যাতে অন্য মতগুলোতে থাকা সত্যকে আমরা সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারি, যাতে অন্য মতগুলোর সাথে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা সঠিক অবস্থানকে বিকশিত করতে পারি, এবং তত্ত্বগত উপলব্ধির বিকাশের প্রক্রিয়ায় আমাদের অবস্থানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বিকাশ সাধন, এমনকি বর্জনও আমরা করতে পারি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের নিম্নোক্ত অবস্থানগুলোকে উপস্থাপন করতে হবে।

* পূর্ব বাংলা হলো সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত একটি নয়া/আধা-উপনিবেশিক দেশ, যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি, এবং যেখানে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদ বিকাশমান। একইসাথে কৃষিসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ও উপরিকাঠামোতে, বিচিত্র রূপে, অসংখ্য সামন্ত সম্পর্ক বিদ্যমান, যদিও বৃহৎ ভূমি-মালিকানা ভিত্তিক আদি সামন্তবাদী ও আদি মহাজন শ্রেণিটি ক্ষয়িষ্ণু।

একারণে, সামন্তবাদের সাথে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্বটি এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব, এবং আমলা-মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে দ্বন্দ্বটি ক্রমবর্ধিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

– আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণিটি সাম্রাজ্যবাদের দালাল, রাষ্ট্রের ক্ষমতার সাথে যুক্ত থেকে বিকাশশীল, বড় বুর্জোয়া শ্রেণি, একচেটিয়া বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সামন্ত চরিত্র বিশিষ্ট।

– সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে সে এদেশের জাতি ও জনগণের একটি স্থায়ী জাতীয় শত্রু হিসেবে বিরাজ করছে। এদেশের আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে আপোষবাদী/আত্মসমর্পণবাদী সম্পর্ক বজায় রাখে। যদিও শাসকশ্রেণির মধ্যে এ প্রশ্নে বিভাজন রয়েছে, যাতে একটি অংশ ভারতের অধিকতর দালালীর ভূমিকা নেয়, যেখানে অন্য অংশটি ভারতকে যতটুকু সীমিত বিরোধিতা করা যায় সেটা করে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের বলয়ে নিজের বিকাশ ঘটাতে চায়।

– একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণি, অন্যদিকে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী– সমাজবিকাশের মূল দ্বন্দ্বটি গঠন করে, যার মীমাংসার উপর সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর নির্ভর করে।

এর অর্থ এমন নয় যে, জনগণের শত্রু পক্ষটি একটি অখণ্ড সত্তা। অথবা তারা এক ও অবিভাজ্য– যেমন কিনা মাওবাদী আন্দোলনের প্রথম যুগে কোনো কোনো মাওবাদী ধারা বলেছিল। শত্রু পক্ষের বিভিন্ন শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি স্বার্থ ও ভূমিকাও

রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই শত্রুগুলো পরস্পর জড়িত, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, এবং সকলে মিলে জনগণের বিপক্ষে একটা অক্ষ গঠন করে এবং তারা একত্রে মিলেই পূর্ববাংলার সমাজের মৌলিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে গড়ে তোলে।

– জমিদারী উচ্ছেদ এবং বিগত অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে সমগ্র সমাজের সাথে সাথে কৃষিতেও সাম্রাজ্যবাদের যে বিপুল অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও তা যে রূপান্তরগুলো সেখানে ঘটিয়েছে, সেসবের ফলশ্রুতিতে গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ ভূমি-মালিকানা ভিত্তিক সামন্ত শ্রেণির রূপান্তর ঘটেছে।

এখনও কিছু কিছু পকেটে সে ধরনের জোতদারী অর্থনীতি প্রাধান্যে আছে বটে, এবং অনেক জায়গায় তার কিছ কিছু অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা কৃষি উৎপাদনের প্রধান চিত্র নয়। এবং যা রয়েছে সেটাও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

সুতরাং বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকদের সাথে কৃষকের দ্বন্দ্বটি এখন আর প্রধান দ্বন্দ্ব নয়। বরং আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে কৃষকসহ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটি হলো প্রধান দ্বন্দ্ব।

এবং, অভ্যন্তরীণ শ্রেণি-দ্বন্দ্বটি প্রধান হওয়ার কারণে স্বভাবতই বিপ্লবী যুদ্ধের রূপ হলো গৃহযুদ্ধ।

– বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ভুমি মালিক শ্রেণীর ব্যাপক রূপান্তর সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো বিরাজ করছে আমলা-মুৎসুদ্দী শ্রেণির কর্তৃত্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার বিবিধ শ্রেণির মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এক্ষেত্রে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদীরাই হলো প্রধান বাধা।

কৃষি উৎপাদনে ক্ষুদে মালিকানা ও ক্ষুদে উৎপাদনের মাঝে এই সামন্ত সম্পর্কগুলো বিরাজ করে, যে সম্বন্ধে ভাল বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বর্গা প্রথা, বন্ধকী-দাদন, সুদী কারবারের মাধ্যমেও সামন্ত সম্পর্কগুলো বজায় রয়েছে। এই সম্পর্কগুলো কিছুটা আদি সামন্ততান্ত্রিক জোতদার শ্রেণি ধারণ করলেও ব্যাপকভাবে তা আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিও আত্মীকরণ করে নিয়েছে। একইসাথে জনগণের মধ্যকার বিভিন্ন শ্রেণিও তার অনুশীলন করে চলেছে।

এছাড়া রাষ্ট্র বহু ধরনের সামন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে ও ধারণ করে। যা কৃষিসহ উৎপাদনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে।

– কৃষি ক্ষেত্রে এইসব সামন্ত সম্পর্কের অবসান নিঃসন্দেহেই কৃষি-বিপ্লবের কাজ। তবে সনাতন কৃষি-বিপ্লবের থেকে এর নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে যাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় রাখতে হবে। এই "কৃষি বিপ্লব" একদিকে বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকদের প্রাধান্য না থাকলেও ব্যবস্থার মধ্যে ও তার অধীনে বিরাজমান সকল ধরনের সামন্ত সম্পর্কগুলো উচ্ছেদ ও অবসানের মধ্য দিয়ে, বিশেষত "খোদ কৃষকের হাতে জমি"– এই নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি সংস্কারকে পরিপূর্ণতা দানের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষকের মুক্তির পথ খুলে দেবে। তেমনি অন্যদিকে

সাম্রাজ্যবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণি কৃষির উন্নয়নের নামে যে বিকৃতকরণ করেছে এবং কৃষক ও কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করে এক ব্যাপক মুনাফা লুটছে তারও অবসান ঘটাবে।

– সামন্ত সম্পর্কগুলোর এ ধরনের শক্ত অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, সনাতন সামন্তবাদী শ্রেণিটি এজন্য আর প্রধানতম দায়ী নয়। বরং এদেশের অর্থনীতি রাজনীতিসহ সমগ্র ব্যবস্থাটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তার যা কিছু প্রয়োজনীয় রূপান্তর ও সংরক্ষণ সবকিছুই করছে সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি। তারাই এ দ্বারা প্রকৃত লাভবান হচ্ছে এবং তাদের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে।

তারা সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নের নামে এদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষির এক চরম বিকৃতি সাধন করেছে। সমগ্র অর্থনীতিসহ কৃষিকেও সাম্রাজ্যবাদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে ফেলেছে। তারা এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের পরিবেশের এক চরম সর্বনাশ সাধন করেছে। যার সার্বিক রূপান্তর ব্যতীত এদেশের কৃষক ও জনগণের কোনো সত্যিকার উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

বিদ্যমান ভূমি মালিকানা ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলো এর পথে আশু বাধা সৃষ্টি করলেও সেটা উপরোক্ত রূপান্তরের জন্য প্রধানতম সমস্যা এখন আর নয়। তাই, কৃষিসহ সমগ্র অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদের ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার বিপ্লবী রূপান্তর সাধনই হলো বিপ্লবের মূল কর্মসূচি। যার অধীনস্ত একটি অংশ হলো বিপ্লবী ভূমি সংস্কার।

ভূমি সমস্যা ও বিপ্লবী ভূমি সংস্কার ঃ

১। উপরে উল্লিখিত কারণে ভূমি সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি বন্টনের কর্মসূচিটি আগের চেয়ে জটিল রূপ ধারণ করেছে, যা বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে সমাধান করতে হবে।

তাই, আদি সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণির কৃষি জমি দখল করে কৃষকের মাঝে বন্টন বিপ্লবের কর্মসূচি হিসেবে এখনো গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিপ্লবী ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এতেই সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না। এজন্য আরো অন্যান্য পদক্ষেপের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

২। এখানকার কৃষি হলো এখন প্রধানত ক্ষুদে মালিকানা ভিত্তিক ও ক্ষুদে উৎপাদন।

অধিকাংশ খোদ কৃষকের জমি নেই। কৃষক ব্যাপকহারে নিঃস্ব হয়ে চলেছে।

অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃহৎ উৎপাদনে তেমন একটা রূপ না নেয়ায় মূল শ্রেণির কৃষক/কৃষি মজুররা এখনই জমির জাতীয়করণ চান না, বরং তারা চান জমির মালিক হতে। কৃষিমজুর বা ভূমিহীন-গরীব কৃষকদের জমির ক্ষুধা রয়েছে।

অন্যদিকে যা-ই জমি রয়েছে মধ্য কৃষকদের, তারাও সেটা ধরে রাখতে চান।

এসবই হলো গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা, এখনই তা সমাজতান্ত্রিক নয়।

কৃষকের মাঝে ভূমি বন্টন, তথা বিপ্লবী ভূমি সংস্কার ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক কৃষির প্রকৃত লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না।

তাই, 'খোদ কৃষকের হাতে জমি'– এটা হলো মূল নীতি যার ভিত্তিতে বিপ্লবী ভূমি সংস্কার হতে পারে।

৩। জমির মালিকানা কার কাছে?

আগেই বলা হয়েছে, জমি বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীর হাতে কিছুটা রয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে সেই শ্রেণিটি অস্তিত্বশীল নয়।

জমির প্রধান অংশ ভাগ হয়ে গেছে ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক, বা অকৃষক/অনুপস্থিত ভূমি মালিক ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মাঝে। কিছু অংশ চলে গেছে/যাচ্ছে কৃষি বুর্জোয়াদের হাতে, যেখানে মুনাফাভিত্তিক চাষ হয়ে থাকে। নাগরিক শিল্প বুর্জোয়াদের/রাষ্ট্রীয় প্রজেক্টে হাউজিং বা অন্যবিধ শিল্প বাণিজ্য সংস্থাপন তৈরির আমলা-মুৎসুদ্দি বা সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী স্বার্থেও কৃষি জমি দখল করা হচ্ছে।

– সুতরাং বিপ্লবী ভূমি সংস্কার করতে হলে শুধু সামন্ততান্ত্রিক জোতদারদের জমি দখলই যথেষ্ট নয়, বরং আরো অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

৪। বিপ্লবের শত্রুশ্রেণি হিসেবে বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীদের এবং আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জমি বিনা ক্ষতিপুরণে বাজেয়াপ্ত ও ভূমিহীন-গরীব কৃষকদের মাঝে বন্টন করতে হবে।

– রাষ্ট্রের হাতে যে বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে, যা খাস জমি বা পুকুর/জলা নামে পরিচিত, তাও কৃষকদের মাঝে বন্টন করতে হবে।

– এছাড়া জমির শিলিং নির্ধারণ করতে হবে। ধনী কৃষক বা কৃষি বুর্জোয়াদের মাঝারি অংশের উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে নিতে হবে। এই শ্রেণিগুলো মূলত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত। তাই, তাদেরকে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

কৃষি-বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে জমির সিলিং ভিন্ন হতে পারে কিনা তা গভীরতর অনুসন্ধান ও গবেষণা/অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

– এইভাবে ভূমি বন্টন করতে হবে, যাতে ভূমিহীন-গরীব কৃষক/কৃষিমজুর শ্রেণির জমির ক্ষুধা যতটা সম্ভব মেটানো সম্ভব হয়। তাহলেই তারা এই শ্রেণি-স্বার্থের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এবং স্বনির্ভর নয়াগণতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন চালু করবেন। তারপর অতিদ্রুত তারা যৌথকরণের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক কৃষির পথে এগিয়ে চলবেন। বাস্তবে কৃষির সমাজতান্ত্রিকরণ ব্যতীত কৃষক ও কৃষি প্রকৃত উন্নতি ও আধুনিকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। বিপ্লবী ভূমি সংস্কার হলো সে লক্ষ্যেই একটি অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ মাত্র। ভূমিহীন-গরীব কৃষককে

প্রথম থেকেই এ লক্ষ্যে সজ্জিত করতে হবে, এবং শর্ত সৃষ্টি মাত্র সে পদক্ষেপে তাদেরকে পরিচালনা করতে হবে।

৫। অকৃষক ক্ষুদে ভূমি মালিকানা যা রয়েছে তার একাংশ চাষ হয় বর্গা প্রথায়, অন্য অংশ কৃষি মজুর দ্বারা।

এইসব মালিকেরা বিপ্লবের মিত্র, অনেকেই শহরবাসী চাকুরিজীবী, ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ী, এমনকি শ্রমজীবীও রয়েছেন।

তাই এই অংশটিকে বিপ্লবের শত্রু কাতারে যেন ঠেলে দেয়া না হয় সে বিষয়ে যত্নশীল থাকতে হবে। তাদের ক্ষেত্রে বর্গা শোষণ কমানো, এবং পর্যায়ক্রমে ক্ষতিপুরণ প্রদানের মধ্য দিয়ে জমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটানো দরকার।

– কৃষি মজুর দ্বারা, অর্থাৎ পুঁজিবাদী পদ্ধতির চাষের ক্ষেত্রেও শোষণ কমানো, কৃষি মজুরদের দাবি আদায়, এবং পর্যায়ক্রমে ক্ষতিপুরণের মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে নেয়া।

মহাজনী শোষণ ঃ

গ্রামাঞ্চলে মহাজনী শোষণ এখন বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়।

এর সাথে গ্রামীণ ধনীদের কিছু অংশ ছাড়াও অনেক মধ্যবিত্ত ও এমনকি গরিব জনগণও যুক্ত।

এনজিও-রা এতে ব্যাপকভাবে থাবা বিস্তার করেছে।

জনগণের মধ্যকার সমস্যায় শোষণ কমানো এবং অবৈরী উপায়ে ক্রমান্বয়ে এর অবসান ঘটাতে হবে।

এনজিও-দের ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে বৈরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে উৎপাদনমূলক কাজে এনজিও-দের ভূমিকাকে এক ধাক্কায় উচ্ছেদ করা যাবে না। তাহলে উৎপাদনে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং গরিব জনগণকে শত্রুরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। সেজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, এবং ক্রমান্বয়ে এর রূপান্তর ঘটানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

শ্রেণী বিশ্লেষণ ঃ

বিপ্লবের শত্রু হলো–

১। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। যারা হলো বৈদেশিক শত্রু।

২। দেশীয় আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি।
(এদের মাঝে রয়েছে বড় সামরিক অফিসার, বড় বেসামরিক আমলা, বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, বড় শিল্পপতি, বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ, বড় পেশাজীবী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, এনজিও কর্মকর্তা– ইত্যাদি)

৩। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি।
(যার মাঝে রয়েছে বৃহৎ ভূমি মালিক জোতদার, ধনী সুদখোর, এবং হাট-ঘাট-জলা প্রভৃতির ইজারাদার)

বিপ্লবের পক্ষের শ্রেণি–

১। বিপ্লবের নেতা– সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি।
(এর মাঝে রয়েছে বড় মিল-কারখানার সর্বহারা-আধাসর্বহারা শ্রমিক, শহরাঞ্চলের অন্যান্য সর্বহারা-আধাসর্বহারা শ্রমজীবী/শ্রমিক, এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মজুর শ্রেণি, যারা সর্বহারা বা প্রায় সর্বহারা।)

২। বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য মিত্র–
- মিল কারখানার অন্যান্য শ্রমিক, যারা খুব স্বল্প সম্পদের মালিক এবং দরিদ্র,
- ভূমিহীন ও গরীব কৃষক,
- জেলে, তাঁতি, কামার, কুমারসহ দরিদ্র শ্রমজীবী ও দরিদ্র কারিগর শ্রেণি,
- সাধারণ টেকনিশিয়ান,
- ফেরিওয়ালা, ক্ষুদে দোকানদার, দরিদ্র কর্মচারী – ইত্যাদি।

৩। বিপ্লবের ভাল মিত্র–
- মধ্য কৃষক,
- ক্ষুদে মালিক উৎপাদক,
- ক্ষুদে ব্যবসায়ী,
- সাধারণ চাকুরিজীবী, কেরানি, কর্মচারী, শিক্ষক,

৪। বিপ্লবের পক্ষের দোদুল্যমান শক্তি–
- ছোট শিল্পপতি,
- মাঝারি ব্যবসায়ী,
- স্বচ্ছল/উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চাকুরীজীবী, পেশাজীবী,
- ধনী কৃষক,
- ছোট-খাট কৃষি বুর্জোয়া,
- অকৃষক জমিমালিক ক্ষুদে বুর্জোয়া।

বিপ্লবের কর্মসূচী ঃ

সর্বহারা শ্রেণির পার্টির কর্মসূচি হলো বিশ্বব্যাপী শ্রেণিহীন, শোষণহীন কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

এই চূড়ান্ত কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতকে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, এবং জনগণ, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণি ও তার ঘনিষ্ঠতম মিত্র ভূমিহীন-গরীব কৃষককে, এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদেরকে এ বিষয়ে অব্যাহতভাবে শিক্ষিত করতে হবে।

– এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য পূর্ব বাংলার সমাজে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলো আমাদের মৌলিক কর্মসূচি। যদিও এই পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে আমাদেরকে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগে সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের পার্টির কর্মসূচিকে এভাবেই স্থাপন করতে হবে। নতুবা তা পার্টির মধ্যে এবং আমাদের নিজ শ্রেণি ও ঘনিষ্ঠ মিত্র শ্রেণিগুলোর মাঝে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করে তুলবে, যা বিপ্লবের প্রথম ধাপের পর, অথবা সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

এর অর্থ হলো নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবের অংশ হিসেবে শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

– নয়া গণতান্ত্রিক স্তরে আমাদের কর্তব্য হলো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করা। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদসহ সকল বিদেশি শোষণ-লুণ্ঠন-নিয়ন্ত্রণকে উচ্ছেদ করা, তাদের দালাল ও স্বার্থরক্ষাকারী শাসক শ্রেণি আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা এবং দেশীয় সামন্তবাদী সম্পর্কগুলোর অবসান করা। এভাবে জনগণের শত্রু শ্রেণিগুলোর শাসন-শোষণকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াদের যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এর পর বিরতি না দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া।

– পূর্ব বাংলার বিপ্লবটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি সাধারণ শত্রু হলো ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং সে হলো এ অঞ্চলে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রধানতম কেন্দ্র। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জাতি ও জনগণের মাঝে ঐতিহাসিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব ধরে যা সুদীর্ঘকাল ধরে একই ইতিহাস পাড়ি দিয়েছে এবং ফলে তাদের মাঝে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈকট্য খুবই বেশি। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ বিশ্বের কাছাকাছি জাতিসমূহকে আরো ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর নির্ভরশীল করে তুলেছে। উপরোক্ত সব কারণে দক্ষিণ এশিয়ার জাতি ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামগুলো পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে এবং তাকে তা করতে হবে। এসব কারণে আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য বিপ্লবী রাষ্ট্র ও অঞ্চলগুলোর সাথে বিপ্লবী পূর্ব বাংলা যুক্ত হয়ে "দক্ষিণ এশীয় সোভিয়েত" গঠন করার সম্ভাব্যতা বিরাজ করছে। তাই, আমাদের পার্টি ও মাওবাদী আন্দোলন এই কর্মসূচিকে বিপ্লবী ও জনগণের সামনে তুলে ধরা, এর উপর বিতর্ক করা, এবং এর উপর একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কর্তব্যকে পেশ করবে।

* পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের উপরোক্ত অবস্থানগুলো সমগ্রভাবে কোনো চূড়ান্ত বিষয় নয়, যদিও এর মূলগত অবস্থানটি সকল মাওবাদীদের মত আমাদেরও একই।

এ অবস্থায় এক্ষেত্রে আমাদের কোনো গোড়ামী থাকলে চলবে না। মালেমা'র আলোকে তত্ত্বগত বিষয়াবলিতে অধিকতর স্বচ্ছতা অর্জন, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও নতুন বিকাশগুলোকে গ্রহণ করা এবং নমনীয়তার সাথে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে মাওবাদীদের ঐতিহাসিক দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতাকে কাটিয়ে তোলার কর্তব্যকে গ্রহণ করার ভিত্তিতে আর সব মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মাওবাদী ঐক্যের স্বার্থে আমাদের নমনীয় হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই ঐকবদ্ধভাবে মাওবাদীরা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে নিজেদের সামর্থ্যকে বাড়াতে পারবেন।

এক্ষেত্রে সমাজকে আমরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলবো, নাকি সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর বিকৃত পুঁজিবাদী বলবো, অথবা অন্য কোন সূত্রে তাকে প্রকাশ করবো– সে প্রশ্নটি আমাদেরকে আরো অনেকটা সময় ধরে খোলা রাখতে হবে।

* আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের চলমান সমস্যা না হলেও সমাজকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। মাওবাদী আন্দোলনের সূচনা থেকেই যে জাতীয়তাবাদী ও গোড়ামীবাদী বিচ্যুতি তৎকালীন সমাজ-বিশ্লেষণে ও কর্মসূচি উত্থাপনে বিরাজমান ছিল তার উপর মোটাদরের একটি ঐকমত্য ও সারসংকলনও মাওবাদী ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

সেক্ষেত্রে ইতিহাসের কয়েকটি পর্বে কয়েকটি সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো–

– '৭১-পূর্ব কালে, বিশেষত '৭১-সালে জাতিগত সমস্যা ও জাতিগত আন্দোলনের মূল্যায়ন এবং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে এ জাতীয় আন্দোলনের সঠিক সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন।

– বৃটিশ-ভারতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ও ভারতবর্ষের বিভক্তির বিষয়ে মূল্যায়ন।

– এবং, বাংলাদেশ সৃষ্টি ও তার পরবর্তীতে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার মূল্যায়ন ও তৎকালীন প্রধান দ্বন্দ্ব (জাতীয় দ্বন্দ্ব না শ্রেণি দ্বন্দ্ব) নির্ধারণের প্রশ্ন।

এরসাথে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা ও সমাজতান্ত্রিক পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করা, এবং অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির বিষয়টিও রয়েছে।

– এ বিষয়গুলোতে আমাদের সারসংকলন ও মূল্যায়নগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। সুস্থ লাইন সংগ্রাম ও বিতর্ককে বিকশিত করতে হবে এবং মাওবাদী ঐক্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে– লাইনগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে।

পার্টি-গঠন

পার্টি হলো নির্ধারক যা বাহিনী ও যুক্তফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেয় এবং মাও-বিবৃত বিপ্লবের তিন যাদুকরী অস্ত্রকে কার্যকর করে। পার্টি হলো গ্যারান্টি যা কিনা সর্বহারা শ্রেণীকে কমিউনিজম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ত্রুটির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। সেসবকে কাটিয়ে একটি নতুন ধরনের ঐক্যবদ্ধ ও একক মাওবাদী পার্টি গঠনই হলো আজকের জরুরি কর্তব্য। এই কর্তব্যের কিছু সুনির্দিষ্ট দিককে নিচে তুলে ধরা হলো।

১। সকল আন্তরিক মাওবাদীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক মাওবাদী পার্টি গঠন করা ঃ

পার্টিকে অবশ্যই প্রকৃত মাওবাদীদের একটি একক কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠার প্রয়াস রাখতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, সামগ্রিক লাইন বিনির্মাণে বিভিন্ন গুরুতর বিচ্যুতি, বিশেষত সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামে অস্পষ্টতা এবং টুএলএস পরিচালনায় সংকীর্ণতাবাদী একতরফাবাদী ও বিভেদাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সূচনাতেই মাওবাদী আন্দোলন বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই বিভক্তিকে কাটিয়ে তোলার জন্য ঘাসমূলে এবং উপর থেকে– উভয়বিধ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করতে হবে। অতীতের বিচ্যুতিকে কাটাবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা চালিয়েই শুধুমাত্র এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আন্তরিক মাওবাদীদের মধ্যে যেকোনো বৈরিতার সম্পর্কের অবিলম্বে অবসান করতে হবে। অতীতের বিচ্যুতিসমূহ কাটিয়ে তোলা ও মাওবাদীদের ঐক্যের জন্য যেকোন ধরনের নীতিহীন আপস ও নীতিহীন ঐক্যকে বিরোধিতা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু একইসাথে নমনীয়তা ও প্রয়োজনীয় আপসের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্য আত্মসমালোচনাকে প্রাধান্য দেয়া, অন্য মাওবাদী ধারাগুলোর ইতিবাচক দিকগুলোকে আন্তরিকভাবে তুলে ধরা ও তা থেকে বিনয়ের সাথে শেখা, পাশাপাশি সুস্থ লাইন-সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া– ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২। টুএলএস-এর মধ্য দিয়ে পার্টি গড়ে তোলা ঃ

পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত ত্রুটির বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পার্টির মধ্যকার মতপার্থক্য, বিভিন্ন বিচ্যুতিপূর্ণ ও সংশোধনবাদী উপাদান, এমনকি সংশোধনবাদী লাইন হলো বস্তুগত বাস্তবতা। ফলত পার্টিতে আন্তঃপার্টি সংগ্রামও একটি স্থায়ী বস্তুগত বাস্তবতা। একে যথার্থভাবে পরিচালনা করার উপর পার্টি-লাইনের বিকাশ ও পার্টি-ঐক্যের বিকাশ নির্ভর করে।

যান্ত্রিকভাবে ও পূর্বারোপিতভাবে একটি লাইন/অবস্থানকে চূড়ান্ত সঠিক ধরে ভিন্নমতটিকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে কার্যত মনোলিথিক পার্টি ধারার যে অনুশীলন মাওবাদী আন্দোলনে ঘটেছে তাকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে তুলতে হবে। অন্তঃশ্রেণি সংগ্রাম, তথা সর্বহারা শ্রেণির নিজেদের অভ্যন্তরীণ ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অবধারিতভাবে সর্বহারা বহির্ভূত সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আকারে চালানো, অসর্বহারা আংশিক সমস্যাকে সামগ্রিক অসর্বহারা লাইন হিসেবে চিহ্নিত করা, অসচেতন সংশোধনবাদী অবস্থানকে সচেতন অসংশোধনীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা হিসেবে দেখানো ও সংগ্রাম করার টুএলএস-নীতিকে কাটিয়ে তোলার উপর নতুন ধরনের পার্টি নির্মাণ ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

৩। গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতার নীতিকে কার্যকর করা ঃ

কিন্তু পার্টি সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির ভিত্তিতে, যা পার্টি-ঐক্যকে রক্ষা করে, উপদলবাদকে বিরোধিতা করে এবং পার্টির ইচ্ছা ও কর্মের ঐক্য বিধান করে। তাই এই সাংগঠনিক নীতিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং সকল ধরনের ক্ষুদে বুর্জোয়া-বুর্জোয়া উপদলবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে।

এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, মতপার্থক্যের লাইনগত মীমাংসা ব্যতীত নিছক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার শৃঙ্খলা দ্বারা প্রকৃত পার্টি-ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। তাই, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে মতপার্থক্যের দমন যেমন কাম্য নয়, তেমনি মতপার্থক্যের নামে উপদলবাদ ও বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা অনুমোদনযোগ্য নয়। উপদলবাদ সর্বদাই বুর্জোয়া ক্ষুদে বুর্জোয়া ধারা। সঠিক লাইন উপদলবাদী অনুশীলন করে না।

৪। যৌথ নেতৃত্ব ব্যবস্থা ঃ

যৌথ-নেতৃত্ব ব্যবস্থা ছাড়া গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রীকতার যথাযথ অনুশীলন সম্ভব নয়। আসলে যৌথ-নেতৃত্ব নিজেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার একটি অংশ। যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া টুএলএস-এর যথাযথ পরিচালনার মধ্য দিয়ে লাইন ও পার্টির বিকাশ সঠিকভাবে সম্ভব নয়। এটা ছাড়া নেতৃত্ব গঠনও সম্ভব নয়।

প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব হিসেবে কমিটি-ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে।

পার্টিতে ব্যক্তি-পরিচালনা ব্যবস্থা শত্রু-দমনে পার্টির কেন্দ্রীয়/শাখার প্রধান নেতৃত্বকে হত্যা/গ্রেফতারের মাধ্যমে পার্টিকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম করে তোলে, যার বিরাট নেতিবাচক অভিজ্ঞতা আমাদের পার্টিতে রয়েছে।

৫। পেশাদার বিপ্লবী ঃ

যত বেশি সম্ভব পেশাদার বিপ্লবী গড়ার উপর বিপ্লবী পার্টির অস্তিত্ব নির্ভর করে। এজন্য অবশ্যই তরুণদেরকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বয়স্ক কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী ও পেশার মানুষকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

পেশাদার বিপ্লবীদের পারিবারিক দায়দায়িত্ব এবং বিবাহ ও সন্তান প্রশ্নে শ্রেণিত্যাগ, নিঃস্বার্থ ভাবমানস ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেবার পাশাপাশি বাস্তবোচিত নীতি/পদ্ধতি ও সমাধান গড়ে তোলার উপরও জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা ও একতরফাবাদী প্রথা/পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৬। "কী করিতে হইবে" সচেতনতায় পার্টি গড়ে তোলা ঃ

সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হলে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন, তার বিরুদ্ধে নিরলস লাইন-সংগ্রাম পরিচালনায় যোগ্য এবং বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে নেতৃত্বদানে সক্ষম সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গঠন করতে হবে। সেজন্য লেনিনের "কী করিতে হইবে"-চেতনায় পার্টির সর্বস্তরকে সচেতন করার লাগাতার সংগ্রাম চালাতে হবে। নতুবা গণযুদ্ধের প্রস্তুতিকালেই হোক বা যুদ্ধ চালানো কালেই হোক, গণসংগ্রামকালে হোক বা সশস্ত্র সংগ্রাম কালে হোক, অর্থনীতিবাদ পার্টিকে গ্রাস করতে বাধ্য। কী করিতে হইবে-এর চেতনা ব্যতীত কোনো সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি গঠিত ও সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে না।

৭। গণযুদ্ধের জন্য ও গণযুদ্ধের সাথে সংযুক্তভাবে পার্টি-সংগঠনকে গড়ে তোলা ঃ

আমাদের মত দেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সবকিছু গড়ে ওঠে– রণনৈতিকভাবে এই নীতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এর অর্থ হলো পার্টিকেও গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

এটা সত্য যে, এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনে গুরুতর একতরফাবাদী বিচ্যুতি ঘটেছিল– যুদ্ধ/বাহিনী গঠন ও পার্টি-গঠনের কাজকে প্রায় সমার্থক করে ফেলা হয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিকে লাইনগতভাবে কার্যত বর্জন করা হয়েছিল। বাহিনী-বহির্ভূত অন্যান্য গণসংগঠনের কাজকেও কার্যত বর্জন করা হয়েছিল। সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সারসংকলনকে ভুলে যাওয়াটা মোটেই উচিত হবে না। কিন্তু গ্রামভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়েই পার্টি-গঠন– এটা আমাদের মত দেশে রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেভাবেই তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে– এ থেকেও বিচ্যুত হওয়া চলবে না।

যুদ্ধ বিহীনভাবে বিপ্লবী পার্টি গঠনের আশা এখানে মরিচিকার মত। সে ধরনে বিপ্লবী পার্টি বেশীদূর এগোতে পারবে না। বরং সেটা গণচরিত্র অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলে ও সীমিত পরিসরে আটকা পড়ে যাবে। অন্যদিকে তার বিপ্লবী চরিত্রও বেশিদিন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সেটা একটা সংস্কারবাদী অর্থনীতিবাদী পার্টিতে পরিণত হবে।

৮। গণযুদ্ধের লাইন ও রণনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্টি-কাঠামোকে দাঁড় করানো ঃ

সর্বদাই "যথাসম্ভব দ্রুত গণযুদ্ধ সূচনা করা" ও তাকে "ঘাঁটির লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়া"– এই মৌলিক লাইন এবং তার জন্য যে রণনৈতিক পরিকল্পনা– তাকে ভিত্তি করে পার্টি-কাঠামোকে গড়ে তুলতে হবে। নতুবা যখন যেখানে যেভাবে এগোয়– এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততাবাদী সাংগঠনিক নীতি প্রাধান্য বিস্তার করবে।

সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনে এ ত্রুটি ছিল। সুতরাং এ সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রয়োগে যত্নশীলতা প্রয়োজন।

৯। পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্টকে সমকেন্দ্রীকভাবে গড়ে তোলা ঃ

পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্ট গঠন– একটি অপরটির সাথে যুক্ত এবং একটি অপরটিকে এগিয়ে দেয় ও প্রভাবিত করে। এর একটি দুর্বল হওয়ার অর্থ হলো সবগুলোই দুর্বল হওয়া। সুতরাং প্রথম থেকেই এই রণনৈতিক দিশা দ্বারা এগোতে হবে এবং সমকেন্দ্রীকভাবে বিপ্লবের এই তিন হাতিয়ারের কাজকে বিকশিত করতে হবে।

অতীতে পার্টি গঠনের কাজকে বাহিনী/যুদ্ধ গঠনের সাথে সংযুক্ত করা হলেও যুক্তফ্রন্টের সাথে যুক্ত করা হয়নি। যা পার্টি-গঠনকে গুরুতরভাবে দুর্বল করে দেয় এবং পার্টি হয়ে ওঠে একচোখা। একে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাটিয়ে তুলতে হবে।

১০। এদেশীয় গণযুদ্ধ'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের লাইন অনুযায়ী পার্টি-কাঠামোকে সাজানো ঃ

এজন্য দেশব্যাপী পার্টিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে পার্টি যথাসম্ভব দ্রুত একটি জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন পার্টিতে পরিণত হতে পারে।

ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার জন্য রণনৈতিক অঞ্চল আঁকড়ে ধরা এবং গ্রামভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের লাইনকে ভিত্তি করে তার সাথে দেশব্যাপী ছড়ানো জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন পার্টি গঠনের কর্তব্যকে সমন্বিত করতে হবে।

১১। গোপন পার্টি ঃ

বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনাকারী একটি পার্টি হিসেবে, বিশেষত আশুভাবে গণযুদ্ধ সূচনা করবে অথবা তা পরিচালনাকারী একটি বিপ্লবী পার্টি হিসেবে পার্টিকে গড়ে তুলতে হবে গোপনভাবে। তার সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিকল্পনাদি অবশ্যই হবে গোপন, াতে শত্রুর দমনে সে নিজেকে রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু একইসাথে পার্টিকে প্রকাশ্য, আধা-প্রকাশ্য, এমনকি আইনি কাজের সকল সম্ভাব্য সুযোগকেও কাজে লাগাতে হবে। এটা পার্টি করবে বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন, মোর্চা, যৌথ কাজের আড়ালে। জাতীয় রাজনীতির হস্তক্ষেপে কখনো কখনো পার্টির মুখপাত্রকে প্রকাশ্য হতে হলেও সেটা পার্টিকে মূলত প্রকাশ করবে না, ব্যক্তিকে প্রকাশ করবে মাত্র। দেশব্যাপী সামগ্রিক ক্ষমতাদখলের পূর্ব পর্যন্ত পার্টিকে গোপন থাকতেই হবে।

১২। আন্তর্জাতিকতাবাদে সজ্জিত পার্টি গঠন ঃ

পার্টিকে শুরু থেকে একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী পার্টি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পার্টির সর্বস্তরকে অবিরাম আন্তর্জাতিকতাবাদে শিক্ষিত করতে হবে, পার্টির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি ও জনগণকে তাতে শিক্ষিত করতে হবে। এটা শুধু বিমূর্ত আদর্শবাদী প্রশ্ন নয়, বাস্তব সাংগঠনিক কাজেও পার্টিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় কাজ করতে হবে এবং তার দায়িত্ব নিতে হবে।

১৩। নারী প্রশ্ন ঃ

পার্টিকে অবশ্যই নারীপ্রশ্নকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং পার্টির সর্ব-স্তরকে, এবং জনগণকে এ প্রশ্নে অবিরাম শিক্ষিত করবার দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিতে হবে।

যখন কিনা বিপুল সংখ্যক এনজিও-রা, এবং বুর্জোয়া পার্টিগুলোও অনেকাংশে তাদের নিজ রাজনীতিতে নারীপ্রশ্নকে ব্যাপক গুরুত্ব দিচ্ছে, সেখানে নারী-প্রশ্নে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রচার শিক্ষিতকরণ ও সংগ্রামের গুরুত্ব বিশালভাবে বেড়ে গেছে।

নারী-প্রশ্নে দুই ধরনের বিচ্যুতিকে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এক– নারী-প্রশ্নকে বিপ্লবের অধীনে রাখবার নামে তার বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা, যা মাওবাদী ও প্রগতিশীল আন্দোলনে ঘটেছে। দুই– নারী-প্রশ্নকে বিপ্লবের সমস্যা হিসেবে না বোঝার বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি।

পুরুষতন্ত্র বিশেষভাবে দেখা যায় সম্পদের প্রশ্নে, শ্রমের মজুরি ক্ষেত্রে, এবং যৌন প্রশ্নে। এগুলোই বিপুল সাংস্কৃতিক সমস্যা আকারে সমাজে কাজ করে। এসব বিষয়ে পার্টিকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পেশ করতে হবে, অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে

হবে ও ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আন্দোলন, সংগঠন ও বাস্তবায়ন গড়ে তুলতে হবে।

নারী-প্রশ্নে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচিগুলোর পাশাপাশি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচিকে যদি সংগ্রাম না করা হয় তবে তা পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সেবা করবে ও শক্তিশালী করবে।

নারী-প্রশ্নে বিকশিত না হয়ে এবং নারী-কাজকে না এগিয়ে পার্টি-গঠনকে ভালভাবে আগানো যাবে না।

১৪। পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রসর অংশের উচ্চতম সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা ঃ

শ্রমিক শ্রেণি হলো আমাদের নিজ শ্রেণি। পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি। পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের কাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কীভাবে মাওবাদী আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার কাজকে অবহেলা করেছিল।

পার্টিকে অবশ্যই আধুনিক শিল্পীয় শ্রমিক শ্রেণিসহ শহরাঞ্চলের সর্বহারা, আধা-সর্বহারা শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের মাঝে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। শ্রেণির অগ্রসর অংশের প্রধান ভাগটিকে পার্টি গ্রামাঞ্চলে পাঠাবে বটে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এখানেও নিয়োজিত রাখতে হবে। যাতে ক্রমবর্ধিত শ্রমিক আন্দোলনেও পার্টি নেতৃত্বকারী ভূমিকায় থাকতে পারে এবং বুর্জোয়া, এনজিও, সংশোধনবাদী নেতৃত্ব থেকে নিজ শ্রেণিকে মুক্ত করতে পারে।

শ্রমিক শ্রেণি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নগরে-শহরে জমায়েত হন। ফলে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে কাজ দেশব্যাপী পার্টি-কাজ বিস্তৃত করার একটি উপায় হিসেবেও কাজ করবে, যাকিনা আমাদের রণনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১৫। আদিবাসী প্রশ্ন ঃ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ও একটি বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে, যাকে মাওবাদী আন্দোলন তেমন একটা গুরুত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিশেষ অঞ্চলটি বাদেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ২০/২৫ লক্ষ আদিবাসী জনগণ রয়েছেন, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তেমন একটি বড় সংখ্যার না হলেও তাদের মোট সংখ্যাটি উপেক্ষণীয় নয়। এই জনগোষ্ঠীগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বৃহৎ বাঙালি ধনীদের দ্বারা জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগতসহ বহুবিধ শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত। তাদের রয়েছে বহু অতীত থেকে সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য। তদুপরি সাঁওতাল,

ওরাও, গারো, মনিপুর, ত্রিপুরা– এসব জাতিসত্তার জনগণের রয়েছে ভারতের একই জাতিসত্তার বিপুল জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যাদের মাঝে মাওবাদী ও জাতিগত সশস্ত্র সংগ্রামের বিরাট প্রভাব রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণকে উচ্ছেদ ও নির্মূল করার এক সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় দমন ও চক্রান্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ক্রিয়াশীল, যার বিরুদ্ধে এই জনগণ ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন। সুতরাং, দেশব্যাপী আদিবাসী জনগণ সর্বহারা শ্রেণির পার্টি ও তার নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলবার এক গুরুত্বপূর্ণ মজুত শক্তি। পার্টির স্বতন্ত্র কাজ বিকাশের পাশাপাশি এই জাতি-গোষ্ঠীর জনগণের জাতিগত আন্দোলনের সাথে যুক্তফ্রন্ট-লাইনে মিত্রতা গড়ে তোলার এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। একে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে পরিচালনায় মনোযোগী হতে হবে।

১৬। বুদ্ধিজীবী কাজ ঃ

সারসংকলনের অধ্যায়ে শিল্প-সংস্কৃতিসহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে অতীতে পার্টি-কাজের সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

পার্টিকে গুরুত্ব দিয়ে এইসব অংশসহ সমগ্রভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার কাজকে গুরুত্ব দিতে হবে– যার মাঝে রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি ফ্রন্টের ব্যক্তিগণ ছাড়াও সাংবাদিক-মিডিয়া কর্মী, শিক্ষাবিদ, কৃষি-বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, পেশাজীবী– এইসব ফ্রন্টের লোকেরা। যাদের বিশাল প্রভাব রয়েছে সমগ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সমাজের মাঝে। যারা বুর্জোয়া রাজনীতি ও মূল্যবোধকে সমাজে প্রবাহিত করবার প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকেন। আবার এদেরই একটা বড় অংশকে বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে টেনে আনাও সম্ভব। এমনকি তাদের কিছু অংশকে বিপ্লবী রাজনীতি ও মতাদর্শে রূপান্তরিত করাও সম্ভব। পার্টি-গঠনে বুদ্ধিজীবী-মধ্যকার কাজের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। বাস্তবে সুদীর্ঘদিন এই অংশ থেকে আসা শ্রেণিচ্যুত বিপ্লবীরাই পার্টির প্রধান নেতৃত্ব কাঠামোর প্রধানাংশ গঠন করেন। তাই, একাজে যদি আমরা যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিতে পারি, তাহলে পার্টির নেতৃত্ব-গঠনের ক্ষেত্রেও আমরা হীনবল হয়ে থাকবো এবং শক্তিশালী একটি পার্টি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবো।

১৭। পার্টি-সদস্যপদ ঃ

পার্টি-সদস্যপদ প্রদান ছাড়া পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্টের একাকার হয়ে পড়ার সমস্যা আমরা কাটাতে পারবো না। পাঠচক্র/গেরিলা গ্রুপ/কর্মী-গ্রুপ হয়ে পার্টি-সদস্যপদ প্রদান এবং পার্টি-সেল গঠন ও পার্টি-শাখা, পার্টি-কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমস্ত স্তরে পার্টি-কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব সমস্যাকে সমাধান করা না হলে ব্যক্তি-পরিচালনা থেকে পার্টি বেরুতে পারবে না, এবং সত্যিকারভাবে পার্টি দাঁড় হবে না।

১৮। পত্রিকা ঃ

পার্টি-পত্রিকার নিয়মিতকরণ পার্টি-গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পার্টি-পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে– যা পার্টির বাস্তবতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। তবে পার্টি-নেতৃত্ব, কেডার, পার্টি-বহির্ভূত বামপন্থী ও সচেতন অংশের জন্য তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক পত্রিকা, আর জনগণের মাঝে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য দৈনন্দিন পত্রিকা– উভয়েরই প্রয়োজন। একটি দ্বারা আরেকটির প্রয়োজন মেটে না।

গণযুদ্ধ পরিচালনাকারী একটি পার্টির জন্য নগরকেন্দ্রীকভাবে বিপুল প্রকাশনা ও দেশব্যাপী তার বিপণন বিভিন্ন সময়ে, বা এক পর্যায়ে কঠিন হতে পারে। সেক্ষেত্রে গণযুদ্ধ নিজেই একটি প্রচার ব্যবস্থার মত কাজ করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে রণনৈতিক অঞ্চলগুলোকে নিজ নিজ পত্রিকা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হতে পারে। এছাড়া আজকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনাকে পত্রিকার কাজে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাও নেয়া যায়।

মিডিয়া জগতের বিপুল বিকাশের প্রেক্ষিতে পার্টি-প্রভাবিত, আদর্শগত ও বিপ্লবী রাজনীতিভিত্তিক নিয়মিত/অনিয়মিত ম্যাগাজিন, মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক, এমনকি দৈনিক পত্রিকার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, যেক্ষেত্রে পার্টি-প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী এবং স্বচ্ছল বা সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চালানো যায়।

পার্টির সরাসরি উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বী কেন্দ্রীয় সংস্থা রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা মাওবাদী আন্দোলনে কখনই হয়ে উঠেনি।

১৯। কেডার স্কুল ঃ

পার্টি-গঠনে রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক মানোন্নয়ন সহ সামরিক ও সাংগঠনিক নীতি-পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে পার্টি-কেডারদের উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এজন্য প্রার্থী সার্বক্ষণিকদের ও পেশাদার বিপ্লবীদের বিশেষ যত্ন নিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে মানোন্নয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রুপ-ভিত্তিক অভিযান আকারে মানোন্নয়ন কাজ পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত স্কুল চালু করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে 'স্কুল শিক্ষক' গড়ে তোলা উচিত যারা পাঠ্যসূচি ভিত্তিক মানোন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করবেন। মালেমা'র মৌলিক তত্ত্বাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও দেশীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, লাইনগত শিক্ষা, রণনৈতিক পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি, চলতি পার্টি-দলিলাদি– ইত্যাদিকে ভিত্তি করে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মানোন্নয়নের স্থায়ী ব্যবস্থা পার্টিতে না থাকলে পার্টি ধীরে ধীরে রাজনীতি-শূন্য চলতি কর্মকান্ডে ডুবে যেতে থাকবে, যা পার্টির অধ:গতি ডেকে আনবে।

২০। নেতৃত্ব গঠন ও রক্ষা ঃ

পার্টি-নেতৃত্ব গড়ে ওঠে দীর্ঘপ্রক্রিয়ায়। বিদ্যমান ব্যবস্থার মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না। বরং পার্টি নেতৃত্ব গড়ে ওঠে সুদীর্ঘ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়– যার প্রধানতম প্রতিকূলতা হলো শত্রু দ্বারা নেতৃত্বের হত্যা ও গ্রেফতার।

অথচ পার্টি ও বিপ্লবের জন্য একসারি প্রধান নেতৃত্ব ছাড়াও বিভিন্নস্তরে অসংখ্য যোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন।

তবে প্রধান নেতৃত্বসারিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকিনা সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল, যাকে হত্যা করে শত্রু দ্রুত ও নির্ধারক বিজয় লাভ করে, এবং স্বভাবতই যা বহু সংখ্যক নেই বা থাকে না।

প্রতিদিনই আমাদের নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না। সে কারণে যত্নের সাথে সর্বস্তরের গড়ে ওঠা ও বিকাশমান নেতৃত্বের সযত্ন রক্ষা বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটা পার্টি গঠনের এক অপরিহার্য কর্তব্য।

২১। বিপর্যস্ত অঞ্চলে পার্টি-গঠন ঃ

পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, দেশের বহু অঞ্চলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, যেখানে নিকট অতীতে সশস্ত্র সংগ্রামের জোয়ার ছিল। অথবা আমরা এমন অঞ্চলও পাবো যেখানে বিভিন্ন বিচ্যুতি ও দুর্বলতাসহ এখনো এক/একাধিক বিপ্লবী কেন্দ্রের সশস্ত্র তৎপরতা বিরাজমান। এ সমস্ত অঞ্চলে পুনরায়/নতুন করে উচ্চতর লাইনের ভিত্তিতে পার্টি-গঠন করার সমস্যাটি একটি বিশেষ সমস্যা আকারে আমাদের সামনে এখন উপস্থিত হয়েছে। যেখানে কখনো মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম হয়নি, অথবা যেসব অঞ্চলে দূর অতীতে সে সংগ্রাম হয়েছিল যার পর এক/দুই প্রজন্ম পার হবার পর বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় বিকশিত হয়ে গেছে, সে ধরনের জায়গার পার্টি-গঠনের সমস্যা থেকে এ সমস্ত জায়গায় পার্টি-গঠনকে অবশ্যই পৃথক বৈশিষ্ট্যে পরিচালনা করতে হবে।

এ সমস্ত অঞ্চলে সশস্ত্র প্রক্রিয়া ব্যতীত পার্টি গঠনের কাজটিকে এগিয়ে নেয়া কঠিন, বলা যায় প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তেমনভাবে এগুনোতে আমাদের আত্মগত সামর্থ্যের দুর্বলতা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে গোপন বিপ্লবী গণসংগঠন গড়া ও তার মাধ্যমে কর্মসূচি প্রচারের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্কোয়াড/মিলিশিয়া গঠনের একটি "প্রস্তুতি"- সময় আমাদের নিতে হতে পারে। এটা নিরস্ত্রভাবে নিরাপদ নয়, বরং সম্ভবমত অস্ত্র হাতে নিয়েই এই প্রক্রিয়া চালাতে হবে। এটা নিরস্ত্র প্রক্রিয়া ও প্রকাশ্য গণসংগঠনের মাধ্যমে পার্টি-গঠন ও প্রস্তুতির থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য।

বিপর্যস্ত বা অন্যান্য কেন্দ্রের প্রভাবিত মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রামী অঞ্চলকে প্রকাশ্য গণসংগঠনের মাধ্যমে উপরে উঠিয়ে আনাটা আমাদের জন্য লাইনগতভাবে

পশ্চাদমুখী কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। একইসাথে সেটা একদিকে শত্রুর দমন, অন্যদিকে বিচ্যুতিপূর্ণ লাইনধারী কেন্দ্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, সংকীর্ণতাবাদী, এমনকি বৈরী তৎপরতার মুখে ব্যর্থ হবার বৃহত্তর ঝুঁকিতে পড়বে।

২২। আর্থিক নীতি ঃ

পার্টি-গঠনের ক্ষেত্রে তার আর্থিক নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

একটি বিপ্লবী পার্টি পরিচালনা ও তার বহুবিধ সংগ্রাম ও কাজ পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রশ্নে পার্টির সুস্পষ্ট ও বিপ্লবী নীতি প্রয়োজন, যাতে শুধু পার্টির সর্বস্তরই নয়, জনগণকেও শিক্ষিত করা প্রয়োজন। সুস্পষ্ট ও ভাল কোনো আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মাওবাদী আন্দোলনে ব্যাপক দুর্বলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা ভুল আর্থিক নীতির সাথে মাওবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন স্তরে নৈতিক অধ:পতনের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যাবে না।

পার্টি তার সদস্য-চাঁদা ও সহানুভূতিশীলদের নিয়মিত সাহায্যের দ্বারা প্রাথমিকভাবে তার খরচ নির্বাহ করলেও গণযুদ্ধ পরিচালনাকারী পার্টি আর্থিক আরো বহুবিধ সূত্রকে ব্যবহার ও সৃষ্টি করতে বাধ্য। স্থানীয় শত্রুদের জরিমানা, শত্রুর সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ দখল, গণসাহায্য, ফসলের উপর লেভী আদায়, ট্যাক্স আদায়– ইত্যাদি সূত্রগুলোকে পার্টির অর্থ আয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসবকে গণযুদ্ধের বিকাশ ও গণভিত্তি-গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করা ও তার অধীনে স্থাপন করা প্রয়োজন, যা সঠিকভাবে বিভিন্ন সময়ে পরিচালনা করা হয়নি। এ ত্রুটিগুলোকে কাটিয়ে তুলতে হবে।

পার্টি-গঠনের সাথে পেশাদার বিপ্লবী ও অন্যান্যদের উৎসর্গিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার প্রয়োজন যাতে পার্টির স্থায়ী ফান্ড গড়ে তোলা যায়। শক্তিশালী একটি পার্টি-ফান্ড সৃষ্টির জন্য অন্যান্য নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপরও জোর দেয়া প্রয়োজন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

যুক্তফ্রন্ট-প্রশ্নে মাওবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা ও দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা সারসংকলনমূলক অধ্যায়ে করা হয়েছে তা থেকে আমাদের বর্তমান লাইন ও কর্তব্যগুলো উঠে আসে। এখানে সংক্ষেপে তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পুনরায় তুলে ধরা যেতে পারে– যা আমাদের বর্তমানের অনুশীলনকে গাইড করবে।

* যুক্ত ফ্রন্ট হলো অন্যান্য শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির মোর্চা– নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি বা কর্তব্যের ভিত্তিতে।

আমাদের দেশের প্রধানতম শ্রমজীবী ও শোষিত শ্রেণি হিসেবে কৃষক শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির মৈত্রী শুধু নয়াগণতান্ত্রিক স্তর নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তারপর কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলবার জন্যও মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন। যদিও কৃষক বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, এবং বিপ্লবের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কৃষকের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকা বিভিন্ন রকম হবে, কিন্তু কৃষকের মাঝে প্রধান ও সবচেয়ে শোষিত যে অংশটি, তারা বিপ্লবের পক্ষে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে কাজ করবে। ভূমিহীন-গরীব কৃষক হলো কৃষকের সংখ্যাগুরু অংশ, এবং তারা শ্রমিক শ্রেণির ঘনিষ্ঠ মিত্র, বিপ্লবের সমগ্র যুগ ধরে। তাই, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটা যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি সৃষ্টি করবে, যেক্ষেত্রে ভূমিহীন-গরীব কৃষক এর সবচাইতে বড় ও নির্ভরযোগ্য ঘনিষ্ঠ সারি গঠন করবে। মধ্য কৃষকের বিরাট সারিটিও তার ভাল মিত্র। কিন্তু ধনী কৃষকদের ক্ষুদ্র অংশটি বর্তমান স্তরে মিত্র হলেও তারা হলো খুবই দোদুল্যমান ও অনির্ভরযোগ্য– তারা কখনো শত্রুর পক্ষে থাকে, কখনো আমাদের পক্ষে আসে।

বিপ্লবের বর্তমান নয়াগণতান্ত্রিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে গ্রাম ও কৃষককে যখন প্রধান ভিত্তি হিসেবে আঁকড়ে ধরা হয়, তখন এই রাজনৈতিক লাইন কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্থাপিত হয়। আমাদের দেশে গ্রাম ও কৃষককে প্রধান ভিত্তি না করার অর্থ হলো এই মৈত্রীর মূলনীতি কার্যত বর্জন করা।

– শ্রমিক ও কৃষক বাদে জনগণের প্রধান অংশটি হলো বিভিন্ন ধরনের মধ্যবিত্ত।

এর মধ্যে রয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আর আধাশিক্ষিত/অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত। মধ্য কৃষকও এক অর্থে মধ্যবিত্তই, কিন্তু মধ্যবিত্ত বা ক্ষুদে বুর্জোয়া বলতে মধ্য কৃষকের বাইরের ব্যাপক মধ্যবিত্ত জনগণকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি স্তর– নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চ– যাদের বিপ্লবের প্রতি মনোভাব ও ভূমিকা বিভিন্ন রকম। তাসত্ত্বেও গড়পড়তা মধ্যবিত্ত হলো নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাল মিত্র। উচ্চমধ্যবিত্ত বাদে তাদের প্রধান অংশই প্রধানভাবে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিরাট সংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হচ্ছে, যা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে প্রকাশ করে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামকে বিকশিত করার ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্তদের সাথে সম্পর্কের সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এখন উপস্থিত হচ্ছে।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জোটটি বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের প্রধান দিক বা স্থায়ী শিবিরটিকে গঠন করে। জাতীয় বুর্জোয়ারা (যাতে ধনী কৃষকরাও পড়ে) এতে কখনো কখনো আসতে পারে– যখন বিপ্লবের জোয়ার থাকে; নতুবা তারা এতে নিস্পৃহ মনোভাব দেখায়, এমনকি বিপ্লবের বিরোধিতাও করে। তাই, শাসকশ্রেণির ক্ষমতার বিপরীতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ক্ষমতার স্লোগান আমাদেরকে তুলতে হবে, বিশেষত বিপ্লব গড়ে উঠবার প্রথমাবস্থায়, যদিও পরিষ্কার করতে হবে যে, জাতীয় বুর্জোয়াকে আমরা নীতিগতভাবে

যুক্তফ্রন্ট থেকে বাদ দিচ্ছি না। এবং তাদের সাথে আমাদের নীতি মিত্রতার, শত্রুতার নয়। কিন্তু একইসাথে আমাদেরকে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন ক্ষমতার স্থায়ী মৈত্রীটাকে এ দ্বারা বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে। বিশেষত যতদিন বিপ্লব শক্ত ভিত্তিতে না দাঁড়াচ্ছে, ততদিন এই শ্রেণিমৈত্রীর প্রধান দিকটাকে আমাদের জনপ্রিয় করতে হবে। এটা আরো স্পষ্ট করে যে, এটা বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবেরই অংশ, এটা পুরনো কোনো বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, যদিও বর্তমান স্তরে এর বুর্জোয়া বিষয়বস্তু রয়েছে।

– সুতরাং উপরোক্ত শ্রেণি/পেশা/সম্প্রদায়/জাতি-গোষ্ঠীর জনগণকে সরাসরি পার্টির নেতৃত্বাধীন বিবিধ ধরনের গণসংগঠনে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার কাজ যুক্তফ্রন্ট গঠনের কাজেরই অংশ। এটা খোদ পার্টি-গঠনেরও একটি অংশ– যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এটি সফল গণযুদ্ধ গড়ারও অংশ। তাই, পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন-গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কাজ পার্টি, বাহিনী ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের এক সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়া– যার একটি ছাড়া অন্যটি ভালভাবে এগোয় না, এবং একটি অন্যটিকে গড়ে তোলে ও প্রভাবিত করে।

* কিন্তু উক্ত শ্রেণিগুলোর ব্যাপক সংখ্যাগুরু অংশই এখন পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত নয়। হয় তারা নেতৃত্বশূন্য ভাবে অসংগঠিত অবস্থায় রয়েছেন, নতুবা অন্যবিধ গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলোতে সংগঠিত রয়েছেন বা তাদের রাজনীতি দ্বারাই প্রভাবিত। তাই, পার্টির নেতৃত্বে সরাসরি গণসংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি/জনগণকে বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পার্টি ও সংগঠনের সাথে বিভিন্ন ধরনের ঐক্য-সমঝোতার কাজটিও যুক্তফ্রন্ট-লাইনের কাজের মধ্যে পড়ে।

পার্টিগত/সংগঠনগত এই ঐক্য/যৌথ আন্দোলন/যুক্ত তৎপরতা/সমঝোতা প্রভৃতি পার্টি-স্তরে হতে পারে, পার্টি-নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনের স্তরেও হতে পারে। জাতীয়ভাবে হতে পারে, আঞ্চলিকভাবেও হতে পারে। উপর থেকে হতে পারে, নিচুতলায়ও হতে পারে। খুবই সাময়িকভাবে হতে পারে, বা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী ধরনেও হতে পারে। একটিমাত্র ইস্যুতে হতে পারে, বা বেশ কিছু কর্মসূচিকে ভিত্তি করেও হতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, নীতিগত ও দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিতে এ ঐক্যকে নির্দিষ্ট পার্টি/সংগঠনগুলোর নেতাদের সাথে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি করে সেইসব সংগঠনে যুক্ত/প্রভাবিত জনগণের সাথে ঐক্য হিসেবে প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও, বিশেষত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠনসমূহের উপরতলার নেতা-সংগঠকদের সাথে ঐক্য/সমঝোতার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

* পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গণযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে, এবং ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্থা হিসেবে– উভয়বিধভাবে আমাদের যুক্তফ্রন্টের কাজ গড়ে উঠবে। এটা হলো রণনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি।

কিন্তু একইসাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, উক্ত ধরনের কর্মসূচির ভিত্তিতে জাতীয়/প্রকাশ্য আন্দোলনেও বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব সংগঠন এবং যুক্ত তৎপরতা গড়ে তোলার উপর আমাদের প্রথম থেকেই মনোযোগ দিতে হবে।

অর্থাৎ, নিচ থেকে, এবং এলাকাগতভাবে ক্ষমতা দখলের সংস্থা হিসেবে বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ভিত্তি ছাড়াও উপর থেকেও, এবং জাতীয়ভাবেও তার সহায়ক হিসেবে যুক্তফ্রন্টের তৎপরতা পাশাপাশি চালাতে হবে। শহরাঞ্চলের কাজ, নগরকেন্দ্রীক কাজ, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন, বুদ্ধিজীবীগত কাজ, এবং জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের যে লাইনগত বিকাশের আলোচনা আগে করা হয়েছে, তার সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

* মাও বলেছিলেন, "যাকে সম্ভব তাকেই ঐক্যবদ্ধ কর"। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক সূত্র।

প্রশ্নটি হলো– ঐক্য, তা কার বিরুদ্ধে ও কীসের ভিত্তিতে?

বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে শত্রু শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে সংগঠিত। সেক্ষেত্রেও প্রধান শত্রুকে চিহ্নিত করা ও তার বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা– যাকিনা ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্টকে কার্যকর করে তোলে– এই কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুকে একটি একটি করে ধ্বংস করার মাওবাদী কৌশলের সঠিকতাকে বর্জন করে বিপুল শক্তিধারী শত্রুকে উচ্ছেদ করা যাবে না। মাও জাপ-বিরোধী যুদ্ধকালে রণকৌশলগত এই যুক্তফ্রন্টের লাইনকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

– আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত আন্দোলনের সাথে রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের বিরাট রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য রয়েছে। যদিও রণকৌশলগত যুক্তফ্রন্টের পাশাপাশি নিপীড়িত জাতিসত্তার মাঝে আমরা স্বতন্ত্র পার্টিকাজ– অর্থাৎ, পার্টি, বাহিনী ও বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের কাজও অবশ্যই করবো, এবং তাকে দুর্বল করা যাবে না। কিন্তু এ দুয়ের যৌথ উদ্যোগ আমাদের রাখতে হবে।

– শত্রুর মধ্যকার দ্বন্দ্বের ব্যবহারে আজকের পরিস্থিতিতে একটির বিরুদ্ধে অন্যটির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সুযোগ নেই, কারণ, শত্রুর সকল শ্রেণি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং বিপ্লব সেই পরিমাণে বিকশিত নয়, যাতে শত্রুর একাংশ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্ছেদে আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে গণ্য করতে পারে, এবং আমাদের শক্তিকেও সেজন্য কাজে লাগাতে চাইতে পারে। কিন্তু কৌশলগত এই নীতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকার গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি প্রচন্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এমনকি মাঝে মাঝেই তারা সশস্ত্র বৈরিতায় জড়িয়ে পড়ে। শাসকশ্রেণির কিছু অংশ প্রধান ক্ষমতাধারী না হওয়ায় এবং শাসকশ্রেণির সর্বনিচের অংশটি গ্রামাঞ্চলে/সন্নিহিত শহরে আমাদের বিপ্লবী তৎপরতার আওতায় থাকায় আংশিকভাবে, খণ্ডভাবে, সাময়িকভাবে– তথা বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিতে তাদের সাথে প্রধানশত্রুর বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমঝোতাকে বাতিল করা যাবে না। অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনাক্রমণ

এবং অবৈরিতা আমাদের শত্রু সাময়িকভাবে কমিয়ে আনতে পারে, এবং প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই-ক্ষমতাকে বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

এই কৌশলগত সমঝোতার প্রশ্নটির গুরুত্ব সঠিকভাবে না বোঝার কারণে অতীত আন্দোলনে ডান/বাম– উভয় ধরনের বিচ্যুতি আমাদের ঘটেছে। সমঝোতা থেকে ডান বিচ্যুতি, এমনকি নৈতিক অধঃপতনও আসে। কিন্তু আমরা যদি সচেতনভাবে সমঝোতা-কার্যক্রম না চালাই তাহলে আমরা পরিস্থিতির দাবিতে বাধ্য হয়ে বা অসচেতনভাবে তা চালাবো। যা ডানবিচ্যুতির সৃষ্টি করবে। এটা এ পর্যন্তকার আন্দোলনে ব্যাপকভাবেই ঘটেছে, এবং মাওবাদী আন্দোলনে নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে।

* যুক্তফ্রন্ট-লাইনের প্রয়োগের আরেকটি বড় ক্ষেত্র হলো প্রকাশ্য গণসংগ্রামের, তথা, আংশিক/সাময়িক/খণ্ড আন্দোলনের জায়গাগুলো। প্রকাশ্য ও জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণি ও জনগণের বিবিধ অংশের অসংখ্য আন্দোলন প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে ও গড়ে উঠতেই থাকবে। চরম শোষণ-নিপীড়ন এবং বিশ্ব ও দেশীয় ব্যবস্থার উপর্যুপরি নতুন নতুন সংকট থেকে এটা হতে ও বিকশিত হতে বাধ্য।

সুতরাং বিপ্লবী পার্টিকে অতি-অবশ্যই এসব আন্দোলন ও পরিস্থিতিকে শুধু বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ার জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে দেখলেই চলবে না, এমনকি তাতে শুধু ভূমিকা রাখলেই চলবে না, বরং নিজ উদ্যোগে যেখানেই সম্ভব সেখানেই এ ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এ ধরনের আন্দোলন প্রায়শই অতিদ্রুত সর্বস্তরের জনগণকে, এলাকাগতভাবে বা সম্প্রদায়গত/কর্মক্ষেত্রগতভাবে জাগরিত করে তোলে। এমনকি মাঝে মাঝে তা জাতীয় ভিত্তিক আন্দোলন পর্যন্ত গড়ে তোলে, অথবা তা বিপুল জাতীয় প্রভাব সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালের এ জাতীয় প্রধান কিছু ঘটনার মাঝে রয়েছে কানসাট, ফুলবাড়ী, সেনা-ছাত্র সংঘর্ষ *(আড়িয়ল বিল)* প্রভৃতি। এ জাতীয় সকল ক্ষেত্রে আন্দোলন জাগরিত হলে, অথবা তা জাগরিত করার জন্য, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির সাথে বিভিন্ন ধরনের সমঝোতা/যৌথ তৎপরতা/বা যুগপৎ আন্দোলন– এমনকি কিছু কিছু সাময়িক বা কিছুটা স্থায়ী সাংগঠনিক রূপের প্রয়োজন হয়। এগুলোকে ইস্যুভিত্তিক ঐক্য বলে আমরা চিহ্নিত করে থাকি। এসবও যুক্তফ্রন্ট-লাইনেরই বিভিন্ন প্রয়োগ মাত্র।

এ সমস্ত কৌশলগত কাজের ঐক্য প্রশ্নে যেমন ডান ও বাম বিচ্যুতি থাকে, তেমনি ঐক্য ও সংগ্রামের প্রক্রিয়াতে সেগুলো বিকশিত হয়। চলতি সংগ্রামের জোয়ারে বিপ্লবী রাজনীতিকে বিস্মৃত হওয়া, এবং ক্রমান্বয়ে নয়া গণতান্ত্রিক কর্মসূচি ও গণযুদ্ধের রাজনীতি থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে অভ্যুত্থানের রণনীতির নাম করে কৃষি-বিপ্লব বর্জন ও দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ বর্জন, অথবা এমনকি সংসদীয় পথ গ্রহণ বা প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির সাথে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলা– এসবই ডান বিচ্যুতির প্রধান সমস্যার বিভিন্ন প্রকাশ ও বিকাশ।

আমাদের দেশের মাওবাদী আন্দোলনে সংকীর্ণতাবাদী বামবিচ্যুতির মাধ্যমে এই ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে সঠিক কৌশলকে গ্রহণ না করা ও তাকে বিরোধিতা করার সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী খারাপ ঐতিহ্য রয়েছে। একদিকে গণসংগ্রাম-গণসংগঠন বর্জন, আংশিক সংগ্রাম বর্জন, প্রকাশ্য কাজ বর্জন; অন্যদিকে চলমান জাতীয় রাজনীতির সাথে সংশ্রবহীনভাবে ক্ষুদে এলাকাবাদীভাবে সংস্কারবাদী ধরনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার সুদীর্ঘ কু-ঐতিহ্য– ইত্যাদির কারণে মাওবাদী আন্দোলন এক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট-লাইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বুঝবার জায়গাতেই যেতে পারেনি। এছাড়াও শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জেদ ধরবার নামে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের বদলে সাংগঠনিক নেতৃত্ব কব্জা করা প্রতিযোগিতার সংকীর্ণতাবাদও এখানে কার্যকর– যদিও এক্ষেত্রে মাওবাদী বহির্ভূত বাম-দের সমস্যাবলি আরো অনেক খারাপ, যা চক্রান্তমূলক গ্রুপিং-লবিং-এ পর্যন্ত গড়ায়। এটাও বাম সংকীর্ণতার একটি প্রকাশ– যাকে নমনীয়তার সাথে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে, এবং মাওবাদী আন্দোলনকেও শিক্ষিত করতে হবে।

* যুক্তফ্রন্ট-লাইনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা ও প্রয়োগ করতে পারার উপর বিপ্লবের অগ্রগতি ও সাফল্য ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। সুতরাং একেবারে শুরু থেকে এ প্রশ্নে উপলব্ধি ও প্রয়োগের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। মাওবাদী আন্দোলনকে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বর্তমান বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়

কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা বিপ্লবী আন্দোলন এই বস্তুগত পরিস্থিতির অংশও বটে, যদিও অন্যদিকে তা আমাদের আত্মগত পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে।

তাই, এই সমগ্রটা মিলিয়েই বিশ্ব ও দেশীয় বস্তুগত পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করতে হবে।

এদেশে বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলনের বিগত চার দশকে বিশ্ব পরিস্থিতি, সেই সাথে দেশীয় পরিস্থিতির বিশাল ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। অতিসংক্ষেপে হলেও পরিস্থিতির এই বিকাশ ও পরিবর্তনের উপর এক নজরে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

* বিগত শতকে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির প্রতীকরূপে যে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব ঘটেছিল, ৫০-দশকের মাঝামাঝিতে মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের উদ্ভবের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুঁজিবাদে অধঃপতনের ফলশ্রুতিতে তা ভেঙে পড়ে। তৎ-পরবর্তীকালে মাও-নেতৃত্বাধীন চীনসহ কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব ছিল। সোভিয়েতের পতন এবং চীনে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতার সারসংকলনের ভিত্তিতে মাও চীনে জিপিসিআর পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক উচ্চতর ও নয়া উত্থানে নেতৃত্ব দেন, যা ৬০/৭০-দশকে বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত জনগণের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক বিপ্লবী উত্থানের একটি বড় কারণ ও তার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। কিন্তু এই উত্থান অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত ১৯৭৬-সালে বিশ্ববিপ্লবের প্রধান ঘাঁটি চীনের প্রধান নেতা মাওসেতুঙের মৃত্যু হয়, এবং তার অব্যবহিত পরে পুঁজিবাদের পথগামীরা তেং-হুয়ার নেতৃত্বে এক ক্যুদেতা ঘটিয়ে প্রকৃত মাওবাদীদের উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদে অধঃপতিত করে। এভাবে ৬০/৭০-দশকের বিশ্বজোড়া বিপ্লবী উত্থান স্তিমিত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে এক নতুন পরাশক্তি হিসেবে বিশ্ব রণভূমে আবির্ভূত হয়েছে। এবং মার্কিনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের মুখোমুখি এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থানের পরাজয়, এবং বিশেষত মহান সমাজতান্ত্রিক চীনে পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের পর দুই পরাশক্তি মার্কিন ও সোভিয়েতের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ব্লক দুটো সমগ্র বিশ্বকে এক সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ৭০-দশকের শুরু থেকে ৮০-দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত বিশ্ব এই স্নায়ুযুদ্ধের কবলে পড়ে।

কিন্তু আফগান যুদ্ধে সোভিয়েতকে আটকে ফেলায় মার্কিনের সফলতা, সেই যুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয়ী হতে ব্যর্থতা এবং পাশাপাশি সোভিয়েত অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সনাতন পুঁজিবাদী রূপে পুনর্গঠনের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির পতন ঘটে। অনেকগুলো পুঁজিবাদী দেশে সে বিভক্ত হয়ে গুরুতর দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও সোভিয়েতের নেতৃত্বকারী শক্তি রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে টিকে থাকে, কিন্তু পরাশক্তি হিসেবে তার স্তরের/স্ট্যাটাসের অবনতি ঘটে। এবং একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিনের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে একটি সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধকে এড়াতে সক্ষম হয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব, যা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় একটি নতুন অভিজ্ঞতা, যা মনোযোগের দাবি রাখে। এবং ৯০-দশকের শুরু থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে এক-মেরু বিশ্বের সূচনা ঘটে।

সোভিয়েতের পতনকে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্ব "সমাজতন্ত্রের পতন" বলে বিশ্বজুড়ে কমিউনিজমের আদর্শ ও নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক মতাদর্শগত আক্রমণাভিযান পরিচালনা শুরু করে। যদিও সোভিয়েত মধ্য-পঞ্চাশ দশকের পর থেকে আর সমাজতান্ত্রিক ছিল না, কিন্তু সোভিয়েত সংশোধনবাদের প্রভাবে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণায় বিশ্বব্যাপী প্রকৃত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে এটি একটি মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তবে ইতিমধ্যেই মাও-পরবর্তীকালে ১৯৮৪-সালে বিশ্ব মাওবাদীদের ঐক্যকেন্দ্র 'রিম' গঠন, ৬০/৭০-দশকের মাওবাদী আন্দোলনের এক পর্যায়ের সারসংকলন, '৮০-সালে পেরুর গণযুদ্ধ সূচনা, এবং ভারত, ফিলিপিন, তুরস্ক, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পুনঃবিকাশ বিশ্বপরিসরে মার্কিনের এই কমিউনিজম-বিরোধী মতাদর্শগত আক্রমণাভিযানের জবাব দিতে শুরু করেছে। যা বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিকূলতাকে জনগণের জন্য অনুকূলতার দিকে বিকশিত করতে থাকে।

অন্যদিকে ৯০-দশকের শুরু থেকে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি মার্কিনের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশকে গভীরতর করার প্রয়াসে নয়া পলিসি হিসেবে 'বিশ্বায়ন' কর্মসূচির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে অচিরেই বড় বড় বিক্ষোভ, আন্দোলন, রাস্তার-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্বায়ন' পলিসির বিরুদ্ধে বিশ্বজনগণের আন্দোলনের এক নব পর্যায়ের শুরু হয়।

পাশাপাশি একক পরাশক্তি মার্কিনের নেতৃত্বে এক-মেরু বিশ্বের উদ্ভব ঘটলেও এরই অভ্যন্তরে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলো বিকশিত হতে থাকে– বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া, জার্মান, ফ্রান্সের সাথে। চীন নব্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পরাশক্তি

হিসেবে মঞ্চে আবির্ভাবের মাধ্যমে মার্কিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবার আলামত দেখাতে শুরু করে। সুতরাং, একদিকে পুনরায় জাগরিত বিশ্বজনগণের বিপ্লবী ও অন্যান্য সংগ্রামকে দমন করা, অন্যদিকে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-সামরিক কর্তৃত্বকে নিরংকুশ রাখার অভিপ্রায়ে তাদেরকে আগাম চোখ রাঙানোর জন্য মার্কিনের প্রয়োজন ছিল বিশ্বজুড়ে একটি নতুন পর্যায়ের সন্ত্রাসী যুদ্ধাভিযান শুরু করা। এই অভিপ্রায়ে ঘৃতাহুতি দেয় শতাব্দীর শুরুতে 'টুইন টাওয়ার' ঘটনা।

'টুইন টাওয়ার' ঘটনা বাহ্যত ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণ বলে ধারণা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজেরও কোনো অংশের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা তাতে সন্দেহমুক্ত হওয়া কঠিন। কারণ, তথাকথিত "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ" নামে বিশ্বজনগণের বিরুদ্ধে নতুন একটি সামরিক অভিযান শুরু করবার জন্য তার এমন একটি অজুহাতের প্রয়োজন ছিল। হতে পারে যে, নিজ ভূমিতে এত বড় একটি ধ্বংসাত্মক অভিযানের সফলতা সে না চাইতে পারে। যেভাবেই ঘটুক-না কেন, এটাই মার্কিনের 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' সূচনার আসল কারণ নয়। এই ঘটনা বিশ্ব পরিস্থিতির বিকাশে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। বিশ্ব ইতিহাস চালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরস্থ মৌলিক দ্বন্দ্ব দ্বারা, যা থেকে নতুন শতাব্দীর শুরুতে মার্কিনী সামরিক 'বিশ্বায়ন'-এর নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে বললে ভুল হবে না।

এ শতাব্দী শুরু হয়েছে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নামের মার্কিন নেতৃত্বাধীনে বিশ্ব জনগণবিরোধী এক নতুন যুদ্ধাভিযান দ্বারা। তারা প্রথমে আফগানিস্তানে, পরে ইরাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুনের গণহত্যাভিযান চালায়। কিন্তু এই আক্রমণ তার সংকট কাটিয়ে তোলার পরিবর্তে তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। বিশ্বজুড়ে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমনকি নিজের মিত্রদের থেকেও। রাজনৈতিকভাবে-তো বটেই, সামরিকভাবেও সে বিজয়ী হতে ব্যর্থ হয়– যা যুদ্ধক্ষেত্রে তার পরাজয়েরই সামিল। কিছু পরে যা এক সুগভীর অর্থনৈতিক মন্দা গড়ে তোলার ভিত্তি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

– ইতিমধ্যে, যদিও পেরুর গণযুদ্ধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু ৯০-দশকের শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী গণযুদ্ধের নতুন ঢেউ হিসেবে নেপালের গণযুদ্ধ শুরু হয় ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। কিছু কিছু দেশে মাওবাদী গণযুদ্ধ সংকটের মধ্য দিয়ে চললেও ভারত ও ফিলিপিন্সে তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। বিশ্বব্যাপী 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নামের জনগণবিরোধী আক্রমণাভিযানের বিরুদ্ধে বিরাট গণআন্দোলন ও জনমত গড়ে ওঠে। যা সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলোতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ সমস্ত পরিস্থিতির মুখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মুরুব্বীয়ানা রক্ষার প্রয়াসে নিজ পলিসির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করে। তারা একজন অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। এবং সার্বিক সামরিক আগ্রাসন থেকে কিছুটা পশ্চাদপসরণ করে মার্কিন জনগণের ধুমায়িত ক্ষোভ ও বিশ্ব জনগণের প্রতিরোধ

থেকে নিজেকে রক্ষার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং মূলত অপচেষ্টা চালাচ্ছে কিছুটা সীমিত যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী হতে।

কিন্তু মার্কিনের পক্ষে যুদ্ধ থেকে তার পা উঠিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ, এটাই সাম্রাজ্যবাদের নিয়ম, যা কিনা বহু আগে মহান লেনিন উল্লেখ করে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক যে মন্দা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা থেকে রক্ষার জন্য তারা আরো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এটা যেমন হতে পারে বিশ্ব জনগণের বিরুদ্ধে, আরো আরো দেশের বিরুদ্ধে, তেমনি হতে পারে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের অভ্যন্তরেও। বিগত শতকের ৭০/৮০-দশকে যে সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদ এড়াতে পেরেছিল, সেটা বারবারই ঘটবে তা ভাবাটা সঠিক হবে না, কারণ, সাম্রাজ্যবাদের মূল নিয়মগুলো তাকে সেদিকে পরিচালিত করতে পারে। যদিও আগের অভিজ্ঞতাটি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা তারা এবারের সংকট মোকাবেলাতেও ব্যবহার করতে চাইবে। বাস্তবে ৭০/৮০-দশকের সংকটও তারা যুদ্ধবিহীনভাবে মীমাংসা করতে পারেনি। অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সুদীর্ঘ নৃশংস যুদ্ধ চালানোর একটা বর্বর প্রক্রিয়া এবং পরাজিত পরাশক্তিটির পতনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-ভারসাম্যের একটা পুনর্গঠন ছাড়া সেটা হয়নি। সেক্ষেত্রে আজকের যুদ্ধটা কোথায় কীরূপে একটা মীমাংসায় পৌঁছবে, এবং তাদের ব্যবস্থার পুনর্গঠনটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা আগাম বলা যায়না। কিন্তু বিশ্ব-যে নির্মম সব যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এগুবে, এবং মার্কিনের নেতৃত্বে বর্তমান একমেরু বিশ্বের একটা বড় পুনর্গঠন-যে ঘটবে তার আলামত দেখা যাচ্ছে বলেই মনে হয়। সুতরাং এইসব বিকাশ থেকে জনগণের মুক্তির একটা নতুন দিগন্ত ভেসে উঠার এক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

– কিন্তু সেটা আপনা আপনি ঘটে যাবে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের অবসান একা একা ঘটতে পারে না। জনগণের অসংখ্য আন্দোলন, এবং সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা চালিত যুদ্ধ তাকে দুর্বল করে, কিন্তু ব্যবস্থার ধ্বংস আনে না। পুরনোর ধ্বংস দাবি করে শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্য নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থার। সেটা বিগত শতকে শুধুমাত্র কমিউনিজমের আদর্শই বিশ্বকে উপহার দিতে পেরেছিল। এবং এই ২১-শতকেও উচ্চতর স্তরে বিকশিত সেই আদর্শই সেটা পারবে। ঘটনাচক্রে, বর্তমান আমূল পরিবর্তনকামী এক বস্তুগত পরিস্থিতিতে সেই ইতিবাচক আন্দোলনকে দুর্বল দেখা যাচ্ছে। মাও-মৃত্যু পরবর্তীকালে যে কয়েকটি বিপ্লবী ঢেউ সেই ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এসেছিল তা আপাতত স্তিমিত হয়ে গেছে। পেরুর বিপ্লব বিপর্যস্ত ও ভুল খাতে গড়িয়ে পড়েছে। নেপালের বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়েছে। এবং পেরু-নেপাল থেকে উদ্ভূত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে মাওবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র 'রিম'-এর মধ্যে সংহতি ও শক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। এইসব প্রতিকূলতা কাটাতে বেশ কিছুটা সময় লাগবেই। রিম-ভুক্ত ও বহির্ভূত মাওবাদী শক্তিগুলো এখন সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

এই দুঃখজনক অবস্থা বস্তুগত পরিস্থিতিতে যে নতুন নেতিবাচক উপাদানকে নিয়ে এসেছে তাহলো জঙ্গি ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলন। চলমান এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই। আফগানিস্তানে সোভিয়েতকে কাবু করবার জন্য। তাদেরকে দিয়েই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালিয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন তার নিজস্ব বিশিষ্টতার কারণে বহু বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বহু বিভিন্ন মাত্রায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র প্রতিরোধে আজ নিয়োজিত হয়েছে। এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন– সন্দেহ নেই, যাকিনা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির দুর্বলতার পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য চেতনাকে পথভ্রষ্ট করতে অনেকটা সক্ষম হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে এই প্রতিরোধ আজ দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে সবচাইতে শক্তিশালীরূপে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই যার মধ্যে অবস্থান করছে।

আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ এশিয়াকে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এই মৌলবাদী আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করছে ও করবে। যেখানে বাংলাদেশে তার স্বার্থ বিপুল গুরুত্ব ধরে। নতুন মার্কিন প্রশাসন ইরাক থেকে সরে এসে তার শক্তি কেন্দ্রীভূত করার ঘোষণা দিয়েছে আফগানিস্তানে। তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তাদের একই পলিসি কাজ করবে। স্বভাবতই আফগানিস্তানের যুদ্ধ পাকিস্তানে প্রসারিত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশ মৌলবাদীদের এ্যাকশন এলাকা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় তার 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'-কে বিস্তৃত করবার এক বড় মওকা পেয়েছে, এবং তাতে সে বাধ্যও বটে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ মার্কিনের এ গণবিরোধী 'পবিত্র ধর্মযুদ্ধে' তার প্রধান মিত্র ও খুঁটি হিসেবে সানন্দে কাজ করছে। কারণ, নিজ স্বীকৃতি অনুসারেই ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রধানতম বিপদ হিসেবে মাওবাদী আন্দোলন তার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, রয়েছে বহুবিধ জাতীয়তাবাদী ও জাত-পাত সংক্রান্ত আন্দোলন। এবং অসংখ্য শ্রেণি আন্দোলন। সেসব কিছুকে সন্ত্রাসী-ভুক্ত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে মার্কিন তার প্রধানতম মুরুব্বিই বটে। তবে এখানে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' চালানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নিজস্ব আঞ্চলিক এজেন্ডাও রয়েছে, যা শক্তিশালীরূপেই ক্রিয়াশীল।

দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন ও ভারতের এই প্রতিক্রিয়াশীল ঘোঁট ও যুদ্ধ তাই নিছক মৌলবাদী প্রতিরোধের কোনো মিশন নয়। ভারতীয় শাসকরা গত কয়েক বছর ধরে সুস্পষ্টভাবে বলে ফেলছে যে, মাওবাদী আন্দোলনই হলো তাদের প্রধানতম অভ্যন্তরীণ হুমকি। পার্শ্ববর্তী নেপালের বিপ্লব পথভ্রষ্ট হলেও তার অগ্রগতি এই প্রতিক্রিয়াশীলদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল– যা সাময়িক স্বস্থির মধ্যে থাকলেও নেপাল বিপ্লবের পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণকে কেউই হিসেবের বাইরে রাখতে পারবে না। এসব

কারণেই বাংলাদেশে বিগত ৫ বছর ধরে 'ক্রসফায়ার' নামে মাওবাদী বিপ্লবী হত্যার যে বর্বর অভিযান চালু রয়েছে তাকে মার্কিন ও ভারতের দক্ষিণ এশীয় সামরিক পরিকল্পনার বাইরে রাখা যাবে না। সম্প্রতি ক্রসফায়ারে হত্যার সাথে তারা তথাকথিত "গণপিটুনিতে নিহত" করা, গুম খুন ও "নিখোঁজ" করার নতুন পদ্ধতি চালু করেছে। এগুলো স্পষ্টতই তাদের দ্বারা প্রণীত এবং তাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্থ ও সবচেয়ে ফ্যাসিস্ট সংগঠন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ('র‍্যাব' যার একটি শাখা মাত্র) চালিত হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদী বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়াও বহুসংখ্যক শক্তিশালী সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জাতিগত আন্দোলন, অসংখ্য শ্রেণি-পেশা-সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, যা অবিরাম চলমান, এবং বিশ্ব মন্দার প্রভাবে জনআন্দোলনের সম্ভাব্য বিস্ফোরণ ও শাসক শ্রেণির অন্তর্কলহের বৃদ্ধি– এসবই দক্ষিণ এশিয়াকে বিশ্ব বিপ্লবের এক শক্তিশালী রণনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করেছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই, তারা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর অব্যাহত ফ্যাসিকরণকে বাড়িয়ে তুলতে। এজন্য মৌলবাদের জুজু তোলা, বা বাস্তব মৌলবাদী শক্তির বিকাশ সাধনে হিসেবী মদদ ও প্রশ্রয় একটি মোক্ষম কৌশলই বটে। এক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোও বিরাট ভূমিকা রাখছে। এজন্য বাস্তব মৌলবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রিত বিকাশও প্রয়োজনীয় বৈকী, যখন তারা জানে যে, এই সশস্ত্র মৌলবাদ সাধারণভাবে তাদের ব্যবস্থার জন্য কোনো পাল্টা হুমকি নয়, বরং এই শক্তি জনগণের চলমান প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও জাতিগত আন্দোলন এবং বিশেষত সত্যিকার বিপ্লবী সংগ্রামের এক ফ্যাসিস্ট প্রতিপক্ষ। উপরন্তু, এটা দ্বারা শাসকগোষ্ঠীর এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ঘায়েল করতেও চেষ্টা চালায়। সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশ, শোষণ ও নিপীড়ন, অবিচার ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনগণের প্রগতিশীল প্রতিরোধের বদলে মৌলবাদী উত্থান বরং তাদের জন্য স্বস্তিকর, যদিও সেটা কখনো কখনো সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করছে, যা তাদের জন্য বিব্রতকর, এমনকি নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও হুমকি-সৃষ্টিকারী ও সংকট-বৃদ্ধিকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

তাসত্ত্বেও তারা চাইবে যে, একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া গণতন্ত্র, অন্যদিকে মৌলবাদ– এই বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়েই যেন পরিস্থিতি এগিয়ে যায় এবং জনগণ এর মধ্যেই যেন ঘুরপাক খেতে থাকেন। তাদের এই সুচিন্তিত পলিসির থেকে মৌলবাদী শক্তিগুলোর শক্তিমান হয়ে চলাটিকে পৃথক করা যাবে না।

কিন্তু এই সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও পদক্ষেপসমূহ, এবং পূর্বোল্লিখিত বিপ্লবী ও জাতিগত আন্দোলনগুলো গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে

নিক্ষেপ করেছে। যা মোটেই কোনো সহজ মীমাংসার দিকে যাবে না। আফগানিস্তানের পর পাকিস্তান যে ভয়াবহ ও ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়েছে তার মধ্যে কম/বেশি করে এ অঞ্চলের প্রধান দেশগুলোকে যেতে হবে, বাংলাদেশকেও– যদিনা বিপ্লবী রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল আন্দোলন এখানে শক্তিশালী করা যায়।

কিন্তু বিপ্লবী রাজনীতিও এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গণযুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমেই শুধু বিকশিত হতে পারে। নতুবা তা ক্ষুদে বুদ্ধিজীবী চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং জাতীয়ভাবে ও ব্যাপক জনগণের মাঝে কোনো প্রভাব গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে।

অন্য কথায় বলা যায় যে, যুদ্ধ/সশস্ত্রতা ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক শক্তিই আর দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহৎ প্রভাব সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না– তা সে বিপ্লবী যুদ্ধই হোক, বা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধই হোক। যুদ্ধ সর্বদাই প্রাণঘাতি ও নির্মম। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসী যুদ্ধ বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ও শাসকশ্রেণির ফ্যাসিবাদ, এবং তার বিপরীতে মৌলবাদী সশস্ত্র তৎপরতা– জনজীবনে অপরিসীম দুর্ভোগ টেনে আনে, বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তির হত্যা, বিলোপ ও অধঃপতন নিয়ে আসে– আফগানিস্তান যার উদাহরণ, পাকিস্তানও সেদিকেই চলেছে। শুধুমাত্র বিপ্লবী রাজনৈতিক যুদ্ধ, তথা গণযুদ্ধই জনগণকে একটা মুক্তির ভবিষ্যতে পরিচালনা করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, গণযুদ্ধের চলমান সময়েও জনগণ সবচেয়ে নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারবেন। যে ভয়াবহ মন্দা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার হেডকোয়ার্টার গুলোতে হানা দিয়েছে, যার সম্ভাব্য প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশেও বড় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের আশংকা করা হচ্ছে, তার পটভূমিতে এই ধরনের এক গণযুদ্ধের পথ পরিক্রমা ব্যতীত শুভ কোনো ভবিষ্যত আশা করা ভুল হবে।

* দেশীয় পরিস্থিতি এই সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি ও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক পরিস্থিতির দ্বারাই নির্ধারিত, প্রভাবিত ও বিকাশমান– যদিও এখানকার কিছু বিশেষ পরিস্থিতিও নিশ্চয়ই এখানে ক্রিয়াশীল।

বিগত চার দশকে দেশের আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি বিপুলভাবে বিকশিত হয়েছে। নিজ বিকাশের প্রয়োজনে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে এই শ্রেণিটির পূর্বসূরীরা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। একটা পর্যায় পর্যন্ত তারা পাকিস্তানের সেবা করে, এবং তার মাধ্যমে বিকশিত হয়। বিকাশের এক পর্যায়ে তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আরো ক্ষমতার দাবি করে এবং জনগণকে প্রতারণা করার জন্য পূর্ববাংলার বাঙালি জাতির জাতীয় সমস্যাকে তুলে ধরে। এটা তারা করেছিল তাদের নিজ শ্রেণি স্বার্থ, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের দালালী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে জনগণের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিকে বিরোধিতার অবস্থান থেকে। '৭১-এর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই গণবিরোধী ও জাতীয় বেইমান শ্রেণিটি বৈদেশিক প্রভুদের

সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন হয়। প্রথমদিকে চরম লুটপাটের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের স্ফীত করে। মাওবাদী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করে। বিশ্ব পরিসরে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে তারা ভারতের মাধ্যমে সোভিয়েত পরাশক্তির ব্লকেও কিছুদিন অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজ প্রভাব বলয়কে নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনী ও অন্যত্র নিজ দালালদের দ্বারা ক্যুদেতা ঘটায়। এবং এদেশে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হয়। একইসাথে লুটপাট থেকে অর্জিত বিপুল 'অবৈধ' সম্পদের একটা অর্থনৈতিক বিহিত ব্যবস্থার দিকে তারা অগ্রসর হয়। যা মার্কিনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে বিকাশের ব্যাপক সুযোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি লুটপাট, দুর্নীতি ইত্যাদিও তাদের বিকাশের অন্যতম পথ হিসেবে তারা বজায় রাখে। মার্কিন ও সোভিয়েত ব্লকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এই শাসক শ্রেণি প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক পলিসিতে বিভক্ত থাকলেও সোভিয়েতের পতনের পর এদের সে পার্থক্য মূলত ঘুঁচে যায়। কিন্তু শাসকশ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে গ্রুপিং ভিন্ন রূপ নেয়। সামরিক আমলাতন্ত্র বনাম রাজনৈতিক দলীয় শাসন, এবং ভারতের মাধ্যমে বনাম ভারতের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকা– এগুলোই এদেশের শাসকশ্রেণির মাঝে মৌলিক অন্তঃর্দ্বন্দ্ব আকারে এখন বিরাজ করছে। এর সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে মার্কিন বনাম ইইউ বা চীন– ইত্যাদি প্রভাব বলয়ে কীভাবে অবস্থান করবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব। যা এখন বিকাশমান।

এইসব দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে এখানকার বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে একটি হাস্যকর ও বিকলাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে চালু হয়েছে। সংসদীয় শাসন ও সামরিক শাসন পালা করে সামনে আসছে– যাদের উভয়ের পেছনে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের মদদ ও পরিকল্পনা কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলোকে সুচারুরূপে কাজে লাগিয়ে এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক ও সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশকে অবারিত করে ফেলেছে। এইসব অন্তর্দ্বন্দ্বে বর্ধিত মাত্রা যোগ করেছে এ অঞ্চলের সকল দেশের মত বাংলাদেশেও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিশেষ হস্তক্ষেপ, আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত।

এসবের ফলশ্রুতিতে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কোনো শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হতে ব্যর্থ হচ্ছে, জনগণের সমর্থন পাওয়া-তো দূরের কথা। ভোটের সময় কিছুটা সময় ধরে জনগণকে এই আফিমের ঘোরে তারা এখনো মাতাতে পারলেও তাদের রাজনীতি চূড়ান্তভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এমনকি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, তথা সুশীল সমাজও এই অনাস্থা, বিরক্তি, হতাশা ও ক্ষোভকে এখন গোপন রাখতে পারছে না। মিডিয়ার বিরাট বিকাশ বুর্জোয়া প্রচারণা ও মতাদর্শগত-সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তারের একটা বড় মাধ্যম হয়ে উঠলেও বিপরীতে এটা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে একে অন্যের উন্মোচন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকাও পালন করে চলেছে। যা বুর্জোয়া

রাজনীতির গণবিচ্ছিন্নতা, দেশদ্রোহিতা, গণবিরোধিতা, প্রতারণা, ভণ্ডামিকে আরো উন্মোচন করে দিচ্ছে।

কয়লা-গ্যাস-খনিজ সম্পদ, বন্দর, বিদ্যুৎ, সমুদ্রসীমা, সীমান্ত সংঘাত, ট্রানজিট, পানির হিস্যা প্রভৃতি ইস্যুতে সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী হস্তক্ষেপ এবং শাসকশ্রেণির দেশবিক্রেতা ভূমিকার বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও আন্দোলন ক্রমবর্ধিতভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কৃষি ক্ষেত্রে খোদ কৃষকের জমি-হারানো, জমি থেকে উচ্ছেদ, বেকারত্ব, কম মজুরি, সুদী শোষণে ভেঙে পড়া, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সীমাহীন দুর্গতি, দুর্নীতিবাজ ও নিপীড়ক প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সার বীজ কীটনাশক প্রভৃতি নিয়ে কৃষকের অসহায়ত্ব ক্ষোভ বিক্ষোভ ও সংগ্রাম অব্যাহত। বিরাষ্ট্রীকরণের মাধ্যমে মৌলিক শিল্প ধ্বংস করা, সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর গার্মেন্টস শিল্পে মধ্যযুগীয় শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন খুবই শক্তিশালী, যদিও তা ব্যাপকভাবে এখনো অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত। বেকারত্ব ও দ্রব্যমূল্য, পরিবহন ও বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা– সকল ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের ক্ষোভ ও ভোগান্তি চরমে। সামরিক প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্র ও সংসদীয় সরকারগুলোর স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সকল স্তরের শ্রমজীবী, বস্তিবাসী, হকার, ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনকে উপেক্ষা করাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

এসবই শাসকশ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুতীব্র করাতেও ভূমিকা রাখছে, যতই তারা অভিন্ন শ্রেণি স্বার্থে দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে চাক না কেন। তারাই মৌলবাদকে রক্ষা করেছে, মদদ দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে; আবার মৌলবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দ্বারা পরিস্থিতিকে তাদের জন্য আরো কঠিন করে তুলেছে। তাদের রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমনকি তাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের রাষ্ট্রীয় পরিসরেও পরিব্যাপ্ত, যাকিনা তাদের নিজ বাহিনীগুলোর অভ্যন্তরেও নতুন বৈরী সংঘর্ষে রূপ লাভ করার দিকে এগুচ্ছে। সাম্প্রতিক বিডিআর বিদ্রোহেও এটি নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে।

তদুপরি যে অর্থনৈতিক মন্দার কবলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পড়েছে তার প্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য আরো বৃদ্ধি পেতেই বাধ্য, যার কোনো সমাধান তাদের হাতে নেই। বরং এই সুযোগে বড় বুর্জোয়াশ্রেণি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বড় অংকের অর্থ হাতিয়ে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শাসক শ্রেণি কোনোভাবেই আর নিজ শাসনকে একই ধরনে দীর্ঘদিন চালিয়ে নিতে পারছে না। এ অবস্থায় নিজ প্রভুদের অনুসরণে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা 'সোনার বাংলা'র পর 'নতুন বাংলা', 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা', 'সন্ত্রাস নির্মূল', 'দুর্নীতি বিরোধী অভিযান', এবং অবশেষে 'দিনবদল' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর চটকদার স্লোগানের মূলা জনগণের সামনে ঝুলিয়ে রাখছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিকেই

বেশিদিন ধরে তারা চালাতে পারছে না। জনগণ দ্রুতই এসবের প্রতারণার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছেন। নতুন নতুন বোতলে পুরনো মদকে তারা ধরে ফেলছেন। প্রকৃতপক্ষে জনগণ শাসক মুৎসুদ্দি শ্রেণির বাইরে নতুন পথের সন্ধান করছেন। এই ব্যবস্থার একটা বিকল্পের দাবি জোরালোভাবে জনগণের অন্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

* ঠিক এরকম একটি অবস্থায় দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন, তথা মাওবাদী আন্দোলন তেমন একটা শক্তিশালী নয়। বিশেষত বিপ্লবী মাওবাদী আন্দোলন এক আমূল পুনর্গঠনের জটিল অন্তর্বর্তীকাল অতিক্রম করছে। যা আবার বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের এক নতুন পুনর্গঠনের সাথেও যুক্ত এবং তারই অংশ।

এ আন্দোলন শুরু থেকেই যে বিভক্তির মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল তা পরে আরো বেশী করে বিভক্ত হয়েছিল। বিপ্লবী শক্তির একটা অংশ মাও-মৃত্যুপরবর্তী মতাদর্শগত মহাবিতর্কে মাওবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ ক'রে আদর্শগতভাবে অধঃপতিত হয়েছিল। সেই মহাবিতর্কের ঝড়ঝাপ্টায় প্রাক্তন-বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ বিপ্লব থেকে ঝরে যায়, বসে যায়। পরবর্তীকালে রিম-কে ঘিরে গড়ে ওঠা নব-মেরুকরণের অগ্রগতি পুনরায় ব্যাহত হয় বিগত আন্দোলনের সারসংকলন-মূল্যায়নকে ঘিরে। একটা অংশ পুরনো পথে চলতে গিয়ে শত্রু দমনে ও অভ্যন্তরীণ অধঃপতনের ফলশ্রুতিতে ধ্বংসের দিকে চলেছে। অন্য কিছু অংশ লাইন-বিনির্মাণের নামে বিপ্লবী আন্দোলন ও বাস্তব শ্রেণি সংগ্রাম থেকে সরে যাবার বিলোপবাদে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি, কেউ কেউ কার্যত মাওবাদ থেকেও সরে গেছে বা সরে যাবার পথে রয়েছে। পাশাপাশি বিপ্লবী আন্দোলনকে অব্যাহত রেখে, তাকে ভিত্তি করে, এবং বিগত আন্দোলনের অর্জনকে রক্ষা করে তার মৌলিক পুনর্গঠনে অল্প কিছু অংশ এগিয়েও এসেছে।

ঠিক এ সময়টাতেই রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি তাদের আন্তর্জাতিক প্রভু, বিশেষত মার্কিন ও ভারতের নির্দেশ, সহায়তা ও পরামর্শে তথাকথিত 'ক্রসফায়ার' অভিযানের নামে বিনাবিচারে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মাওবাদী আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ করার ফ্যাসিস্ট অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা অনেকটা সফলও হয়েছে। যদিও এ সফলতা ৭০-দশকের সফলতার মত এখনো নয়, বরং মাওবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই প্রধান, কিন্তু তাদের এ অভিযান দ্বারা আরোপিত ক্ষয়ক্ষতিকেও হেলা করা যাবে না।

সুতরাং এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিগত শতাব্দীর বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা গোটা যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। পুরনো ধারার এখনো যাকিছু অবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় তা অচিরেই বিলুপ্তির দিকে শেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে– যদিনা রাষ্ট্র/শাসকশ্রেণি নিজ স্বার্থে, বিপ্লবী আন্দোলনের পুনর্গঠনকে ঠেকানোর প্রয়োজনে কৌশল হিসেবে তার কোনো অধঃপতিত অংশকে জিইয়ে রাখবার,

এমনকি শক্তিশালী হয়ে উঠবার সিদ্ধান্ত নেয়। ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া, বিভক্ত হওয়া, মতবাদ থেকে সরে যাওয়া, এমনকি নৈতিকভাবে অধঃপতিত হওয়া– এসবই তার পরিণাম। যাকিনা এ শতাব্দীর বিগত প্রথম দশক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সম্ভবত আরো কিছুদিন ধরে তা দেখবো।

– কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসের নিয়মই হলো এই যে, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন বিপ্লবী শক্তি ও আন্দোলন গড়ে উঠতে বাধ্য। পুরনো বিপ্লবী শক্তি নিজেকে তার উপযুক্ত করে গড়ে নিতে পারলে ভাল। সমস্ত পুরনো শক্তি কখনই সেটা করেনা, তবে অভিজ্ঞদের একটি অংশ তাতে সামিল হতে পারে। নতুবা তাকে অগ্রাহ্য করেই নতুন শক্তি গড়ে ওঠে। আমাদের সৌভাগ্য হলো এই যে, চলমান মাওবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে শক্তিশালীভাবে এই পুনর্গঠনের প্রশ্নটি উঠে গেছে– আমাদের পার্টি পুরোভাগে থেকে তার নেতৃত্ব দিচ্ছে। পূবাকপা ধারা থেকে শহীদ কমরেড রাকা এমন একটি নবউদ্যোগ সূচনা করেছিলেন সাহসিকতা, প্রতিভা এবং বলিষ্ঠতা সহকারে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে এসে শত্রু তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, যা এই নতুন প্রক্রিয়ার অপুরণীয় ক্ষতি করেছে। কিন্তু তাঁর পথকে সৃজনশীলভাবে অগ্রসর করে নিতে পারলে পূবাকপা'র মত একটি সংগ্রামী ধারাও এই সামগ্রিক পুনর্গঠন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে পারবে। সেটা কতটা ঘটবে বা ঘটবে না তা এখনো দেখার বিষয়। এই বিবেচনায় ৬০/৭০-দশকের উত্থান পরবর্তীকালে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে কমরেড রাকা'র শহীদ হবার ঘটনা এ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটা উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন, যাতে আমরা এ ধরনের নেতৃত্বের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করতে পারি, এবং কমরেড রাকা'র অসমাপ্ত কাজটিকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারি।

* এ প্রসঙ্গে লাইন-বিনির্মাণে কয়েকটি দৃশ্যমান ধারা সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বাস্তব আন্দোলন-সংগ্রামে সংকট এবং লাইনগত বিতর্কের বিকাশের ফলে এখন কোনো শক্তিই আর পূর্বকার অনুশীলন বা লাইন পূর্বের মত করে চালাতে পারছে না। পুরনো মৌলিক কাঠামোর মধ্যকার লাইন ও অনুশীলন হয় বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, নতুবা পথ খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে এক ধরনের স্থবিরতায় তা ভুগছে। সংকট কাটানোর জন্য কিছু কিছু সামরিক এ্যাকশন করার এ্যাকশনবাদের অনুশীলন এটা করতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটাও মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের দুর্বলতা ও গুরুতর ত্রুটির কারণে বিপ্লবী ধারায় নিজেকে বিকশিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

কিন্তু নবউদ্ভূত কিছু শক্তি অতীতের অর্জনকে রক্ষা করার নামে পেরুভিয়ান বিচ্যুতির পথ ধরে মতবাদিক ক্ষেত্রে দেশীয় 'চিন্তাধারা', 'পথ', 'শিক্ষা'– ইত্যাকার নামে পুরনো পথকে তাত্ত্বিক রূপায়নের মধ্য দিয়ে লাইন-বিনির্মাণের পথে সবচাইতে বড় মতবাদিক বাধার সৃষ্টি করেছে। এই ধারাগুলো কার্যক্ষেত্রে মোটেই পুরনো দিনের

বিপ্লবী সংগ্রাম বা অনুশীলনকে চালু করছে না, কারণ, সেটা সেরকম করে করা এখন আর সম্ভব নয়। কিছু কিছু কেন্দ্র দ্বারা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই তা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে, এই ধারাগুলোর 'চিন্তাধারা' বা 'শিক্ষা'গুলো হয়ে পড়েছে কাগুজে; কার্যক্ষেত্রে তারা অনুশীলন করছে হয় গণসংগঠনবাদী সংস্কারবাদ, নতুবা নিছক তত্ত্বগত পরিমণ্ডলে কিছু বুদ্ধিজীবী কাজ। বড় জোর এটা নিম্নমানের/মাত্রার সশস্ত্র সংস্কারবাদী ধরনের কাজে পরিণত হতে পারে। এভাবে তারা যাকে 'চিন্তাধারা' বা 'শিক্ষা' বলছে, সেই শিক্ষাগুলোর মর্মবস্তুকেই তারা বর্জন করে চলেছে। তারা পুরনো দিনের সবচাইতে শক্তিশালী যে দিক– অবিলম্বে বিপ্লবী পার্টি-গঠন এবং যথা সম্ভব দ্রুত গণযুদ্ধ সূচনা করা– এ দুটোকেই আঁকড়ে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে।

লাইন-বিনির্মাণের কথা বলে আরেকটি ধারা বাস্তব বিপ্লবী অনুশীলনের সাথে নিজ বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে নিছক তত্ত্বগত বিতর্ক, পর্যালোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণার একটি মধ্যবিত্ত অবিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ধারাকে তুলে ধরছে। তারা-যে শুধু এ কাজই করছে তা নয়, তারা অতীত বিপ্লবী অর্জনকে কার্যত অপলাপ করছে এবং বর্তমান বিপ্লবী অনুশীলনকে কার্যত নিন্দা ও বিরোধিতা করছে। এভাবে তারা একটি 'অপার্টি' বুদ্ধিজীবী ধারার মধ্য দিয়ে বিলোপবাদী পথকে তুলে ধরেছে, যদিও তত্ত্বগত-রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্নে তারা অনেক সময় অনেক সঠিক বক্তব্যও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বলে থাকেন।

লাইন-বিনির্মাণের বিপ্লবী ধারায় কিছু দুর্বলতা দৃশ্যমান হয়, যা আমাদের পার্টির মাঝেও রয়েছে। তাহলো, বিগত অভিজ্ঞতার সারসংকলনের ভিত্তিতে এবং তত্ত্বগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে পুরনো লাইন থেকে রাপচার করার প্রশ্নে দুর্বলতা। রাপচার নিজেও একটি সারসংকলনের ভিত্তিতেই অর্জিত হয়। কিন্তু সাধারণ সারসংকলন আর রাপচারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিপ্লবী রাপচার যদিও পুরনো দিনের বিপ্লবী অর্জনকে রক্ষা করে, তাকে মূল্য দেয়, কিন্তু সেটা পুরনো লাইনের কাঠামো থেকে নিজের বেরিয়ে আসাকে প্রতিনিধিত্ব করে। সামগ্রিকভাবে একটি গুণগত উচ্চতর স্তরকে সেটা প্রতিনিধিত্ব করে। পুরনো লাইনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সংশোধনবাদী অতীতের সাথে রাপচার, আর পুরনো যুগের বিপ্লবী লাইনের সাথে রাপচার এক কথা নয়। এক চরিত্রের নয়। পুরনো বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আমরা ধারণ করি, যা সংশোধনবাদের ক্ষেত্রে আমরা করি না। কিন্তু অতীত সংগ্রাম ও লাইনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন না করে রাপচার হয়না। এটা হলো তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একটা উচ্চতর নতুন অবস্থান ও সংগ্রাম। এটা তত্ত্বে যতটা কঠিন, বাস্তব অনুশীলনে সেটা আরো কঠিন। এটা-যে শুধু পার্টির পক্ষ থেকে সমগ্র আন্দোলনে প্রতিষ্ঠা করার বিষয় তা নয়, এটা খোদ পার্টির মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করার বিষয়– যার পথ পরিক্রমা

জটিল ও কঠিন। সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। নতুবা লাইন বিনির্মাণে আমাদের দুর্বলতা কাটবে না।

* লাইনের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের দিক থেকেই-যে শুধু আন্দোলন একটি সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে তা নয়, আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি যে পার্টি, তা দেহগতভাবেও একটা সন্ধিক্ষণ ও সংকটকাল পাড়ি দিচ্ছে। পুরনো আন্দোলনের নেতৃত্বগণ পর্যায়ক্রমিকভাবে হয় শহীদ বা মৃত, পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিতই শুধু নন, তাদের অবশিষ্ট একটি অংশ বয়সজনিত কারণে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী কাজ থেকে অবসর নিতে বা তার পূর্ণ অনুশীলন থেকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। একটা গোটা প্রজন্ম তার জীবতকাল ও কর্মসময়কে কার্যত পার করে ফেলেছেন। তাই, নব-প্রজন্ম দ্বারা নতুন পার্টি-গঠন ব্যতীত দেহগতভাবেও আন্দোলন নিজ অস্তিত্বকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে না।

এক্ষেত্রে খুবই আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো এই যে, সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজন্মের থেকে নবীন রাজনৈতিক কর্মীরা কমিউনিজমের আদর্শ, সমাজতন্ত্র, এমনকি মাওবাদ ও গণযুদ্ধের প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছেন। যদিও এ প্রজন্মের এই বিকাশ এখনো বিপুল নয়, বা তেমন একটা জোরালোও নয়, কিন্তু তা উপেক্ষা করবারও নয়। স্বভাবতই সমাজতন্ত্রকামী এই নতুন প্রজন্ম বিভিন্ন সংশোধনবাদী, অর্থনীতিবাদী, জাতীয়তাবাদী, অমাওবাদী ধারা-উপধারায় ছড়িয়ে রয়েছেন; একটা অংশ মাওবাদ গ্রহণ করলেও সেক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি দুর্বল বা বিচ্যুতিপূর্ণ। বিশেষত শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বিরাজনীতিকরণের প্রকল্প নতুন প্রজন্মের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে। তাই, এ সমগ্র অংশটিকেই মতবাদে শিক্ষিত করবার, পুনর্গঠিত করবার, এবং বিগত শতকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় সিক্ত এক উচ্চতর লাইন দ্বারা তাদেরকে জয় করবার একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য আজ প্রয়োজনীয়।

একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের আদর্শ ও বিগত শতকে সমাজতন্ত্রের গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে নবপ্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়া। কারণ, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, এবং পেরু ও নেপালের মাওবাদী গণযুদ্ধসমূহের পথভ্রষ্ট হওয়ার ফলশ্রুতিতে, পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন কর্মসূচিতে নবপ্রজন্মের মাঝে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও তথ্য-শূন্যতা তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা-ব্যক্তিস্বার্থবাদীতা, প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ, ইতিহাস-মনস্কতার অভাব নতুন প্রজন্মের মাঝে অনেক শক্তিশালী হয়ে ভিত গেড়েছে যা তাদেরকে বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সেজন্য গণযুদ্ধের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখা ও তাকে জোরালো করার পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবীদের এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চলমান আন্দোলন ছাড়াও শক্তিশালী বুদ্ধিজীবীগত কাজ এবং তথ্যভিত্তিক প্রচার খুবই প্রয়োজন।

সুতরাং, লাইনের বিনির্মাণের সাথে একযোগে পার্টির পুনর্গঠন, তথা নতুন পার্টি গড়ার কাজকে সংযুক্ত করতে হবে। আর স্বার্থকভাবে তাকে স্থাপন করতে হবে গণযুদ্ধের এক উচ্চতর নতুন ঢেউ-এর নির্মাণকাজের ভিত্তিতে। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ পরিচালনাকারী পার্টি ব্যতীত কোনো শ্রেণির কোনো পার্টিই আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের দেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তভাবে দাঁড়াতে পারবে না, সেকথা সর্বহারা শ্রেণির জন্য আরো বেশি করে প্রযোজ্য– যে শ্রেণি তার পার্টির নেতৃত্বে গণযুদ্ধ চালিয়েই শুধু পার্টি ও যুক্তফ্রন্টের কাজকেও প্রকৃত গণভিত্তির উপর জোরালোভাবে এগিয়ে নিতে পারে।

– একইসাথে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে-গণযুদ্ধ একবার শুরু হয়েছিল, তা এখনো বিভিন্ন মাত্রায়, ব্যাপ্তিতে ও রূপে বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান। বহু অঞ্চলে তা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান যা তার আশু পুনর্সূচনা/পুনর্জাগরণ দাবি করে এবং তার সম্ভাব্য সফলতাকে ঘোষণা করে। এসবই পূর্বে সূচিত গণযুদ্ধেরই ধারাবাহিকতা, যা বস্তুগত বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিরাজ করছে।

– সুতরাং পুরনো আন্দোলনের শক্তি যতটুকুই আজ অবশিষ্ট থাকুক না কেন, লাইন-বিনির্মাণের একটা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে এখন আমাদেরকে গণযুদ্ধের নতুন ঢেউ জাগরিত করার কাজেও নেতৃত্ব দিতে হবে। এ কাজকে কোনোক্রমেই ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। কারণ, একবার গণযুদ্ধ থেকে পা উঠিয়ে নিলে আজকের বিশ্ব ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিপ্লবী শক্তির পক্ষে পুনরায় তার সূচনা করা দুঃসাধ্য বা দীর্ঘদিনের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠবে। সে রকম কোনো ভ্রান্ত পথ, যা বিলোপবাদেরই নামান্তর, মাওবাদীদের কোনো ক্রমেই অনুমোদন করা চলবে না, যার সবল প্রচেষ্টা আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছে।

* এ প্রসঙ্গে আমরা আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট গণযুদ্ধের পরিস্থিতিকেও কিছুটা এখানে আলোচনা করতে পারি, যা কিনা আমাদের সামগ্রিক বস্তুগত পরিস্থিতির চিত্রকে আরো গভীরে ও সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে এবং করণীয় নির্ধারণে সহায়তা করবে।

৭০-দশকের একেবারে শুরুতে, নির্দিষ্টভাবে বললে '৭০-সালেই মাওবাদী বিভিন্ন কেন্দ্র এদেশে প্রথম মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম তথা গণযুদ্ধের সূচনা করে। আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে এ গণযুদ্ধের সূচনা হয়। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টিসহ বিভিন্ন কেন্দ্রের দ্বারা চালিত এই মাওবাদী গণযুদ্ধ বিকশিত হয়ে ওঠে এবং ৭০-দশকের প্রথমার্ধটিকে পরিণত করে মাওবাদী বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায়ে।

একবার সূচিত হবার পর বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, এবং বহু ধরনের লাইনগত বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সেই গণযুদ্ধ এদেশে বহমান রয়েছে।

কিন্তু পূর্বেই যা উল্লেখ করা হয়েছে, সশস্ত্র সংগ্রামে এ সময়কালে বহু চড়াই-উৎরাই এসেছে। এবং আজকের অবস্থায় এসে আমরা দেখতে পাই যে, সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনাকারী কেন্দ্র/সংগঠনগুলো প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ কার্যত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের বহু অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। এটা যেমন আন্দোলনের পরিস্থিতির একটা দিক, তেমনি বস্তুগত পরিস্থিতিরও দিক বটে। যার মাঝে আত্মগত ও বস্তুগত– উভয় ক্ষেত্রে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা বিদ্যমান।

দীর্ঘ ৪-দশকের সশস্ত্র সংগ্রাম, তথা নিম্ন পর্যায়ের হলেও গণযুদ্ধের অনেকগুলো আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ঢেউ সন্দেহাতীতভাবে মাওবাদী বিপ্লবী সংগ্রামের একটি চরিত্রকে এদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যা কোনো ক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়। এটা শত্রু ও বিপ্লবী জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা বৈরী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা শক্ত দেয়াল তৈরী করে ফেলেছে, যাকে বাতিল করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেসব প্রাক্তন সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে সেগুলোকে সুপ্ত গেরিলা অঞ্চল বলাটাই যথার্থ, যা কিনা সংগ্রামের উচ্চতর ধাপে উঠতে উন্মুখ। একইসাথে এ অঞ্চলগুলোতে বিগত অনুশীলনের অসংখ্য বিচ্যুতি ও দুর্বলতাও তার ছাপ রেখে গেছে– জনগণ ও শত্রু উভয় মহলেই। সুতরাং এমন অনেক অঞ্চলই গণযুদ্ধের পুনর্জাগরণ ও পুনর্সূচনার জন্য উন্মুখ, যাকিনা একেবারে নতুন একটি গণযুদ্ধ সূচনার সমস্যার থেকে মৌলিকভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এ সমস্ত অঞ্চল মাওবাদী গণযুদ্ধের নতুন ঢেউ-এর জন্য এক ধরনের মজুত শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

অন্যদিকে আমাদের পার্টিসহ কিছু কেন্দ্র ও শক্তি এখনো গণযুদ্ধের মধ্যেই রয়েছে। আমাদের পার্টি '৯২-সালের তৃতীয় কংগ্রেসের পর গণযুদ্ধের যে পুনর্সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং '৯৪-সালেই তাকে রাষ্ট্রের উপর আক্রমণে উন্নীত করতে পেরেছিল, তার সারসংকলন প্রক্রিয়া আমাদের পার্টিতে ভুল পথে পরিচালিত হওয়ায় এই পুনর্সূচনার সফলতাকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। এই গুরুতর ভুল শেষ পর্যন্ত পার্টি-বিভক্তিতে গড়ালেও আমাদের পার্টি গণযুদ্ধের রাজনীতিতে শুধুমাত্র তত্ত্বে নয়, প্রয়োগেও লেগে থাকে। এবং সাম্প্রতিককালে এ গণযুদ্ধে নতুন কিছু গতি আনতে সক্ষম হয়। কমরেড রাকা'র নেতৃত্বাধীন পূবাকপা'র নেতৃত্বে লালপতাকা গ্রুপও এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে গুরুত্বপূর্ণ উল্লম্ফন ঘটায়, যদিও নেতৃত্বের লস ও নতুন লাইনগত চেতনায় পার্টির সুসংবদ্ধকরণের অভাবে তা নতুন সংকটে পড়েছে। এমবিআরএম তাদের লাইনগত গুরুতর দুর্বলতাগুলো সত্ত্বেও গণযুদ্ধের রাজনীতিতে লেগে থাকবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সংগ্রামে অগ্রগতি-পশ্চাদগতি হচ্ছে তার লাইনগত দুর্বলতাগুলোর কারণেই। কিন্তু গণযুদ্ধ চলমান রয়েছে, তা এসব দৃষ্টান্ত স্পষ্টই দেখিয়ে দেয়। এবং বিগত চার দশকের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে এই চলমান গণযুদ্ধ থেকে উঠে আসবার কোনো প্রশ্ন বিপ্লবী আন্দোলনে আসতে পারে না। 'যথাসম্ভব দ্রুত গণযুদ্ধ শুরু করা'র নীতির এটাই হলো এখানকার বাস্তব রূপ। একে এগিয়ে নেয়া এবং উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করবার সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই মাওবাদী আন্দোলনের যাবতীয় গঠন-পুনর্গঠনকে দেখতে হবে ও পরিচালনা করতে হবে।

* এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে, দেশীয় ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই সন্ধিক্ষণে এবং আমাদের আন্দোলনের অবস্থা আলোচনায় যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলো আমাদের সামনে আজ উপস্থিত হয়েছে তাকে আমরা নিচের মত করে উত্থাপন করতে পারি–

১। সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের আদর্শ ও
গত শতাব্দীর বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামের
গৌরবোজ্জল ইতিহাসের প্রচার-প্রসারে গুরুত্ব দিন।

২। মালেমাকে গভীরভাবে আয়ত্ত করুন, প্রতিষ্ঠা করুন।
সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামকে
উচ্চতর মানে দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করুন।
মালেমা'র বিকাশের প্রশ্নে নজর দিন।

৩। চার-দশকের বিপ্লবী সংগ্রামের অর্জনকে রক্ষা করুন।
বিপ্লবী অনুশীলনকে ভিত্তি করে
লাইন-বিনির্মাণের কাজকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিন।

৪। সকল মালেমা-বাদী বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করে
একটি একক মাওবাদী পার্টি গঠনের সংগ্রামকে জোরালো করুন।

৫। গণযুদ্ধের চলমান প্রবাহকে রক্ষা করুন, বিস্তৃত করুন,
শক্তিশালী করুন।
ঘাঁটি-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণযুদ্ধকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করুন।

৬। সকল বিপ্লবী শ্রেণি ও গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের জনগণকে
পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন সংগঠনে সংগঠিত করুন।
যুক্তফ্রন্টের লাইনকে ব্যাপকতম মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

৭। একটি নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের সংগ্রামকে
উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করুন।

৮। দেশব্যাপী রাজনৈতিক কাজ ও সংগঠন-সংগ্রামকে বিস্তৃত করুন।
জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক আক্রমণাভিযান ও
কৌশলগত তত্ত্বের প্রয়োগে যত্নবান হোন।

৯। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও গবেষণা-কাজকে
গভীরতর করুন।

১০। নেতৃত্ব রক্ষা করুন।
পুরনো-অভিজ্ঞ নেতৃত্ব ও শক্তিকে মূল্য দিন।
যত্ন ও প্রয়াসের সাথে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তুলুন।

১১। মতাদর্শগত পুনর্গঠনের কাজকে গুরুত্বের সাথে অব্যাহত রাখুন।

উপসংহার

এই লাইনগত রিপোর্ট শুধু আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস পরবর্তীকালের পার্টি-কাজের মূল্যায়ন তা নয়, এটা পার্টির শুরু থেকে এ পর্যন্তকার একটি মৌলিক লাইনগত রিপোর্ট। এটা শুধু আমাদের পার্টির সমগ্র সময়কালের লাইনগত মূল্যায়নধর্মী রিপোর্ট নয়, যদিও সেটা প্রধান; বরং এটা হলো কার্যত এদেশের সমগ্র মাওবাদী আন্দোলনের লাইনগত ইতিহাসের মূল্যায়নের একটি প্রয়াস। একইসাথে এটা করতে গিয়ে তা এদেশীয়, তথা, ভারতবর্ষীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগেরও একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূর্ত-নির্দিষ্ট মূল্যায়ন করবার প্রয়োজন অনুভব করেছে। কারণ, সে মূল্যায়নের দুর্বলতা ও ঘাটতি মাওবাদী আন্দোলনের সূচনাতেই তার নিজস্ব দুর্বলতা/ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই ব্যাপক ধরনের বিষয়কে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই বিশ্ব আন্দোলনের মোটা দাগের মূল্যায়ন ও আলোচনাও এখানে অবধারিতভাবে করতে হয়েছে। এই সমগ্র কাজ ছাড়া আমরা একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে উন্নীত করতে সক্ষম হবো না।

কিন্তু এটা করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই আমাদের ও আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা তার প্রভাব ফেলেছে। মাওবাদী আন্দোলনের অপরাপর ধারাকে সর্বোচ্চ গভীরতায় জানার কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে অবশ্যই, যা মূল্যায়নে তার ছাপ রাখতে পারে। একইসাথে আন্তর্জাতিক যে মতাদর্শগত মহাবিতর্ক আজ নতুন করে জাগরিত হয়েছে তার মূল্যায়নকেও আরো অনেকদূর এগিয়ে নিতে হবে। সুতরাং এই রিপোর্ট একটি নতুন স্তরকে সূচনা করেছে, এবং একটি মাত্রা পর্যন্ত তাকে সম্পন্ন করেছে, যা পূর্ণাঙ্গ হতে আরো সময় লাগবে। এ প্রক্রিয়ায় এর দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলোও বেরিয়ে আসবে আশা করা যায়। আমরা চাই যে, দেশের সকল মাওবাদী শক্তি একে ভিত্তি করে আলোচনা-বিতর্কে এগিয়ে আসুন, যা কিনা একটি উচ্চতর স্তরে একটি নতুন পার্টি গঠন এবং গণযুদ্ধ সৃষ্টিকে এগিয়ে দেবে। আন্তর্জাতিকভাবেও এমন আলোচনা-বিতর্ক একে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। এই প্রক্রিয়াগুলোর পাশাপাশি একে ভিত্তি করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। বোকা বুড়োর মত আজীবন বিপ্লবে লেগে থাকা, আত্মবলিদান ও আত্মস্বার্থ ত্যাগে অগ্রণী থাকা, অধ্যয়নে ও শিক্ষা গ্রহণে অধ্যবসায়ী ও নিপুণ হওয়া এবং সর্বহারা শ্রেণি-লাইনে বিপ্লবী সংগ্রামের মহান কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলে নিশ্চয়ই আমরা ২১-শতকের উপযুক্ত এক নতুন ধরনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

সমাপ্ত

নতুন থিসিস